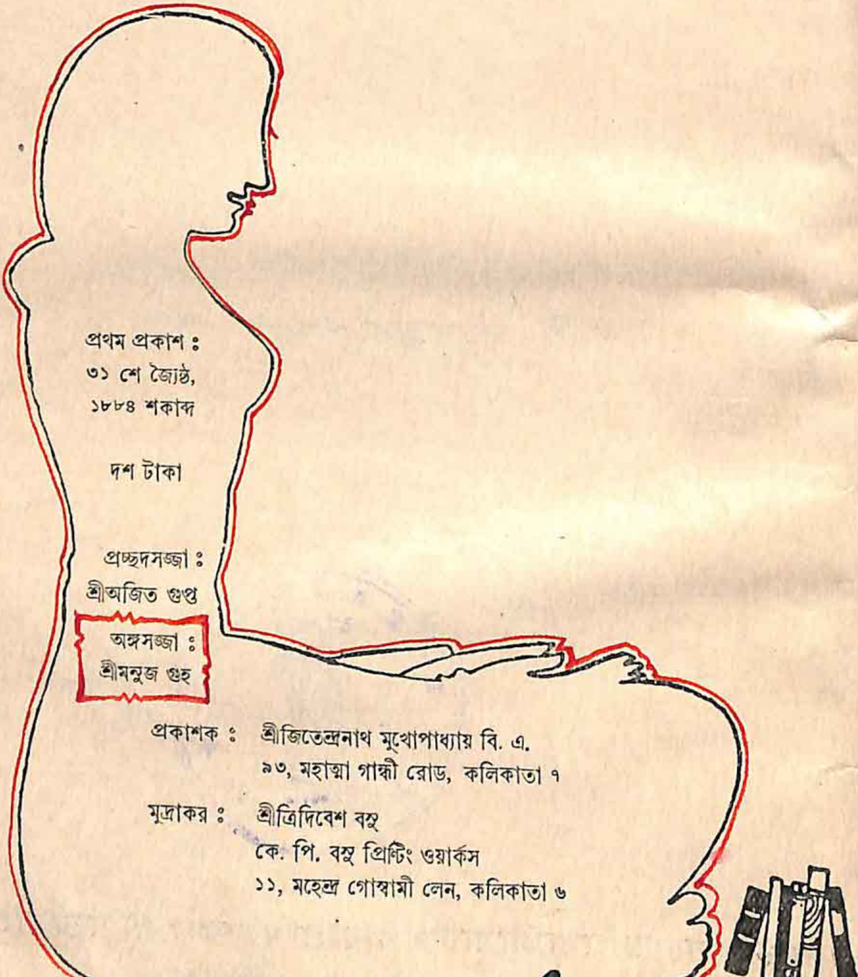

আকাশ
ও পৃথিবী

আকাশ ও পৃথিবী

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম প্রকাশ :
৩১ শে জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮৪ শকাব্দ

দশ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

অঙ্গসজ্জা :
শ্রীমনুজ গুহ

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য জানবার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। সুদীর্ঘকালের সাধনার ফলে মানুষ এ-সম্পর্কে আজ অবধি যেসব তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে, তারই সামান্য পরিচয় দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে "আকাশ ও পৃথিবী" নামক গ্রন্থমালা রচনার কাজে ব্রতী হয়েছি। এই গ্রন্থমালার প্রথম পর্বে "আকাশ" সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

এই গ্রন্থ রচনার সামান্য একটু ইতিহাস আছে। ১৯৫৬ সালের কথা। তখনও মহাকাশে স্পুৎনিক স্থাপিত হয়নি, তবে রকেট আর নকল চাঁদ সম্পর্কে খুব জল্পনা কল্পনা চলছে। এ-বিষয়ে সাধারণ লোকের কৌতূহল মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে "নকল চাঁদ"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখলাম। সেটি প্রকাশিত হ'ল যুগান্তর সাময়িকীতে। এর অল্পদিন পরেই মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল জাগ্রত হ'ল, কারণ বহুবছর পরে এই গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এল। এই সময় একই পত্রিকায় আমার "মঙ্গলগ্রহ"-শীর্ষক রচনাটি প্রকাশিত হ'ল। রচনা দু'টি অনেকেরই প্রশংসা লাভ করলো। বন্ধুবান্ধবরা এ-বিষয়ে আরও লেখার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, আকাশের বৈচিত্র্য নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য। এইভাবে উৎসাহিত হ'য়ে আরও প্রবন্ধ লিখেছি, সেগুলি একে একে প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তর, বসুধারা, প্রবাসী, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধগুলি একত্রিত ক'রে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কিছু কিছু প্রবন্ধ সংযোজিত ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের রূপ দিয়েছি।

বলতে গেলে আমি এক খনি-মজুর। যখন যেখানে যে রত্নের সন্ধান পেয়েছি, তাই সংগ্রহ করেছি আগ্রহভরে। তার মূল্য যাচাই ক'রে দেখার অবকাশ হয়নি। এমনি ক'রে আমার ডালাখানি ভরে তুলেছি বিবিধ রত্নে। এদের কোনোটি হয়তো মূল্যবান, আবার কোনোটি হয়তো একেবারেই মূল্যহীন। আমার এই সংগ্রহে এখনও হয়তো অনেক অভাব অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। তবুও বলবো, এই সংগ্রহ একেবারে ফেলে দেবার মতো নয় নিশ্চয়ই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম গ্রন্থটি আমার একক সাধনার ফল হ'লেও পরবর্তী গ্রন্থে আমার ভূমিকা হবে প্রধানত সম্পাদকের, কারণ তা অনেক কৃতী

লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ থাকবে। ইংরেজী ভাষায় এরূপ সমবেতভাবে পুস্তক রচনার দৃষ্টান্ত অনেক থাকলেও বাংলা ভাষায় এরূপ প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত বেশি নেই। আমার এই প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে বা হবে তা পাঠকরাই বিচার করবেন। আশা করি, অদূরভবিষ্যতেই এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ (পৃথিবী) প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

লেখা শুরু থেকে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা পর্যন্ত প্রত্যেকেরই নানারকম সমস্যা কাটিয়ে চলতে হয়। আমার সমস্যাগুলি সহৃদয়তার সঙ্গে একে একে সমাধান করেছেন অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীত্রিদিবেশ বসু এবং প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর একাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

'ওরায়ন' নক্ষত্রমণ্ডলের আলোকচিত্রটি তুলে দিয়েছেন অনুজ শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ, আর কোণারক মন্দিরের চিত্রগুলি তুলে দিয়েছেন স্নেহাস্পদ শ্রীশৈলেশ্বর মল্লিক। এঁদেরকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ব্লক দিয়ে এবং ইউনাইটেড স্টেট্স ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোক-চিত্র দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। কয়েকটি মূল্যবান চিত্র পেয়েছি 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকা থেকে। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কলিকাতা
মহালয়া, ১৩৬৮ (ইং ১৯৬১)।

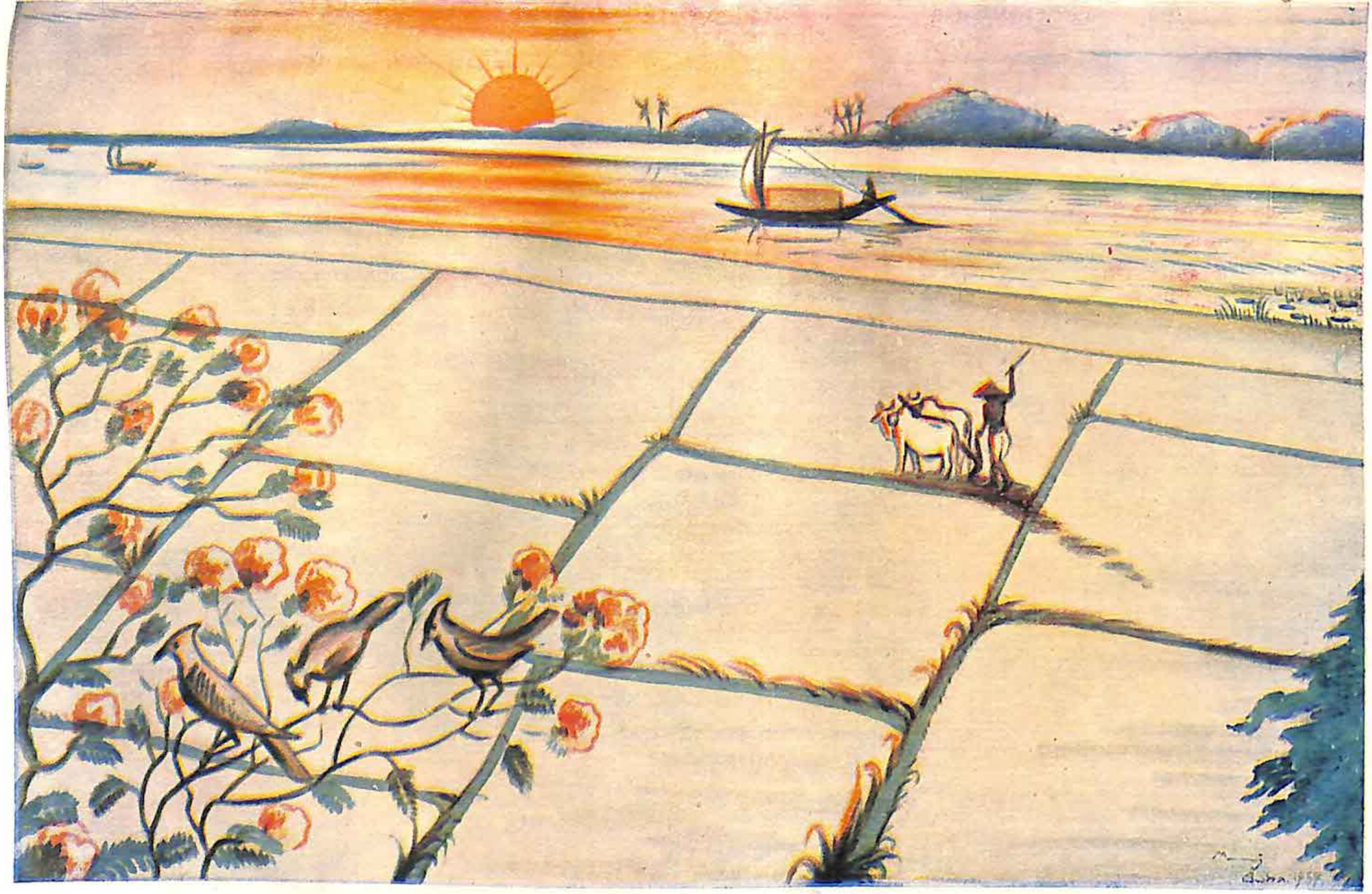
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	৫	প্রায় ৭ মণ	প্রায় ৭ টন
৪৮	১১	ক্বচিদ্‌প্রকাশং	ক্বচিদপ্রকাশং
৬৮	৬	বৃহস্পতির এগারটি, শনির ন'টি, ইউরেনসের চারটি এবং নেপচুনের মাত্র একটি উপগ্রহ আছে।	বৃহস্পতির বারোটি, শনির ন'টি, ইউরেনসের পাঁচটি এবং নেপচুনের মাত্র দু'টি উপগ্রহ আছে।
৮৯	২০	ব্যাস	ব্যাসার্ধ
"	"	৬৩,৭৮,৩৮৮ সেন্টিমিটার	৬৩, ৭৮, ৩৮, ৮০০ সেন্টিমিটার
১০০	(চিত্র ৬৩ —বামপার্শ্বে দ্রষ্টব্য)	উঃ মেরু	দঃ মেরু
১০৪	৮	চিত্র ৬৫	চিত্র ৬
১৫৬	১৮ (৪নং তালিকার অন্তর্গত আইয়ো দ্রষ্টব্য)।	২,৬২,০০	২,৬২,০০০
১৭০	১১	চারটি	পাঁচটি
"	১৪	৪০০ থেকে	১০০ থেকে
১৭৫	৬	আজ পর্যন্ত নেপচুনের একটিমাত্র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, এর নাম ট্রিটন। এ আমাদের চাঁদের চেয়ে একটু বড়।	আজ পর্যন্ত নেপচুনের দু'টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, এদের নাম ট্রিটন এবং নীরিয়িড। ট্রিটন আমাদের চাঁদের চেয়ে একটু বড়।
১৯৩	২৭	তখন	যখন

আ কা শ



ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ ও প্রকৃতি

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানুষ সর্বপ্রথমে যা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তা হ'ল আকাশ ও পৃথিবী। অনন্ত রহস্যে ভরা এই বিশ্বপ্রকৃতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল মানুষের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। মানুষ অবাক হ'য়ে দেখল, রাত্রিশেষে পুবের আকাশ ক্রমশ লাল হ'য়ে ওঠে, আর প্রকৃতির বুক থেকে অন্ধকারের কালো আবরণ ধীরে ধীরে সরে যায়। একটু পরেই দেখা যায়, অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে প্রকাণ্ড একটা লালরঙের থালার মতো সূর্য দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত সমাহিত পৃথিবীর বুকে জেগে ওঠে প্রাণের সাড়া, সমগ্র বনভূমি পাখীর কাকলীতে মুখরিত হ'য়ে ওঠে। অন্ধকারের মাঝে এই যে আলোর প্রকাশ, যা থেকে একমুহূর্তে পৃথিবীর সব-কিছুই সুন্দর ও প্রাণ-চঞ্চল হ'য়ে ওঠে তা দেখে মানুষের মনে অপূর্ব বিস্ময় জাগা, অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হওয়া, খুবই স্বাভাবিক। তাই হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন হওয়ার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত।

সূর্যই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণাদাতা। সূর্যের অফুরন্ত তেজ-শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই পৃথিবী হয়েছে শস্য-শ্যামলা, ফুলে-ফলে ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন। সূর্য-রশ্মির সংস্পর্শে এসে পৃথিবী কলুষমুক্ত হয়, আমাদের দেহমন পবিত্র হয়। বাস্তবিক যুগ যুগ ধরে সূর্য আমাদের প্রভূত আলোক এবং তাপ-শক্তি দান করছে ব'লেই আমাদের প্রাণের স্পন্দন বজায় রয়েছে। সূর্যের অভাবে এই পৃথিবীর কি দশা হবে

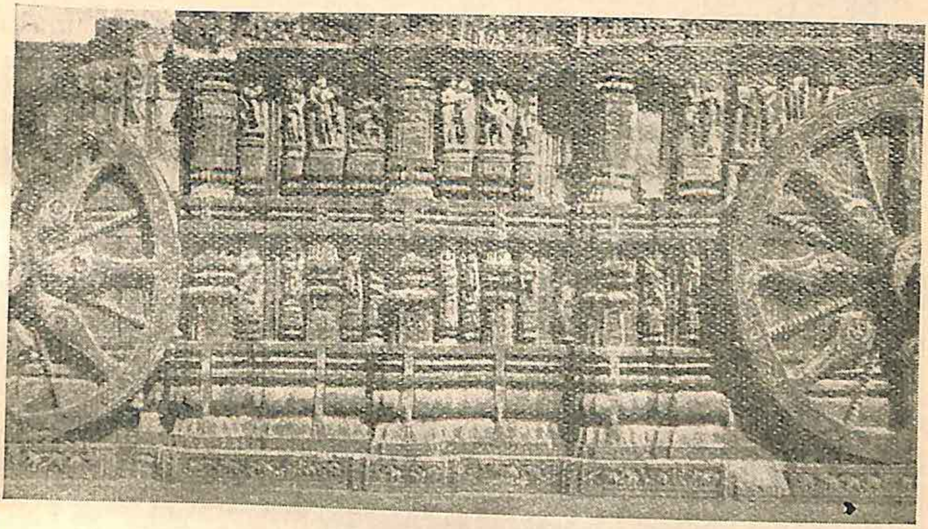
তা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই শস্য-শ্যামলা সুন্দর পৃথিবী অচিরেই অন্ধকার, তুহিন-শীতল, জনপ্রাণিহীন মরুভূমিতে পরিণত হবে। প্রাচীন ঋষিগণ একথা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁরা সূর্যকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করতেন। তাঁদের মন্ত্র ছিল—"ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"। এ ছাড়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণকে যে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয় তাতে আছে—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। আমরা সেসব সবিতার বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি, যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন।



চিত্র ১। উড়িষ্যার অন্তর্গত কোণারকের সূর্যমন্দির—ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। [আলোকচিত্রী—শ্রীশৈলেশ্বর মল্লিক]

উড়িষ্যার অন্তর্গত কোণারকের সূর্যমন্দির ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ঐতিহাসিকদের অনুমান ১৩৪৪ খৃস্টাব্দে এই মন্দিরটি

নির্মিত হয়। মন্দিরটি দেখতে দশবারোতলা বিরাট এক রথের মতো। বিরাট বিরাট পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে এই রথ। এর প্রাচীরগাত্রে খোদিত রয়েছে কতগুলি মর্মর-চক্র, সম্মুখে রয়েছে সাতটি মর্মর-অশ্ব, আর রথের সম্মুখে দণ্ডায়মান সূর্যদেবের বিরাট এক মূর্তি। শিল্পীর কল্পনা সাত-ঘোড়ার এই রথে চড়ে সূর্যদেব দিক্-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। সাতটি ঘোড়া হ'ল সূর্য-রশ্মির সাতটি বর্ণের প্রতীক।



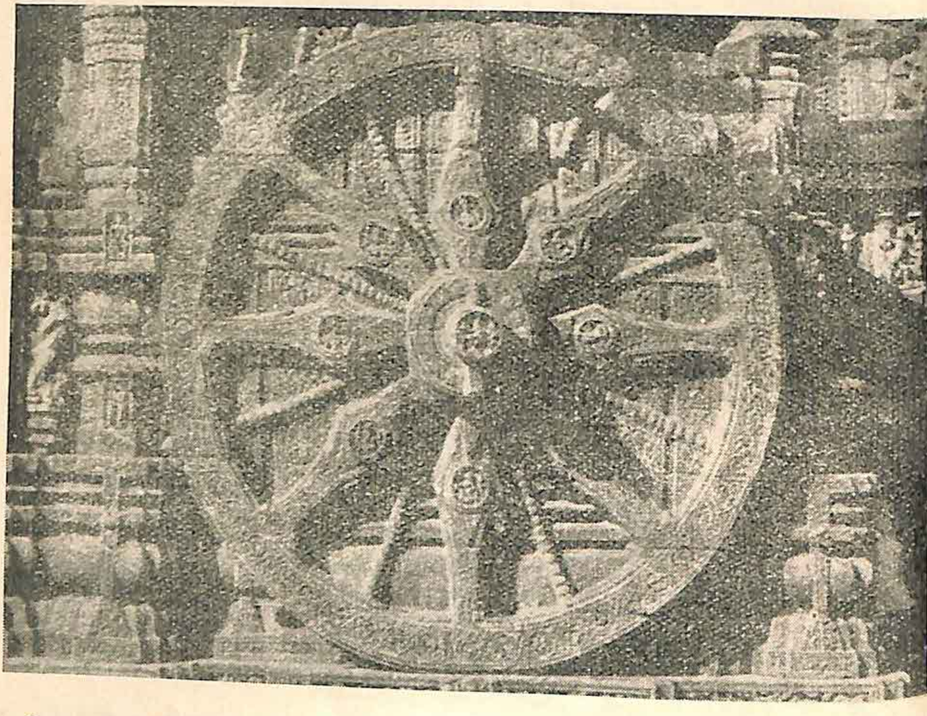
চিত্র ২। কোণারক মন্দিরের পরিকল্পনা একটি চক্রবাহিত রথের মতো।

[আলোকচিত্রী—শ্রীশৈলেশ্বর মল্লিক]

এই মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এর প্রাচীরগাত্রে খোদিত অপূর্ব শিল্পকার্যগুলি। সেখানে একদিকে যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, অপর-দিকে তেমনি দশ অবতার-মূর্তি ও নানা পুরাণ-কাহিনী প্রভৃতিও অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

মন্দিরের পারিপার্শ্বিক চিত্রও অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ। চারদিকে বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত নীল সাগরের উদার আহ্বান।

এই মন্দিরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে প্রাচীন ঋষিরা দেখতেন, সূর্যদেব সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে, তাঁর সাত ঘোড়ার রথে চড়ে, যেন নীল সাগরের মাঝখান থেকে উঠে এলেন, আর তাঁরই আলোয় সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ সাদা ফেনা ঝিকমিক ক'রে তাঁকেই যেন স্বাগত জানাল। এ দৃশ্যের কোন তুলনা নেই। তাই তাঁরা নগরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে, প্রকৃতির লীলাভূমিতে এক উদার শান্ত পরিবেশে, সহজেই তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন।



চিত্র ৩। একটি সম্পূর্ণ রথচক্র [আলোকচিত্রী—শ্রীশৈলেশ্বর মল্লিক]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক কুপ্‌ফার তাঁর 'লিজেণ্ডস্ অব গ্রীস্ অ্যাণ্ড রোম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য, সঙ্গীত এবং প্রেমের দেবতা। তিনি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন, বাস্তবিক প্রায় প্রত্যেক দেবতাই সুন্দর ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অ্যাপোলোই সবচেয়ে বেশি

সুন্দর। প্রতিদিন তিনি আকাশ-পথে তাঁর সোনালি রঙের সূর্য-রথ চালিয়ে যেতেন এবং তাঁর বীণায় সুমিষ্ট সঙ্গীত রচনা করতেন। তিনি সর্বপ্রকার ক্ষত নিরাময় করতে পারতেন এবং অত্যাশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তাঁর সোনালি তীরগুলি ছুঁড়তে পারতেন।"



চিত্র ৪। সূর্যদেব অ্যাপোলো—
গ্রীক্ ভাস্কর্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন

রাতের আকাশে যা সবচেয়ে সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হ'ল চাঁদ। সূর্য অস্তমিত হ'লে, গোধূলির সোনাকে সরিয়ে জ্যোৎস্নার হীরা ঝরতে থাকে, লক্ষ-কোটি তারার মুক্তা ফুটে ওঠে। নীলাম্বরীর আঁচল চুঁইয়ে আলো ঝরে ঝিরঝির! উঁচু পাহাড়ের চূড়া, নদ-নদী, বন-উপবন সব যেন অপরূপ এক কিরণরেখায় ঝলমল করতে থাকে। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমগ্র পৃথিবীর বরতনু যেন এক মোহময় মাদকতায় ভরে ওঠে!

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মের যে বিরাট রূপ বর্ণনা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর দু'টি চক্ষুরূপে কল্পনা করেছেন—"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষি চন্দ্রসূর্যৌ"। এই পৃথিবীতে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু প্রকাশিত, তাই আমরা দেখতে পাই এই দু'টি চক্ষুর সাহায্যে।

ঋগ্‌বেদে চন্দ্র সোমরূপে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে—"সোম দীপ্তিমান্; তাঁর জ্যোতি কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার নাশ করে। সোম সর্বদর্শী; সূর্য যেমন দিবা সকলকে রশ্মিদ্বারা পূর্ণ করেন, সোম তেমনই দীপ্তি দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী পূর্ণ করেন। নদী যেমন স্ফীত হয়, সোম তেমনই দেবগণের পানের

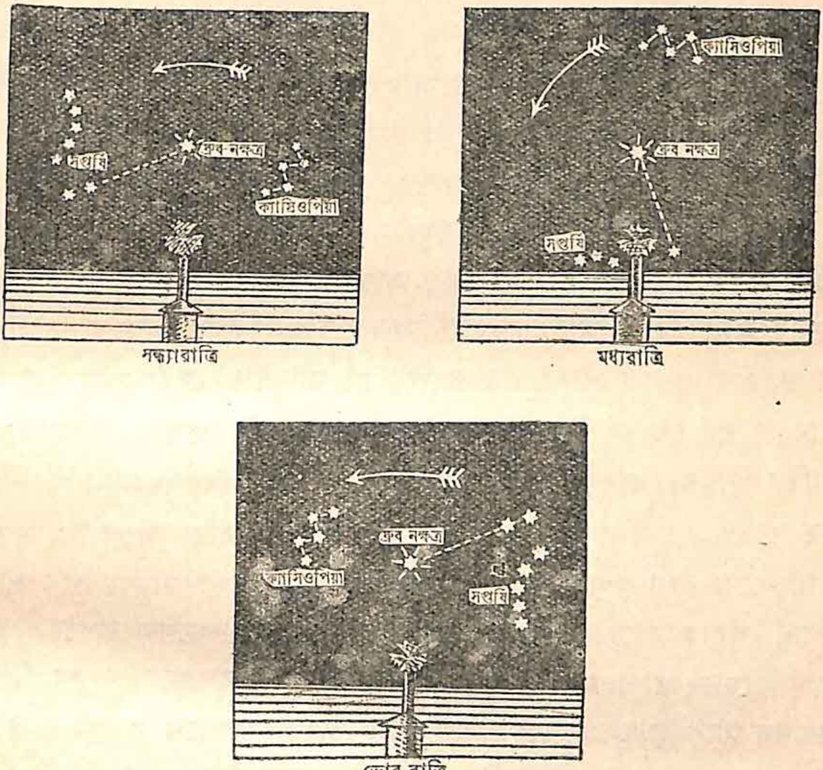
নিমিত্ত স্ফীত হন। সোম পীযূষ, স্বর্গধামের শ্রেষ্ঠ পানীয়। পিতৃগণ সোম পান করেন। পৃথিবীর কেহ তোমায় পান করতে পায় না। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাতে তোমার একেবারে ক্ষয় হয় না, আবার বৃদ্ধি হয়।" † বাস্তবিক চন্দ্র সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দর অথচ বাস্তব বর্ণনার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

রহস্যময় এই প্রকৃতি! তাই একদিকে দেখতে পাই প্রখর রৌদ্র-করোজ্জ্বল দিবা-দ্বিপ্রহর, আর একদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ভরা মোহময় রাত। এ দু'য়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একের চোখ-ঝল্‌সানো রুদ্র রূপ, অন্যটির মনোমুগ্ধকর শান্তস্নিগ্ধ মূর্তি। চাঁদের রূপ গরব করবার মতো, এটা ঠিক, কিন্তু এজন্য সূর্যের দান কম নয়! সূর্য যদি তার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সব সময় প্রচুর সূর্যকিরণ বিলিয়ে না দিত তবে কোথায় থাকতো চাঁদের এমন রূপের গরব! অন্ধকার কালো আকাশে সে ঘুরে বেড়াতো ঠিকই, কিন্তু মর্ত্যের মানুষের কাছে তার এই সুন্দর স্নিগ্ধ রূপ অপ্রকাশিত থেকে যেত, চিরকালের মতো। এজন্য হিন্দুদের কাছে চাঁদের চেয়ে সূর্যই অধিকতর বরণীয়।

রাতের আকাশে কি শুধু চাঁদই আছে? দিনের আকাশে সূর্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু রাতের আকাশ অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা। দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকার কালো আকাশের গায়ে যেন অসংখ্য দীপ জ্বলে ওঠে। এদের মধ্যে আছে নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, নীহারিকা এবং আরও কত কি! নক্ষত্রের আলো ম্লান, সর্বদাই যেন ঝিক্‌মিক্ করছে। এদের কোনটি সাদা, কোনটি নীল, কোনটি হলদে, আবার কোনটি লাল! প্রতিরাত্রেই দেখা যায়, বিভিন্ন নক্ষত্র পুব আকাশে উদিত হ'য়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যায় এবং অস্তমিত হয়। কিন্তু ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে স্থির থাকে। বাস্তবিক, সপ্তর্ষিমণ্ডলের (ঋক্ষ) এবং আকাশের অন্যান্য নক্ষত্র ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরছে। ঋক্ষ এবং ক্যাসিওপিয়া ধ্রুবতারার খুব কাছে আছে তাই তারা কখনও অস্ত যায় না। নক্ষত্রগুলিকে

† আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরস্পরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায় না। কিন্তু গ্রহগুলি স্থির থাকে না, নক্ষত্রের তুলনায় সরে সরে যায়। তা ছাড়া গ্রহগুলি স্থিরভাবে



চিত্র ৫। প্রতিরাত্রেই দেখা যায়, সপ্তর্ষিমণ্ডল (ঋক্ষ), ক্যাসিওপিয়া এবং আকাশের অন্যান্য নক্ষত্র ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরছে। ঋক্ষ এবং ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডল দু'টি ধ্রুবতারার খুব কাছে আছে, তাই তারা কখনও অস্ত যায় না।

উজ্জ্বল আলো দেয়, ঝিক্‌মিক্ করে না। বাস্তবিক ছায়াপথ, গ্রহ-উপগ্রহ এবং রূপময় নক্ষত্রমণ্ডল সব মিলিয়ে রাতের আকাশকে যে অপূর্ব মহিমায়

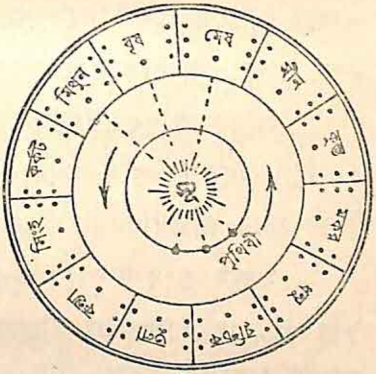
মহিমান্বিত ক'রে তোলে তার কোন তুলনা নেই। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে বিধাতার অপূর্ব রূপসৃষ্টি প্রত্যক্ষ ক'রে মনে অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার হয়, মন চলে যায় প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে এক অনন্ত রহস্যলোকের পানে!

অসংখ্য তারকাখচিত রূপময় আকাশ স্মরণাতীতকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের মানুষের মন বিস্ময়ে অভিভূত করেছে, তাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। কিন্তু আমাদের দেশেই সম্ভবত নক্ষত্র চেনবার পালা সর্বপ্রথম সুরু হয়েছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৫।৬ হাজার বছর আগে থেকেই যে এদেশে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হ'ত তার অনেক প্রমাণ আছে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে।† ভারতের মতো মিশর, চীন প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও হয়তো প্রায় সেই সময় থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণের পালা সুরু হয়েছিল। অতি প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়ান জাতির জীবিকার প্রধান উপায় ছিল মেষপালন। তাদের খোলা মাঠে শুয়ে রাত জেগে ভেড়ার পাল পাহারা দিতে হ'ত, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে এদের রক্ষা করতে হ'ত। রাতের বেলায় ঘাসের বিছানায় শুয়ে তারা হয়তো অবাক হ'য়ে দেখত অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের রূপবৈচিত্র্য! কল্পনার চোখে তারা দেখল, আকাশের স্থানে স্থানে কতগুলো নক্ষত্র মিলে যেন দল বেঁধে রয়েছে। এক একটি দলের বিভিন্ন নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ ক'রে পুরুষ, নারী এবং নানাপ্রকার জীবজন্তুর আকার ব'লে কল্পনা করা হয়। কালক্রমে নক্ষত্র চেনবার এই প্রথা হয়তো অন্যান্য দেশের গুণীজ্ঞানীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

নক্ষত্র শব্দের সাধারণ অর্থ তারা। এর বিশেষ অর্থ, এক বা একাধিক তারা-সমন্বিত আকৃতি; আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'Constellation'। আর এক অর্থ, চন্দ্রপথের দু'পাশে অবস্থিত ২৭ বা ২৮ নক্ষত্র; যেমন—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি। ঋষিগণ লক্ষ্য করেন যে, চন্দ্র এক এক রাত্রি এক এক নক্ষত্রে বাস করে এবং ২৮ দিন পরে যে নক্ষত্র থেকে যাত্রা

† আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সুরু করেছিল সেই নক্ষত্রে ফিরে আসে। ঋক্‌সংহিতায় আছে—"অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ", অর্থাৎ নক্ষত্রদের মধ্যে সোমকে (চন্দ্র) স্থাপন করা হয়েছে। পুরাণে আছে, ২৭টি নক্ষত্রনাম্নী কন্যার সঙ্গে চাঁদের বিয়ে হয়েছিল। এদের নাম—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি। তাই চাঁদ এক একটি নক্ষত্রের সঙ্গে এক একটি রাত্রি অতিবাহিত করে। আজ সন্ধ্যার পর চাঁদকে এক নক্ষত্রের কাছে দেখা গেল, কাল সেই সময় তাকে আর একটি নক্ষত্রের কাছে দেখা যাবে। এভাবে ২৭।২৮ রাত্রি পরে চাঁদ আবার প্রথম নক্ষত্রের কাছে ফিরে আসবে ; কিন্তু আকাশে এইসব নক্ষত্র সমান দূরে অবস্থিত নয়। তাই জ্যোতির্বিদ্‌রা চন্দ্রপথ ২৭ সমান ভাগে বিভক্ত ক'রে যে নক্ষত্র যে ভাগে পড়ে, সে নক্ষত্রের নামে সে-ভাগের নাম রেখেছেন। নক্ষত্র ২৭টি ; কাজেই কোন এক নক্ষত্র থেকে আরম্ভ ক'রে ১৩½ নক্ষত্রগতে অর্থাৎ ১৪শ নক্ষত্রে চন্দ্র-পথের অর্ধাংশ হবে।*



রাশিচক্র
চিত্র ৬

চন্দ্রের এরূপ নক্ষত্র-পরিক্রমা দেখেই পরে রাশিচক্রের কল্পনা করা হ'ল। এতে আছে মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি ১২টি রাশি বা নক্ষত্রমণ্ডল। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত নক্ষত্রের ২¼ মিলিয়ে হয় এক একটি রাশি। ঋষিরা লক্ষ্য করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সূর্য (রবি) এক বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ

---

* শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিষশাস্ত্রী 'ভারতে জ্যোতিষ-চর্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী' নামক গ্রন্থে বলেছেন, যে সময় পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দু মিলন হ'ত (তিলক মতে ৮০০০-৫০০০ বছর আগে) তখন শারদ ক্রান্তিপাত বিন্দু অন্য বিন্দু অভিজিতে মিলন হ'ত। কালক্রমে অয়ন কৃত্তিকায় চলে গেল, তখন অভিজিৎ নক্ষত্রের আর অস্তিত্ব রইল না। ঐ সময় মহাভারত এবং বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ রচিত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ২৭টি নক্ষত্রের নামকরণ প্রথম দৃষ্ট হয়। তাতে অভিজিতের নাম দেখা যায় না।

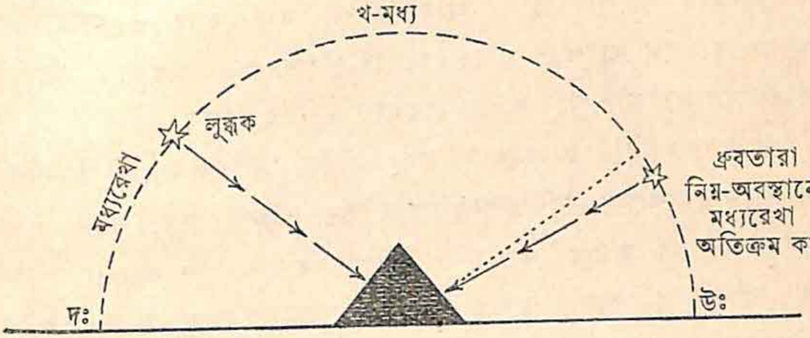
মহাভারতের বনপর্বে (কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত—২২৯ অধ্যায়) ইন্দ্র বলছেন যে, রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগ্নী দেবী অভিজিৎ স্পর্ধা ক'রে জ্যেষ্ঠতা লাভের ইচ্ছায় বনে গমন করলেন। গগন থেকে ঐ নক্ষত্র বিচ্যুত হওয়ায় নক্ষত্র-তালিকা পূরণ করা যাচ্ছে না। সম্ভবত পুনর্বসু থেকে অয়ন কৃত্তিকায় চলে যাওয়ায় মহাভারতে এই রূপকের অবতারণা করা হয়েছে।

করছে, এর নাম সূর্যপথ বা রবিপথ। আর সূর্যপথকেও পূর্বোক্ত ১২টি রাশির সাহায্যে ১২টি অংশে ভাগ করা যায়। কোন রাশির অন্তর্গত একটি নক্ষত্র থেকে সেই নক্ষত্রে পুনরাগমন হ'তে সূর্যের যতদিন লাগে তা বৎসরের পরিমাণ। আর কোন একটি রাশি অতিক্রম করতে সূর্যের যতদিন লাগে তা হ'ল সৌরমাস। কাজেই এরূপ ১২ মাসে মিলে হয় এক বৎসর।

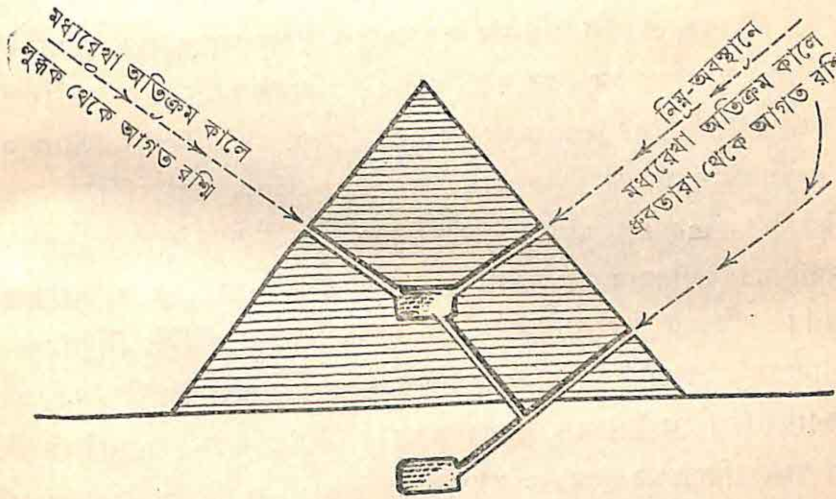
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। তাহ'লে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা যায় কি ক'রে? ঋষিগণ এরও একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার করেন। পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য পরস্পরের বিপরীত দিকে থাকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে ব্যবধান ১৮০°। যে নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে, তার পশ্চিমে ১৩½ নক্ষত্রগতে অর্থাৎ ১৪শ নক্ষত্রে থাকবে সূর্য। যেমন—চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে থাকলে, সূর্য থাকবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ; আবার চন্দ্র যদি থাকে ফল্গুনী নক্ষত্রে তবে সূর্য থাকবে ভাদ্রপদে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঋষিরা আরও দেখলেন, সূর্য প্রতিদিন পুবদিকে এক জায়গায় উদিত হয় না ; কখনও উত্তরে, আবার কখনও দক্ষিণে সরে উদিত হয়। এর নাম উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন।

মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করল যে, তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার কৃষিকর্ম, তার রোগশোক ভালোমন্দ সব-কিছুর সঙ্গেই প্রকৃতির এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তারা গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ছ'টি ঋতুর অস্তিত্ব যেমন উপলব্ধি করল, তেমনি দেখল একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ঐ ঋতুগুলি আবার পর পর ফিরে আসে। কৌতূহলী মানুষের অনুসন্ধানের ফলে সূর্যের উত্তরায়ণের এবং দক্ষিণায়নের সঙ্গে ঋতু-চক্রের আবর্তনের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হ'ল। বোঝা গেল সূর্যই ঋতুবিধান করছে। সূর্য প্রতিটি ঋতুর কর্তা, কাজেই সে ঋতুপতি আদিত্য। কৃষিকর্ম ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্ষা-ঋতু কখন আসবে তা সঠিকভাবে না জানলে বীজ-বপন ও শস্য-উৎপাদন সম্ভব হয় না। আর সূর্যের অবস্থান না জানলে ঋতু-পরিবর্তনের কথা ঠিকমতো বলা যাবে কি ক'রে? তাই নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে ক্রমশ বর্ষ-গণনা, ঋতু-গণনা



চিত্র ৭। বিভিন্ন নক্ষত্রের তুলনায় পিরামিডের অবস্থান। এর পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের জ্যামিতির এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল নিখুঁত। এর চারিপাশ ঠিক উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে আছে। এর ভূমি নিখুঁতভাবে সমতল এবং বর্গক্ষেত্রের পরিমাপও একেবারে নিখুঁত। তা ছাড়া একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের সঙ্গে তার পরিসীমার যে সম্পর্ক ($2\pi r$, অর্থাৎ ব্যাসার্ধের ২ × ২২/৭ গুণ), পিরামিডের উচ্চতার সঙ্গে তার চারিপাশের পরিসীমার সম্পর্কও ঠিক তাই।

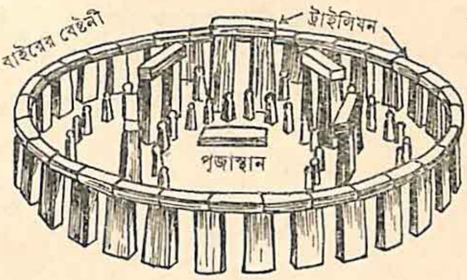


চিত্র ৮। লুব্ধক বা শ্বা নক্ষত্র যখন মধ্যরেখা অতিক্রম করত তখন তার রশ্মি বিশাল পিরামিডের দক্ষিণ পৃষ্ঠে লম্বভাবে পড়ত এবং একটি গবাক্ষ দিয়ে রাজকীয় কক্ষে প্রবেশ ক'রে মৃত ফারাও-এর মস্তক আলোকিত করত। লুব্ধকের প্রথম উদয় থেকেই মিশরীয় নববর্ষ আরম্ভ হ'ত এবং এর পরই পবিত্র নীলনদ প্লাবিত হ'য়ে কৃষককুলের সমৃদ্ধির সূচনা করত। প্রধান প্রবেশপথে এবং নিম্নস্থ কক্ষে যাওয়ার দ্বিতীয় একটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ধ্রুবনক্ষত্রের আলোক-রশ্মি বাহিত হ'ত। তখন ড্রেকো (Draco) নক্ষত্রমণ্ডলের প্রথম প্রভার নক্ষত্রটি ধ্রুবনক্ষত্ররূপে পরিগণিত হ'ত এবং তা প্রকৃত মেরুর (celestial pole) তিন ডিগ্রী নীচ দিয়ে মধ্যরেখা অতিক্রম করত।

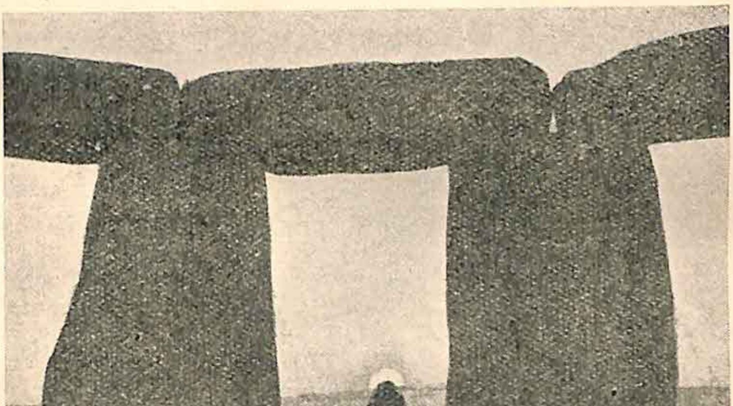
ও মাস-গণনার সূত্রপাত হ'ল, আর বিভিন্ন ঋতু-উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা স্মরণ ক'রে রাখবার ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল। মর্ত্যের মানুষ এভাবে সভ্যতার পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ল্যান্সলট হগ্‌বেন তাঁর 'সায়েন্স ফর দি সিটিজেন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "বিজ্ঞানের সূচনা হয় তখন থেকে, যখন মানুষ ঋতুগুলি সম্পর্কে আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে সুরু করে। কারণ আগে থেকেই পরিকল্পনা করার জন্য প্রয়োজন হ'ল ঋতুগুলি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত এবং নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণসমূহ এবং তাদের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে স্থায়ী লিপিবদ্ধ বিবরণ।……নাগরিক জীবনের প্রারম্ভে, যখন বিখ্যাত কৃষি-বিপ্লব চরমে পৌঁছাল, তখন তার প্রধান অবদান হিসেবে আবির্ভূত হ'ল সময়-নির্ধারণের এক নূতন পদ্ধতি। স্থায়ী নাগরিক জীবনের সুশৃঙ্খল কর্মধারার সূচনা সম্পর্কে যেসব উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আজও রয়েছে সেসব হ'ল বড় বড় ইমারত, যেগুলি পঞ্জিকার তত্ত্বাবধায়ক যাজক-সম্প্রদায়ের প্রাথমিক কর্তব্যের সাক্ষ্য বহন করছে। মন্দির; নির্দেশক-নক্ষত্রের মধ্যরেখা অতিক্রমকাল নির্ণয়ের জন্য, অথবা বছরের বিশেষ চারটি দিনের উদীয়মান বা অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ আলোকধারা সংগ্রহ করার জন্য, বিশেষভাবে নির্মিত অলিন্দ এবং প্রবেশপথ; মন্দিরের চূড়া অথবা ছায়াঘড়ি (Sun-dial); বিষুবদিনের উদীয়মান বা অস্তগামী সূর্যের, ধ্রুবনক্ষত্রের এবং রাশিচক্রের অন্তর্গত দক্ষিণের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির মুখোমুখিভাবে নির্মিত পিরামিড; 'স্টোনহেঞ্জ' (Stonehenge)-এর বিশাল প্রস্তর-চক্র এবং তার নির্দেশক, যা দক্ষিণায়নাদি দিনে উদীয়মান সূর্যের অবস্থান নির্দেশ করত; এগুলি সবই হ'ল স্থাপত্যশিল্পে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান পঞ্জিকা। জ্যোতির্বিদ্ পুরোহিতের পর্যবেক্ষণাগার-মন্দিরে নবজাত বিজ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সামাজিক প্রয়োজনস্বরূপ একই উৎস থেকে।"

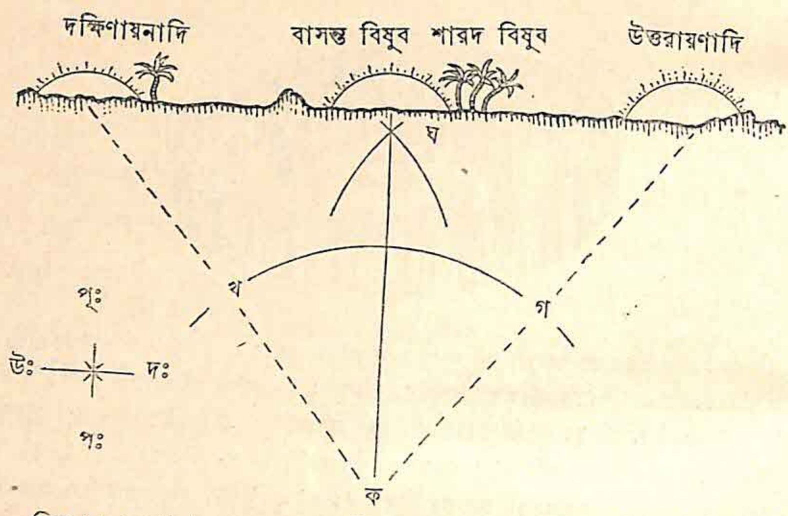
পৃথিবীর অক্ষরেখা উত্তর-দক্ষিণে বাড়িয়ে দিলে তা যে দু'টি বিন্দুতে আকাশ স্পর্শ করে, তাদের সুমেরু ও কুমেরু (Poles of the celestial equator) বলা হয়। দর্শকের স্থান থেকে যে ঊর্ধ্বরেখা কল্পনা করা যায়



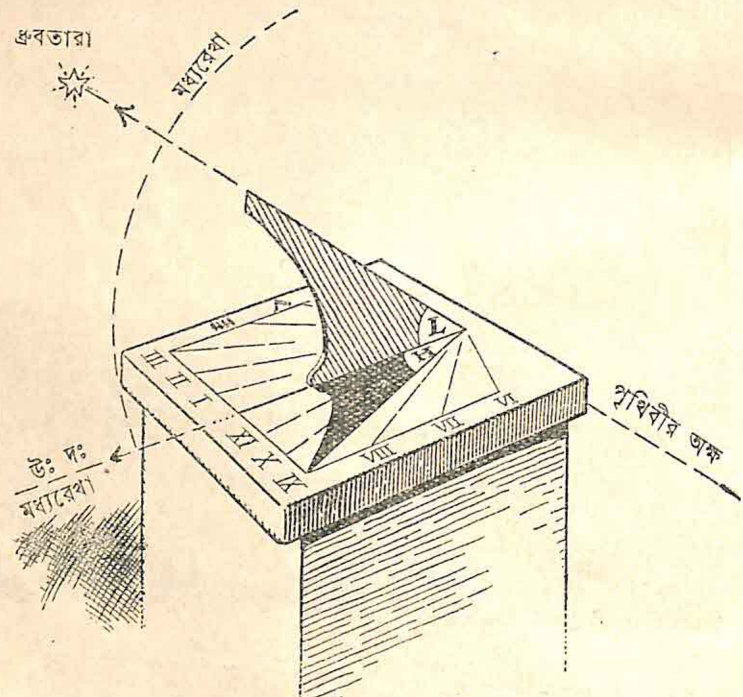
চিত্র ৯। ইংল্যাণ্ডের স্যালিস্‌বারী অঞ্চলে প্রাপ্ত সূর্যমন্দিরের মডেল। এর ইংরেজী নাম Stonehenge (=hanging stone)। ঐতিহাসিকদের অনুমান, খৃস্টপূর্ব ১৬৮০ অব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এর ব্যাস প্রায় ৩০০ ফুট, বাইরের বেষ্টনীতে ছিল ৩০টি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। এইরূপ প্রত্যেক জোড়া প্রস্তরখণ্ডের উপরে আড়াআড়ি ভাবে আর একটি ক'রে প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত ছিল। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ ফুট উঁচুতে স্থাপিত এইরূপ এক একটি প্রস্তরখণ্ডের আয়তন ছিল ১৫ × ৪$\frac{১}{২}$ × ৩$\frac{১}{২}$ ফুট, এবং ওজন ছিল প্রায়-৭ মণ। এইরূপ তিনটি প্রস্তরের সমাবেশকে বলা হয় ট্রাইলিথন (Trilithon)।



চিত্র ১০। 'স্টোনহেঞ্জ'-এর কেন্দ্র থেকে ট্রাইলিথনের ভিতর দিয়ে সূর্যোদয়ের দৃশ্য। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই মন্দির নির্মাণকালে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৬৮০ অব্দে দক্ষিণায়নাদি দিনে দূরের ঐ নির্দেশক প্রস্তর-খণ্ডটিতে সোজা সূর্যোদয় হ'ত। মানুষ এইভাবে দক্ষিণায়নাদি দিন নির্ধারণ করতে সক্ষম হ'ত।

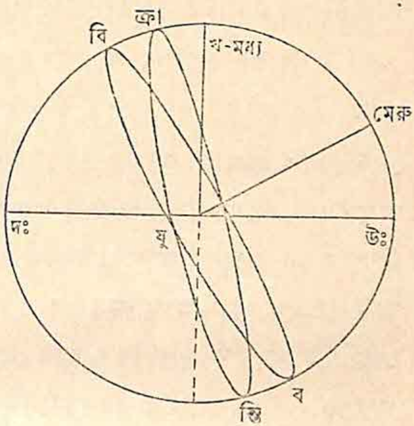


চিত্র ১১। আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরা উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে দক্ষিণায়নাদি, বাসন্ত বিষুব প্রভৃতি দিনগুলি নির্ধারণ করতেন।



চিত্র ১২। আরবদের আবিষ্কৃত ছায়া-ঘড়ি বা সূর্য-ঘড়ি (sun-dial)।

তা আকাশের যেখানে স্পর্শ করে, তার নাম **খ-মধ্য** (Zenith) এবং খ-মধ্য ও দুই মেরু দিয়ে যে বৃত্ত রচনা করা যায়, তার নাম **মধ্য-রেখা** (Meridian)। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরালে আকাশে যে বৃত্ত রচনা করা যায়, তার নাম **বিষুববৃত্ত** (Celestial equator)। সূর্যপথের নাম **ক্রান্তিবৃত্ত** (Ecliptic) এবং ক্রান্তিবৃত্তের মেরুর নাম **কদম্ব** (Poles of the ecliptic)।



চিত্র ১৩

বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত তির্যকভাবে অবস্থিত, তাই তারা পরস্পরকে দু'টো বিন্দুতে ছেদ করেছে। সেই দু'টি ছেদবিন্দুর নাম **বিষুববিন্দু** (Equinox)। যেদিন সূর্য বিষুববিন্দুতে উপস্থিত হয় সেদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। সূর্য বসন্তকালে যে বিন্দুতে থাকে, তার নাম **বাসন্ত বিষুব** (Vernal equinox) এবং শরৎকালে যে বিন্দুতে থাকে, তার নাম **শারদ বিষুব** (Autumnal equinox)। আবার সূর্য যখন যে দুই বিন্দুতে এসে উত্তরদিকে কিংবা দক্ষিণদিকে যেতে আরম্ভ করে, সেই দুই বিন্দুকে বলা হয় **অয়নাদি** (অয়ন = গতি, আদি = আরম্ভ) বা **অয়নবিন্দু** (Solstice)। যে বিন্দুতে এসে সূর্য উত্তরাভিমুখ হয়, তার নাম **উত্তরায়ণাদি** (Winter solstice), আর যে বিন্দুতে এসে দক্ষিণাভিমুখ হয়, তার নাম **দক্ষিণায়নাদি** (Summer solstice)।

আকাশের নক্ষত্রগুলি স্থির কিন্তু বিষুববিন্দু স্থির নয়; সেটা ক্রমশ পশ্চিমদিকে সরে যাচ্ছে। নক্ষত্র যেখানে, সেখানেই আছে। কাজেই মাস যেখানে, সেখানেই আছে। কিন্তু অয়নাদি পিছিয়ে যাচ্ছে ব'লে ঋতুও পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দু'হাজার বছরে এক মাস পিছিয়ে যাচ্ছে। ইংরাজীতে এর নাম 'Precision of the equinoxes' কিন্তু আমাদের

জ্যোতিষে একে বিষুববিন্দুর চলন না ব'লে অয়ন-চলন বলা হয়েছে। অয়ন-চলন আছে ব'লেই বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করা এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

পণ্ডিতরা বলেন, আমাদের দেশে ৩১৯ খৃস্টাব্দের বাসন্ত বিষুবস্থানে আদি-বিন্দু স্বীকৃত হয়। ৩২০ খৃস্টাব্দের ১লা বৈশাখ সূর্য মেষরাশিতে আসে। সেই থেকে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয়। এজন্য পঞ্জিকায় এখন যে পর্যায় প্রচলিত আছে তাতে মেষরাশি, অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বৈশাখ মাসের নাম প্রথমে আছে। কিন্তু অয়ন-চলনের ফলে এখন আর সেরূপ হয় না, এখন মহাবিষুব সংক্রান্তি ঘটে ৭ই চৈত্র। আমাদের দেশে তাই এখন পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়েছে এবং ৮ই চৈত্রকে ১লা চৈত্র ধরে সেদিন থেকেই বর্ষ-গণনার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এখন থেকে চৈত্র মাসই হবে বছরের প্রথম মাস।

প্রাচীন ঋষিরা কবি ছিলেন এবং তাঁরা উপমা প্রয়োগেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে মেষ, বৃষ প্রভৃতির আকারে কল্পনা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার আকাশের নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই রচনা করেছিলেন কত বিচিত্র কাহিনী! বাস্তবিক কোন কোন ক্ষেত্রে কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি নক্ষত্র যেন এসব কাহিনীর চিত্ররূপ চোখের সামনে স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন্‌স্ বলেছেন—

"The sky seems to have been utilised as a sort of permanent picture-book, and made to illustrate story after story of ancient mythology."

অর্থাৎ, মনে হয় আকাশকে যেন ব্যবহার করা হয়েছে একটি স্থায়ী ছবির বইয়ের মতো ক'রে এবং তা যেন প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর একটির পর একটিকে চিত্রে রূপায়িত ক'রে রেখেছে।

প্রাচীন গ্রীক্ এবং ভারতীয় সাহিত্যে যে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তারই কয়েকটি সম্পর্কে এবার আলোচনা করছি।

প্রথমে গ্রীক্ পুরাণের কয়েকটি গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

অতি প্রাচীনকালে দেবরাজ জুপিটার (বা জিউস) ও তাঁর স্ত্রী জুনো (বা হীরা) ওলিম্পাস্ পাহাড়ে বাস করতেন। লিজেণ্ডস্ অব গ্রীস্ অ্যাণ্ড রোম নামক গ্রন্থে কুপ্‌ফার মন্তব্য করেছেন—"দেবতাদের রাজা ছিলেন জুপিটার। তিনি যে শুধু মর্ত্যের মানুষদের উপরই প্রভুত্ব করতেন তা নয়, তাদের চেয়ে শক্তিশালী দেবতাদেরও তিনি প্রভু ছিলেন। তিনিই বজ্র ছুঁড়ে মারতেন এবং বায়ু ও জলকে পরিচালনা করতেন এবং এক কথায় সমগ্র স্বর্গ-মর্ত্যের উপর প্রভুত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রী জুনো ছিলেন স্বর্গের রাণী। তিনিই তাঁর কাজে সহায়তা করতেন। আমার ভয় হয়, যেসব গল্প আমি বলব তার সবগুলো পড়া শেষ হ'লে, তোমরা জুনোকে বিশেষ ভালবাসবে না। কারণ, তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর এবং হিংসুটে প্রকৃতির এবং এরকম স্বভাবের সব মানুষের মতোই, তিনি প্রায়ই নিজেকে এবং অন্যান্যদের অত্যন্ত অসুখী ক'রে তুলতেন।" জুনো ছিলেন খুবই সুন্দরী, কিন্তু তবুও জুপিটারের নয়নপথে পড়লে কোন সুন্দরীর অব্যাহতি ছিল না। কাজেই দেবরাজ জুপিটারের সঙ্গে হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেবরাজ ইন্দ্রের অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেকদিন আগে আর্কেডিয়ার রাজার একটি মেয়ে ছিল, তাঁর নাম ক্যালিস্টো। তাঁর মতো রূপবতী মেয়ে কদাচিৎ দেখা যেত। তিনি ছিলেন দেবী ডাঅ্যানার সখী ও সহচরী। ডাঅ্যানার সঙ্গে তিনিও আর্কেডিয়ার বনে বনে শিকার ক'রে বেড়াতেন। একদিন শিকারশেষে ক্যালিস্টো ক্লান্ত হ'য়ে গভীর অরণ্যে একাকী ঘুমিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তাঁকে দেখে জুপিটার এতটা বিচলিত হলেন যে তিনি দেবী ডাঅ্যানার রূপ ধারণ ক'রে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ক্যালিস্টোকে ছলনা ক'রে ওলিম্পাস্ পাহাড়ে ফিরে গেলেন।

এদিকে ক্যালিস্টো জুপিটারের ছলনা বুঝতে পেরে মনের দুঃখে একা একা বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। নিজের দুরবস্থার কথা ডাঅ্যানাকে জানাবার সাহস পেলেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডাঅ্যানা সব-কিছু জানতে পারলেন এবং ক্যালিস্টোকে দল থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এর কিছুদিন পরেই ক্যালিস্টোর একটি সুন্দর ছেলে হ'ল, তার নাম আর্কাস্।

দেবী জুনো জুপিটারের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় সবই জানতেন। কাজেই আর্কাসের জন্মের পর তাঁর রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ভাগ্যহীনা ক্যালিস্টোর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। এর ফলে সে একটি বড় ভালুকে রূপান্তরিত হ'য়ে করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগল। বেচারী ক্যালিস্টো এরপর থেকে ভালুকের রূপ নিয়ে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন।



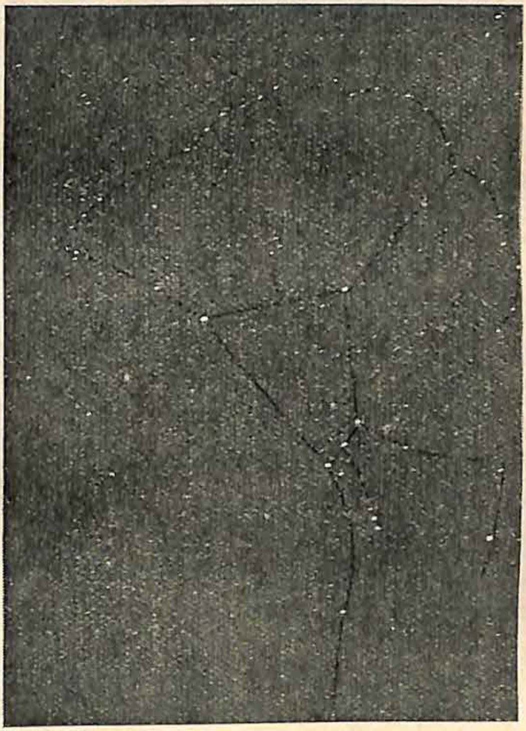
চিত্র ১৪

কালক্রমে আর্কাস্ একটি সুদর্শন ও বীর শিকারীতে পরিণত হ'ল। সে বনে জঙ্গলে ঘুরে বাঘ, ভালুক, হরিণ প্রভৃতি শিকার ক'রে বেড়াত। একদিন সে ভালুকরূপী ক্যালিস্টোকে দেখে তাকে শিকার করবার উদ্দেশ্যে তীর-ধনুক হাতে নিল। কিন্তু ভীতচকিত ভালুকটি যেভাবে সতৃষ্ণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইল তা দেখে সে খুবই বিস্মিত হ'ল। এ অবস্থায় জুপিটারের মাথায় টনক নড়ল। তিনি হঠাৎ ঝড়ের সৃষ্টি ক'রে আর্কাস্কেও একটি ছোট ভালুকে পরিণত করলেন এবং মা ও ছেলেকে উত্তর আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করলেন। এদেরই আমরা ঋক্ষ (Great Bear) এবং লঘু ঋক্ষ (Little Bear) রূপে আকাশে দেখতে পাই।

জুনোর পরম শত্রু শেষ পর্যন্ত দেবীতে পরিণত হ'ল; এতে তাঁর আফশোসের অন্ত রইল না। তাই তিনি সমুদ্র-দেবতা নেপচুনের কাছে অনুরোধ জানালেন, অন্যান্য নক্ষত্রের মতো ঋক্ষ এবং লঘু ঋক্ষকে যেন কখনও

সমুদ্রে নামতে দেওয়া না হয়। নেপচুন তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তাই আজও দেখা যায় যে অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডল পুব আকাশে উদিত হ'য়ে পশ্চিম আকাশে অস্ত গেলেও এই দু'টি নক্ষত্রমণ্ডল কখনও দিক্‌চক্রের নীচে নামতে পারে না।

জুনো যখন ওলিম্পাস্ পর্বতে থাকতেন তখন ওরায়ন (Orion) নামে একটি সাহসী ও বলবান্ শিকারী ছিল। সে দিন-রাত্রি হরিণ, বাঘ, ভালুক



চিত্র ১৫। ওরায়ন নক্ষত্রমণ্ডলের আলোকচিত্র।
তলোয়ারের মাঝের জ্যোতিষ্কটি একটি নীহারিকা।
[আলোকচিত্রী—শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ]

খরগোস প্রভৃতি শিকার ক'রে বেড়াত। জুনো ভাবলেন, এত সাহসী ও বলবান্ শিকারী থাকবে কেন? ওরায়নকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে তিনি

একটা প্রকাণ্ড বৃশ্চিককে পাঠালেন। বৃশ্চিকের কামড় ওরায়ন সহ্য করতে পারল না, বৃশ্চিকের বিষেই তার মৃত্যু হ'ল।

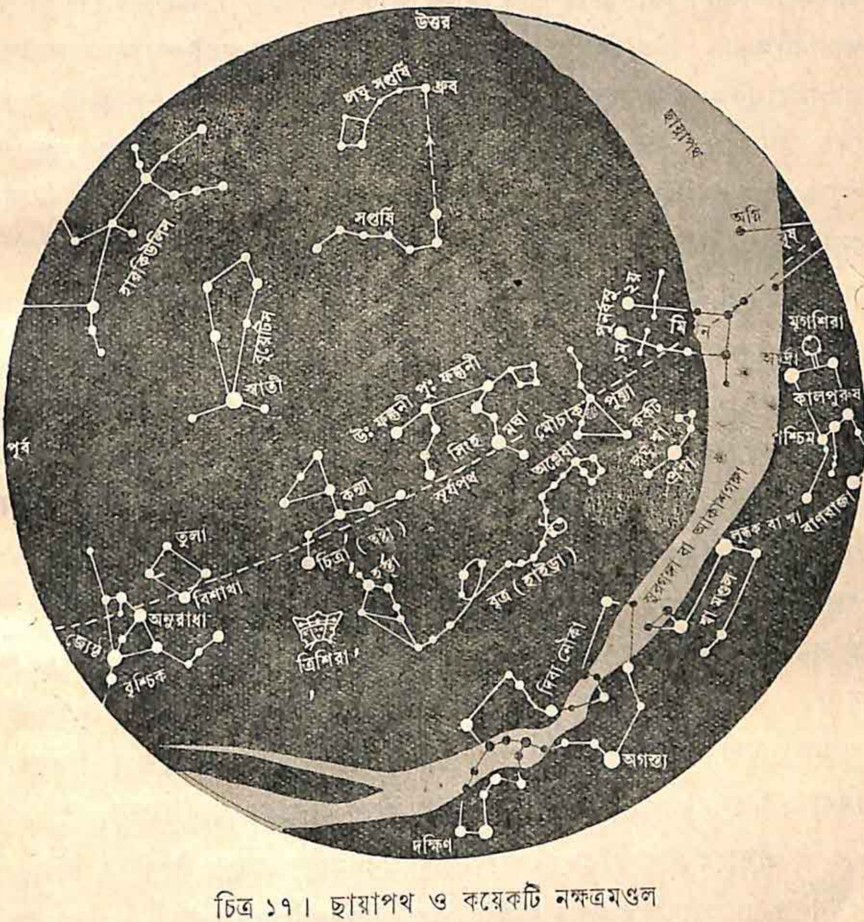
আমরা যাকে কালপুরুষ বলি, গ্রীক্ সাহিত্যে তাকেই ওরায়ন বলা হয়েছে। দেখে মনে হয়, একটা বিরাট পুরুষ যেন মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার একহাতে আছে গদা আর অন্যহাতে আছে ঢাল, কোমরে আছে কোমরবন্ধ এবং তা থেকে ঝুলছে একটি তলোয়ার। আকাশের নকশা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে পশ্চিম আকাশে কালপুরুষ অবস্থান করে সেই সময় পুব আকাশে বৃশ্চিকরাশির কিয়দংশ দেখা যায়। দিনের পর দিন কালপুরুষের কিছু কিছু অংশ অস্ত যেতে থাকে আর বৃশ্চিকরাশির কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হ'তে থাকে। এভাবে যখন পুবদিকে বৃশ্চিকরাশি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় সেসময় পশ্চিমদিকে কালপুরুষ অন্তর্হিত হয়। এটিই সম্ভবত বৃশ্চিকের কামড়ে ওরায়নের মৃত্যু ব'লে বর্ণিত হয়েছে।


চিত্র ১৬। ওরায়নের কল্পিত রূপ

এরূপ আর একটা গল্প বলছি। অনেকদিন আগে পৃথিবীতে হারকিউলিস নামে এক বীর ছিলেন। তাঁর গায়ে এত জোর ছিল যে তিনি অনায়াসে পৃথিবীকেও কাঁধের উপর ধারণ করতে পারতেন। হারকিউলিসের শক্তি ও সাহস দেখেও জুনোর ভীষণ হিংসা হ'ল। ওলিম্পাস্ পর্বতের গভীর জঙ্গলে একটা খুব বড় এবং অত্যন্ত বলশালী সিংহ ছিল। হারকিউলিসের উপর আদেশ হ'ল এই সিংহ শিকার ক'রে আনতে হবে। হারকিউলিস তীর-ধনুক, গদা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে সিংহ-শিকারে বেরুলেন। সিংহের সঙ্গে হারকিউলিসের ভয়ংকর লড়াই আরম্ভ হ'ল। হারকিউলিস যে তীর ছুঁড়লেন তা সিংহের গায়ে লেগে টুকরো টুকরো হ'য়ে

গেল, গদার আঘাতেও সে কাতর হ'ল না। উপায়ান্তর না দেখে হারকিউলিস মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সিংহ মরল।

আকাশে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, প্রথমে সিংহরাশি, তারপর গদার আকারের বুয়েটিস মণ্ডল এবং তারপর হারকিউলিস মণ্ডলের উদয় হয়। এই



চিত্র ১৭। ছায়াপথ ও কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডল

নক্ষত্রমণ্ডলগুলি অনেকদিন ধরে আকাশে একসঙ্গে দেখা যায়। শেষে একদিন সিংহ অস্ত ও অদৃশ্য হ'য়ে যায়, কিন্তু তখনও হারকিউলিসকে আকাশে দেখা যায়। সম্ভবত এজন্যই উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, হারকিউলিস মল্লযুদ্ধে সিংহকে হত্যা করেছেন।

গ্রীক্ পুরাণে বর্ণিত পারসিউস ও এণ্ড্রোমিডার উপাখ্যানটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জুপিটার (বা জিউস) এবং ডানাই-এর পুত্র পারসিউস। সেরিপুসের রাজা পলিডেক্টাস ডানাইকে দেখে মুগ্ধ হলেন, কিন্তু তাকে লাভ করার পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল যুবক পারসিউস। তাকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পলিডেক্টাস তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে, তিনি গরগন মেডুসার ছিন্ন শির এনে দেবেন। এ কাজ ছিল খুবই কঠিন। কারণ, গরগনরা তিন বোন, প্রত্যেকেই অত্যন্ত কুৎসিত এবং ভয়ংকর দানবী। তার দেহ ড্রাগনের ; কিন্তু মুখ সুন্দরী স্ত্রীলোকের মতো। মাথায় চুলের বদলে আছে অসংখ্য সাপ। মায়ার ছলনায় ভুলে যে তাদের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাবে সে-ই পাথরে পরিণত হবে। তাদের মধ্যে আবার মেডুসা ছাড়া বাকি দু'জনই ছিল অমর।

গরগনরা যেখানে বাস করত, তার সন্ধান জানত শুধু তিনটি গ্রাইয়ী (Graeae)। এরা তিন বোন তিনটি ডাইনী। এদের মধ্যে একটি-মাত্র চোখ ছিল। এক-একজন পালা ক'রে এই চোখ পরত এবং তাই দিয়ে পৃথিবীর সব-কিছু দেখত। পালা-বদলের সময় পারসিউস এই অদ্ভুত চোখটি চুরি করলেন। তখন তারা বাধ্য হ'য়ে গরগনদের বাসস্থানে যাবার পথ দেখিয়ে দিল। এই দুঃসাধ্য কাজে দেব-দেবীরা পারসিউসের সহায় হলেন। প্লুটো এমন একটি শিরস্ত্রাণ দিলেন, যার সাহায্যে অদৃশ্য হওয়া যায়। মারকারি দিলেন একটি বাঁকা তলোয়ার এবং নিজের ডানাবিশিষ্ট পাদুকা, যার সাহায্যে পাখীর চেয়েও তাড়াতাড়ি উড়ে যাওয়া যায়। আর মিনার্ভা দিলেন একটি ঢাল, যা আরশির মতো ব্যবহার করা যায়।

এভাবে সজ্জিত হ'য়ে পারসিউস গরগনদের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তারা পাথরের উপর ঘুমিয়ে ছিল। মিনার্ভার দেওয়া ঢালের মধ্যে মেডুসার প্রতিবিম্ব দেখে পারসিউস তার শিরশ্ছেদ ক'রে নিয়ে পালিয়ে এলেন। এসময় তার গলা থেকে যে রক্ত পড়ল তা থেকে পসাইডনের ঔরসজাত দু'টি পুত্র, ক্রাইসাওর এবং পেগাসাস (পক্ষিরাজ ঘোড়া), জন্মলাভ করল।

সিফিউস এবং ক্যাসিওপিয়ার কন্যা এণ্ড্রোমিডা। কোন কারণে পসাইডন এদের উপর রুষ্ট হন। তাঁর রোষ প্রশমনের উদ্দেশ্যে এণ্ড্রোমিডাকে একটি পাহাড়ের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল, একটি জল-দানবের (Cetus or Leviathan = তিমি) খাদ্যরূপে। মেডুসার ছিন্ন শির নিয়ে ফেরবার সময় যুবক পারসিউস এণ্ড্রোমিডাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তখনই জল-দানবকে আক্রমণ করলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হ'ল, শেষ পর্যন্ত তিনি জল-দানবকে বধ ক'রে এণ্ড্রোমিডাকে মুক্ত করলেন। এরপর এণ্ড্রোমিডাকে বিয়ে ক'রে তিনি আর্গসের অন্তর্গত টিরাইন্‌সে গিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। মৃত্যুর পর এঁরাই আকাশে এক একটি নক্ষত্রমণ্ডলরূপে বিরাজ করতে লাগলেন।

উত্তর আকাশে অবস্থিত কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য ক'রেই যে কবিকল্পনা জাগ্রত হয়েছিল, এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তা ছাড়া পারসিউসমণ্ডলে অবস্থিত এলগল তারাটির ঔজ্জ্বল্য পর্যায়ক্রমে বাড়ে এবং কমে। তাই দেখেই সম্ভবত মায়াবিনী মেডুসার রূপ কল্পিত হয়েছিল।



চিত্র ১৮। উত্তর আকাশের কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডল

এবার হিন্দু দেব-দেবী এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা প্রধানত শক্তির উপাসনা

করতেন। তাঁরা জগতে শক্তির অসংখ্য প্রকাশ দেখতে পান। যে বস্তুকে আশ্রয় ক'রে শক্তির প্রকাশ, তাকে দিয়েই শক্তির নামকরণ হয়েছিল। তাই দেখা যায়, সূর্য এক হ'লেও তা কখনও বিষ্ণু, কখনও ইন্দ্র, কখনও দক্ষ, আবার কখনও ঋতুপতি আদিত্যরূপে পূজিত হতেন।

ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে, বর্ষচক্র চারটি ঋতুতে বিভক্ত। এজন্য আদিকালে চার আদিত্যের উল্লেখ আছে। সেসময় তিন মাসে এক ঋতু গণনা করা হ'ত। এই চার আদিত্য আবার একত্রে বিষ্ণু নাম পেয়েছিলেন। পরে যখন ছয় ঋতু গণনা করা হ'ত তখন ছয় আদিত্যের কল্পনা করা হয়েছিল। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন লক্ষ্য ক'রে ঋষিরা হয়তো বুঝেছিলেন যে বর্ষচক্র অতিক্রম করতে বিষ্ণুকে ত্রিপাদ অতিক্রম করতে হয় (চতুর্থ পাদে তিনি আবার স্বস্থানে ফিরে আসতেন), তাই তাঁকে বলা হ'ত ত্রিবিক্রম। যখন তিনি উত্তরগমন শেষ ক'রে বর্ষা ঋতু আনেন, তখন তাঁকে বলা হয় ইন্দ্র। আবার বিষুব-বিন্দুতে এসে তিনি যখন দিবা ও রাত্রি সমান করেন তখন তাঁকে বলা হয় দক্ষ, অর্থাৎ নিপুণ।



পিনাকপাণি রুদ্র

চিত্র ১৯

পরলোকগত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্কই বেদে দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছে। দেবতা শব্দের অর্থ দীপ্তিমান্ বা জ্যোতিষ্মান্। আকাশে নক্ষত্র সংখ্যাতীত, তাই বোধহয় আমাদের দেবতার সংখ্যাও তেত্রিশ কোটি, অর্থাৎ যার কোন হিসাব করা সম্ভব নয়। ঋগ্‌বেদের দেবতা প্রত্যেকেই স্বর্গে থাকেন, কেউই অন্তরীক্ষে অথবা পৃথিবীতে থাকেন না। যাঁর দীপ্তি নেই, যিনি দিব্যলোকে থাকেন না,

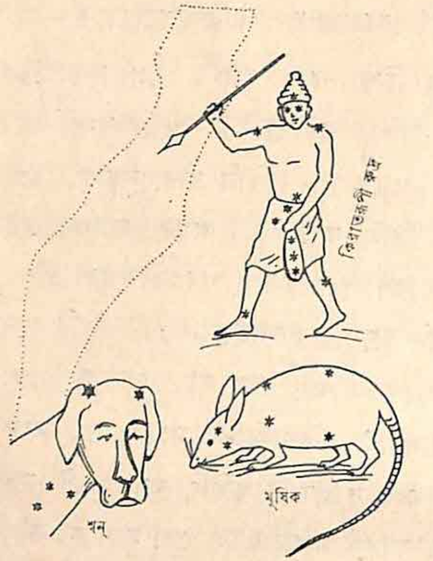
তিনি দেবতা নন। নক্ষত্র হ'ল দেবতার অধিষ্ঠানভূমি। কোন কোন নক্ষত্রের বেলায় তারার সন্নিবেশ দেখেই দেবতার রূপ কল্পিত হয়েছে।

ঋগ্‌বেদে বর্ণিত রুদ্রের কথা চিন্তা করা যাক। সেখানে তাঁর যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তাতে আছে—"তিনি জটাধারী। তিনি সুনাসিক। তিনি ত্রিলোচন (মস্তকে তিনটি তারা আছে)। তিনি বীর, দৃঢ়াঙ্গ, উগ্র, দীপ্তিমান্, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি তাম্রবর্ণ (আর্দ্রা তারার এই বর্ণ)। তিনি এক বাহু দ্বারা গদা ধারণ করেছেন (পরবর্তীকালে গ্রীষ্ম-ঋতুতে তাঁর কর্ম প্রকাশিত হ'লে তিনি বজ্রবাহু হয়েছিলেন)। তিনি বাম বাহু দ্বারা অস্ত্র (গদা কিংবা বজ্র) এবং দক্ষিণ বাহু দ্বারা জ্যামুক্ত ধনুঃ ধারণ করেছেন। এই ধনুঃ পিনাক।" বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কালপুরুষ নক্ষত্র দেখেই রুদ্রের এই রূপ কল্পিত হয়েছিল, আর এই মত সমর্থন করতে এখন কারও আপত্তির কারণ আছে ব'লে তো মনে হয় না। রুদ্রের মূর্তি উগ্র, ভয়ংকর। রুদ্র শব্দ রুদ্ ধাতু (রোদন) থেকে এসেছে। রোদয়তি (মনুষ্যান্) ইতি। মানুষ, গোরু, ভেড়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হ'ত, দৈবক্রমে সেসময়ে রুদ্রেরও উদয় হ'ত। ঋষিগণ মনে করতেন, রুদ্র মড়কের কর্তা। তিনি প্রসন্ন থাকলে ভয় থাকবে না। তাঁর কাছে সুখকর ভেষজ আছে। তাই ঋষিগণ রুদ্রের কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করতেন। রুদ্র যজ্ঞসাধক, তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ হ'ত। তাঁকে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা হ'ত। ঋষিগণ দেবতাদের কাছে কাম্য অন্ন, ধন এবং অশ্ব ও গবাদি পশু প্রার্থনা করতেন। রুদ্রের কাছেও অন্ন ও সুখ প্রার্থনা করা হ'ত।

ঋষিগণ লক্ষ্য করলেন, উষার পূর্বে একটি নক্ষত্রের উদয় হ'ল, তখন বসন্তকাল। তাঁরা মনে করলেন, সেই নক্ষত্র বসন্ত ঋতুর কারণ। কার্যের অব্যবহিত পূর্বে ও তৎকালে যা নিয়ত দৃষ্ট হয়, তা সেই কার্যের কারণ। দেখা গেল, একটি বিশেষ নক্ষত্রের উদয়ের পর জ্বর ও সংক্রামক রোগ হয়। তাহ'লে সেই নক্ষত্রে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তিমান্ পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি এসব রোগের কারণ। তাঁর স্তুতি করলে তিনি প্রসন্ন হ'য়ে রোগ

নিবারণ করতে পারেন। এরূপ কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর নির্ভর ক'রেই বেদের বিভিন্ন দেবতার রূপ এবং তাঁর স্তুতি পরিকল্পিত হয়েছে। রুদ্র এক বিশেষ উদাহরণ।

বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর পূজা-পার্বণ নামক গ্রন্থে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডল সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—



চিত্র ২০

"অথর্ববেদে রুদ্র কিরাত-রূপ, তিনি এক বৃহৎ মুখবিবর-বিশিষ্ট কুকুর লইয়া বেড়ান (চিত্র ২০)। শুক্লযজুর্বেদ লিখিয়াছেন, এক 'আখু' (ইন্দুর) রুদ্রের প্রিয় পশু।"

* * *

"কালপুরুষের মস্তকের তিনটি তারা ত্রিভুজাকারে অবস্থিত। বোধহয় এই আকার দেখিয়া শুক্ল যজুর্বেদে (১৬।২৮) রুদ্রের মুখ কুক্কুরের তুল্য বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মহাভারতের দুর্গাস্তবে দুর্গা কোকমুখা হইয়াছেন। কুক্কুরের মুখ হইতে শৃগালের মুখ আসিয়াছে, পরে পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্রই শিবা হইয়াছে। রুদ্রের নাসিকা সুন্দর, বোধহয় দীর্ঘ। রুদ্র মৃগ (আরণ্য পশুর) তুল্য ভীম। রুদ্রের নাসিকা দীর্ঘ করিয়া বরাহ কল্পনা হইয়াছিল। রুদ্রের গণ আছে, তিনি গণপতি। পুরাণের গণপতি গজানন। তিনি রুদ্রের বিঘ্ননাশন মূর্তি। কালপুরুষ নক্ষত্রে গজমুণ্ড কল্পনা যেন বিদ্রূপ মনে হয়। হস্তী ত্রিবিধ—মৃগ, মন্দ, ভদ্র। একপ্রকার হস্তীর নাম মৃগ আছে। বোধহয় মৃগ শব্দে হস্তী বুঝিয়া গজানন আসিয়াছে। আর্দ্রা তারার অরুণ বর্ণ। গণেশ মূর্তিতে তাহা হিঙ্গুল বর্ণ হইয়াছে। রুদ্রের প্রিয় আখু, গণেশের বাহন মূষিক। গণেশ ত্রিলোচন। তাঁহার

পিতামাতা নাই। বস্তুতঃ যে দেব বা দেবীর প্রতিমা ত্রিলোচন দেখা যায় তাহা রুদ্র প্রতিমার রূপান্তর।"



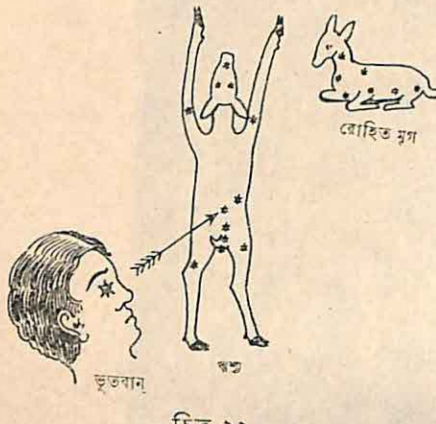
চিত্র ২১

* * *

"ঋগ্‌বেদ-সংহিতার এক ব্রাহ্মণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণে এক উপাখ্যান আছে (৩।১৩।৯)। যথা—পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ * ধরিয়া

* সংস্কৃতে নীলাঙ্গ, গবয়। ইহার চলিত নাম নীল গাই।

রোহিণীরূপিণী কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। কিন্তু প্রজাপতিকে দণ্ড দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।



চিত্র ২২

তখন তাঁহারা তাঁহাদের ঘোরতম শরীর একত্র মিলিত করিলেন। এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাঁহার নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্‌কে বলিলেন, প্রজাপতিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর। ভূতবান্ দেবগণের নিকট পশুগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাঁহার নাম পশুমান্। তিনি বাণ দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি ঊর্ধ্বে উৎপাতিত হইলেন। তাঁহাকে লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, আর যিনি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি মৃগব্যাধ। যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি রোহিণী। আর যাহা বাণ, তাহা ত্রিকাণ্ড (তিন অংশযুক্ত) বাণ হইয়াছে (চিত্র ২২)। ··· এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—(১) প্রজাপতি মৃগ নক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষত্রে গিয়াছিলেন। (২) রুদ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম, তাঁহার পশুপতি নাম মৃগব্যাধ তারায় আরোপিত হইয়াছিল। মৃগব্যাধ তারা* অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা দেখিয়া তাহা দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ কল্পিত হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণী তারায় বাসন্ত বিষুব হইত। তৎকালে নক্ষত্র-চক্রে রোহিণীর প্রাধান্য হইয়াছিল। ··· রোহিণীর বিপরীত দিকে জ্যেষ্ঠা। অতএব রোহিণীতে সূর্য আসিলে জ্যেষ্ঠায় পূর্ণিমা হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে, সে পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব ধরা হইত। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস ছিল। জ্যৈষ্ঠ এই নামেই প্রকাশ, জ্যেষ্ঠা

* লুব্ধক

নক্ষত্র প্রধান গণ্য হইত। আষাঢ় মাস হইতে পাঁচ মাস গতে মার্গ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহা নূতন কথা নয়, পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঋতু এক মাস পিছাইতে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর লাগে। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা হইতে ক্রমে যজুর্বেদের কালে বৈশাখ-পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব ঘটিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পাঁচ মাস গতে কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস হইল।

দুই সহস্রাধিক বর্ষ মার্গ মাসে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। এখন কার্তিক মাসে, শরৎ বৎসরের আরম্ভ আসিয়া পড়িল। যজুর্বেদে ঋষিগণ নক্ষত্র দর্শন করিয়া কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের আদি করিয়াছিলেন। বৈশাখ পূর্ণিমায় ও কার্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুব স্বীকার করিলেন।

পরিবর্তনটি সামান্য নয়। দুই সহস্র বৎসর মার্গশীর্ষ বর্ষ-চক্রের প্রথম মাস গণ্য হইয়া আসিতেছিল, এখন কার্তিক মাস প্রথম ধরিতে হইল। উপাখ্যান রচিত হইল। মহাভারতের বনপর্বে (২২১ অঃ) কার্তিকেয় দেবের জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অগ্নির পুত্র অগ্নি-কুমার। এজন্য তিনি কুমার (যুবা)। তাঁহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃত্তিকা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি। মৎস্যপুরাণে প্রকৃত ব্যাপার রহস্যাবৃত হইয়াছে। সেখানে কুমার রুদ্রস্থানীয় মৃগব্যাধ তারা হইয়াছেন। রুদ্রের প্রকৃত দেহ মৃগ নক্ষত্র। তাহা এই উপাখ্যানে এক অসুর কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে রুদ্রকে স্বর্গের অসুর বলা হইয়াছে। অসুরের দেহ তারায় গঠিত। এইহেতু নাম তারকাসুর। এই তারকাসুর বধের নিমিত্ত কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বধ করিতে পারেন নাই। যে তারকাসুর, সেই মহিষাসুর।


চিত্র ২৩। মহিষাসুর

তাহার আকার আরণ্য মহিষের তুল্য। এইহেতু মহাভারতে (বনপর্ব ২২৯ অঃ) কুমার কার্তিকেয় মহিষাসুর বধ করিয়াছেন।"

* * *

"দুর্গাদেবী মহিষমর্দিনী-রূপে ভাবিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এক অসুরের আকার মহিষের তুল্য ছিল, অথবা সে অসুর মহিষের আকার ধরিতে পারিত। দেবী তাহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবী রুদ্রের শক্তি, রুদ্রাণী। দেবের যে রূপ, যে গুণ, যে কর্ম্ম, যে আয়ুধ, যে বাহন, দেবীরও তাহাই।"

* * *

"গণিত দ্বারা জানিতেছি, যজুর্বেদ কালে ও তাহারও পূর্বে উত্তর ভারত (২৮°-৩০° অক্ষাংশ) হইতে দেখিলে শরদাদ্য মধ্যরাত্রে ব্যাধসহ মৃগ নক্ষত্রের উদয় হইত। দুই এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এই



চিত্র ২৪। মহিষমর্দিনী। মধ্যভারতে
নাগোড রাজ্যে আবিষ্কৃত।
পঞ্চম খ্রীস্ট শতাব্দে নির্মিত।

মৃগয়া ব্যাপার দেখা যাইত, যেন ব্যাধরূপিণী চণ্ডী মহিষরূপী অসুর বধ

করিতেছেন (চিত্র ২৪)। বোধহয় পৌরাণিক ইহাকে অবলম্বন করিয়া মহিষাসুর বধ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।”

* * *

“মহিষমর্দিনী-প্রতিমায় উগ্রচণ্ডী শূল দ্বারা এক মহিষ বিদ্ধ করিতেছেন। ইহাই মূলরূপ। এইরূপ প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ২৪)। মহিষ যে অসুর তাহা দেখাইবার নিমিত্ত মস্তকটি মহিষের,



চিত্র ২৫। মহিষমর্দিনী। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে আবিষ্কৃত।
একাদশ খ্রীস্ট শতাব্দে নির্মিত।

নিম্নাঙ্গ নরাকার হইবার কথা। বস্তুতঃ এইরূপ প্রতিমাও আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ২৫)।”

* * *

দশভুজা দুর্গার ধ্যানে অসুরের ঊর্ধ্বাঙ্গ দ্বিভুজ, খড়্গ-খেটকধারী,



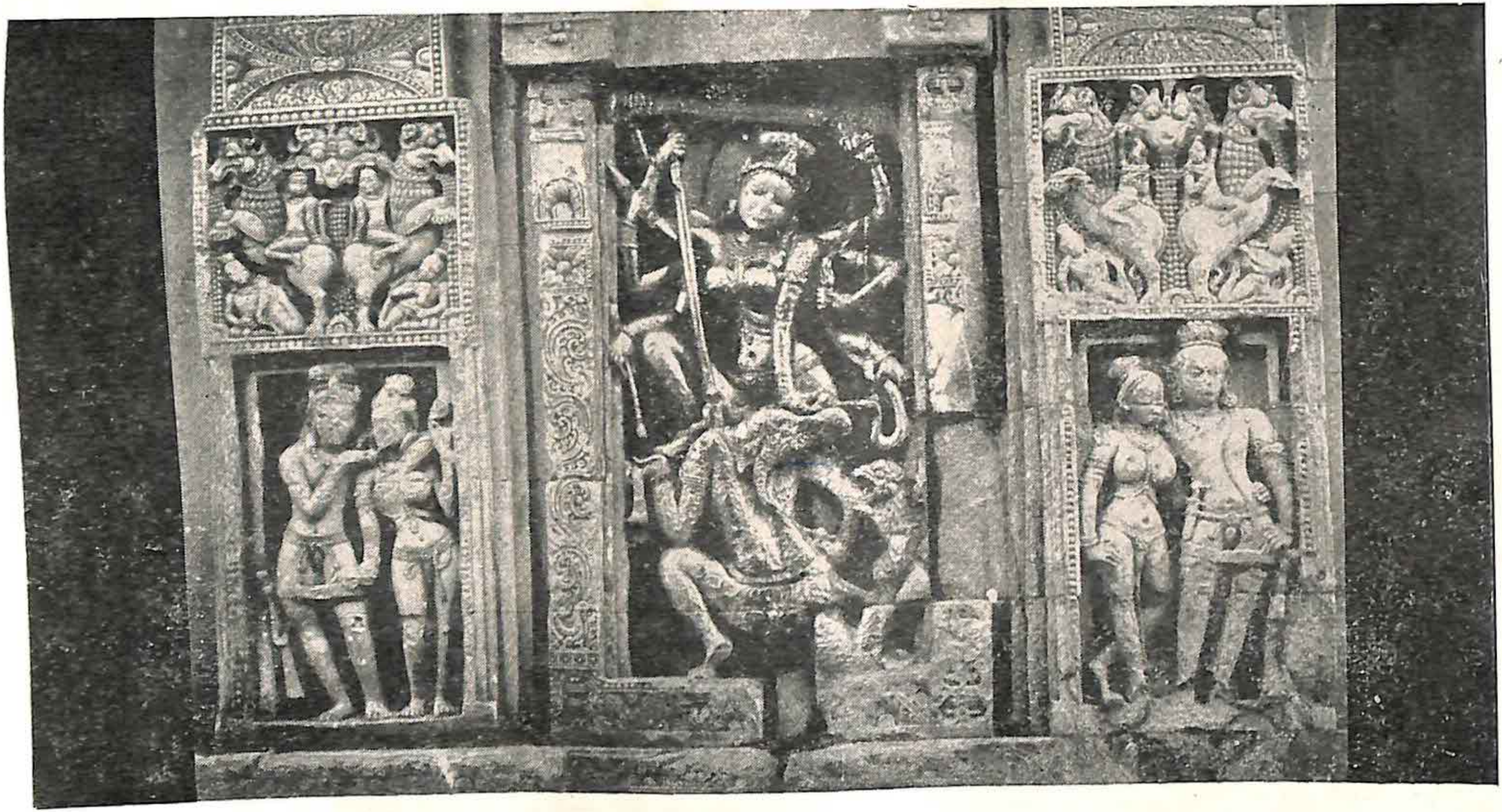
চিত্র ২৬। মহিষমর্দিনী। বঙ্গদেশে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ।

নিম্নাঙ্গ চতুষ্পদ মহিষ। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রতিমা নির্মিত হইত। ··· প্রথমে সিংহ বাহন ছিল না। পরে রুদ্রের কুক্কুর সিংহ হইয়াছে (চিত্র ২৬)।

* * *

"পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গার কন্যা নহেন। দুর্গা কার্তিক গণেশের মাতা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ গণেশ বিঘ্ননাশন রুদ্রেরই বিকৃত মূর্তি। কার্তিকের মাতা কৃত্তিকা, পিতা অগ্নি। চারিশত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের পূজার উল্লেখ করেন নাই। বোধহয় শত বৎসর পূর্বে এই চারি প্রতিমা দশভুজা প্রতিমার সহিত নির্মিত হইত না। অদ্যাপি মধ্যপ্রদেশে, যেমন জব্বলপুরে সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভুজার প্রতিমার পার্শ্বে অন্য প্রতিমা নির্মিত হয় না।"

* * *



মহিষমর্দিনী
(ওড়িষ্যার একাদশ শতাব্দীর শিল্পকার্যের নিদর্শন)

ছায়াপথের ছু'পাশে অবস্থিত ছু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র ঋষিদের কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। ঋগ্‌বেদে এই নক্ষত্র ছু'টিকে যমের প্রহরী বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও ছু'টি দিব্য শ্বার (Dogstar) উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হ'ল শ্বা বা বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডল, অন্যটি লঘু শ্বা বা ক্ষুদ্র কুক্কুরমণ্ডল। লোকমান্য তিলক এবং বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ছায়াপথই হ'ল সুরগঙ্গা, আকাশগঙ্গা বা বৈতরণী। দক্ষিণে দিকচক্রের কাছে সুরগঙ্গার মধ্যে আছে দিব্য নৌকা (Argo navis) নক্ষত্রমণ্ডল, এর প্রথম প্রভার তারা অগস্ত্যকে (Canopus) সহজেই চেনা যায়। এই দিব্য নৌকায় বৈতরণী পার হ'য়ে পরলোকে যেতে হ'লে, অর্থাৎ ছায়াপথ ধরে আকাশের দক্ষিণ সীমা থেকে উত্তর সীমায় যেতে হ'লে, প্রথমে শ্বা (লুব্ধক) এবং পরে প্রশ্বার সম্মুখীন হ'তে হয় (চিত্র ১৭ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, আকাশে প্রথমে শ্বা এবং তারপরে প্রশ্বার উদয় হয়।

এবার ইন্দ্রের বৃত্র হত্যা করার গল্পটি আলোচনা করা যাক। বৃত্র নামে এক দানব ছিল। এর একশতটি পুর বা ছুর্গ ছিল। এর আকার ছিল বিরাট এক সাপের মতো, তার হাত ও পা ছিল না। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্র হত্যা ক'রে রুদ্ধ বারি মোচন করেন। এজন্য ইন্দ্র 'বৃত্রহা' নামে পরিচিত হন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, সূর্যই ইন্দ্র। কিন্তু প্রতিদিনের সূর্য ইন্দ্র হ'তে পারেন না। তিনি বৃষ্টির দেবতা, তাঁর জন্মকালে কখন কখন মেঘ ডাকত। তিনি বজ্রহস্তে বৃষ্টিরোধকারী দানবকে হত্যা ক'রে বারি মোচন করেন, আর দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে বায়ু তাঁর সহায় হন। সাধারণত গ্রীষ্মকালে এসব লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তারপরই বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব হয়। ইন্দ্র সূর্যকে পরাভূত ক'রে তাঁর রথচক্র হরণ করেছিলেন, সুতরাং সে-সময়ে সূর্য নিশ্চল হয়েছিলেন। এসব লক্ষণ দেখে বিদ্যানিধি মহাশয় বলেছেন, সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরম্ভদিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্দ্র। বৃত্র বৃষ্টিরোধকারী, সর্পের মতো দীর্ঘ দেহ ও হস্তপদহীন, দিব্যলোকে অবস্থিত, দৃশ্যমান কোন উজ্জ্বল পদার্থ। আকাশে সর্পাকৃতি যে নক্ষত্রমণ্ডল আছে তাকেই বৃত্র ব'লে মনে করা যায়। ঋগ্‌বেদের বর্ণনা

থেকে আরও বোঝা যায় যে, হস্তার পাঁচটি নক্ষত্রে বৃত্রের মস্তক এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে তার পুচ্ছ আছে।

বৃত্রবধের অর্থ, বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র দেহ সূর্যোদয়ের আগে অল্পক্ষণের জন্য দৃষ্ট হ'য়েই উদীয়মান সূর্যের কিরণ-প্রভায় অদৃশ্য হয়েছিল। বৃত্রবধকালে সূর্য ছিলেন চিত্রা নক্ষত্রে। ইন্দ্র দক্ষিণায়ন-দিনে বৃত্রহত্যা করেন। এর অর্থ, দক্ষিণায়ন দিন থেকেই বর্ষা আরম্ভ হয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, খৃঃ পূঃ ৬৩০০ অব্দে চিত্রা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হয়েছিল। সে বৎসর ২৪শে মার্চ সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে পশ্চিম আকাশে বৃত্রের সমগ্র দেহটি দেখা গিয়েছিল। পরদিন ঐ সময়ে বৃত্রের দেহের কিছু অংশ অস্ত ও অদৃশ্য হয়েছিল। এভাবে এক-একদিন একটু একটু ক'রে বৃত্রের সমগ্র দেহ অস্ত ও অদৃশ্য হয়েছিল। এরপর ৩রা জুলাই দেখা যায়, সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র দেহ পূর্বাকাশে দৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উদীয়মান সূর্যের কিরণ-প্রভায় বৃত্র অদৃশ্য হ'য়ে গেল। একেই 'বৃত্রহত্যা' বলা হয়েছে। ২৪শে মার্চ থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত একশ' দিন, অর্থাৎ ইন্দ্র এক এক দিনে এক এক পুর হিসেবে বৃত্রের একশ'টি পুর ধ্বংস করেছিলেন। এইজন্য তাঁর আর এক নাম শতক্রতু (ক্রতু = বিক্রম)। জুলাই থেকে তিন মাস বৃত্রকে আকাশে দেখা যেত না, আর এই তিন মাস ধরে বৃষ্টি হ'ত। তাই ঋষিগণ কল্পনা করেছিলেন, বৃত্র বৃষ্টি রোধ ক'রে রেখেছিল। ইন্দ্র বৃত্র হত্যা ক'রে বারি মোচন করেন (চিত্র ১৭ দ্রষ্টব্য)।

ঋগ্‌বেদের বৃত্র গ্রীক্ পুরাণে হাইড্রা (সমুদ্র-সর্প) ব'লে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে আছে যে হারকিউলিস হাইড্রাকে বধ করেন। নক্ষত্রপট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আকাশে অনেকদিন ধরে হাইড্রা ও হারকিউলিস নক্ষত্রমণ্ডল দু'টি একসঙ্গে দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিম আকাশে হাইড্রা আগে অস্তমিত হয়। একেই হারকিউলিসের হাতে হাইড্রার মৃত্যু ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের কালিয় নাগ-দমনের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গেও এই ঘটনার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মনে হয় একই ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষির কাছে বিভিন্ন কাহিনীর রূপ নিয়েছিল।

ইন্দ্র ত্বষ্টা ও ত্রিশিরাকেও বধ করেছিলেন। ত্বষ্টা চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি। ত্রিশিরা ত্বষ্টার পুত্র। তিনি ষট্‌চক্ষুঃ এবং ত্রিশিরা। মনে হয়, চিত্রার দক্ষিণে অবস্থিত তিনটি নক্ষত্রই ত্রিশিরার তিনটি মস্তক। ইন্দ্র ত্বষ্টা বা ত্রিশিরাকে বধ করেছিলেন, এর অর্থ, কোন এক সময় দক্ষিণায়ন আরম্ভদিনে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে চিত্রা বা ত্রিশিরা উদিত হওয়ামাত্র উদীয়মান সূর্যের কিরণে অদৃশ্য হয়েছিল। সূর্য যখন দক্ষিণায়নাদি বিন্দুতে আসেন তখন ইন্দ্রের জন্ম হয়। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, খৃঃ পূঃ প্রায় ৭০০০ অব্দে চিত্রার উদয়কালে সূর্য (ইন্দ্র) বিশাখা নক্ষত্রে থাকতেন। তখন এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

ঋগ্‌বেদে শ্যেন পক্ষীদ্বারা সোম-আহরণের একটি উপাখ্যান আছে। শ্যেনপক্ষী দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ ক'রে আনছিল। তাই দেখে কৃশানু ধনুতে জ্যা-রোপণ পূর্বক শ্যেনের প্রতি শর নিক্ষেপ করলেন। এর ফলে পক্ষীর একটি পাখা পড়ে গেল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেবগণ গায়ত্রীকে সোম আনতে বলেন। তাই গায়ত্রী সোমরক্ষকগণকে ভয় দেখিয়ে দুই পা ও মুখ দিয়ে সোমকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। তখন কৃশানু বাণ নিক্ষেপ ক'রে তার নখ ছিঁড়ে দেন। সেই নখ শল্যক হয়।

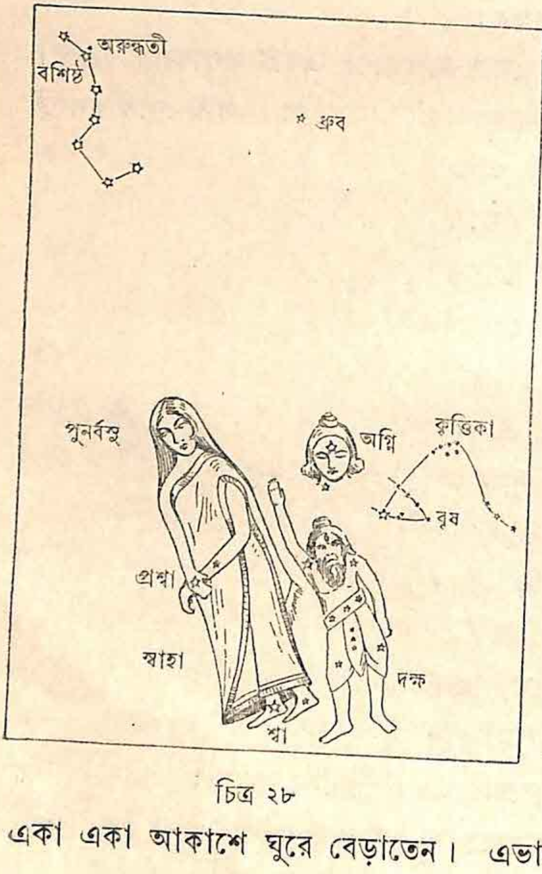


চিত্র ২৭

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এক সময় ইন্দ্র মূলা নক্ষত্রে নমুচি (বৃশ্চিক-রাশির লেজে অবস্থিত) বধ করেছিলেন। সেদিন অবাবস্যা ছিল। এর একদিন বা দু'দিন পরে এককলা চন্দ্র পূর্ব-আষাঢ়া নক্ষত্রে দেখা গিয়েছিল।

কৃশানু উত্তর-আষাঢ়া এবং শ্যেনপক্ষী শ্রবণা নক্ষত্রের অধিপতি। কৃশানু ধনুর্ধর। তিনি ধনুর্বাণ দ্বারা শ্যেনপক্ষীর পাখা বা নখ ছিন্ন করেছিলেন। আকাশে ধনুরাশির উত্তরেই শ্যেন নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্যেনপক্ষীর একটি পাখা এবং নখই শুধু ছায়াপথের মধ্যে পড়েছে। এই হু'টি নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য ক'রেই যে কবিকল্পনা জাগ্রত হ'য়েছিল সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা সাতজন আর্য ঋষির নামে পরিচিত। এদের নাম—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। পুলহ ও ক্রতুকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ ক'রে সেই রেখাটি বাড়িয়ে দিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির উপর দিয়ে যায়, তারই নাম ধ্রুবতারা। বশিষ্ঠের কাছে একটি ছোট্ট তারা দেখা যায়, এর নাম অরুন্ধতী। ইনি বশিষ্ঠের স্ত্রী।



চিত্র ২৮

অন্য ছ'জন ঋষির প্রত্যেকেরই স্ত্রী ছিল, তাঁদের নাম—সন্নতি, ক্ষমা, প্রীতি, অনসূয়া, লজ্জা ও সম্ভূতি। এই সাতজন ঋষি-পত্নীর মধ্যে শুধু অরুন্ধতী তাঁর স্বামীর কাছে রয়েছেন, এর কারণ কি? এ সম্পর্কে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে।

অনেকদিন আগেকার কথা, অগ্নিদেব (বৃষরাশির শৃঙ্গরূপে কল্পিত দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রটির অধিপতি) একা একা আকাশে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়

তিনি এই সাতজন ঋষি-পত্নীকে দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু ঋষি-পত্নীরা তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এতে অগ্নিদেবের খুব দুঃখ হ'ল। এর প্রতি-বিধানের জন্যে তিনি ঘোরতর তপস্যা সুরু করেন। এদিকে তপস্যারত অগ্নির তেজমণ্ডিত রূপ দেখে দক্ষের কন্যা স্বাহা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু উপায় কি? অগ্নি তো অন্য কাউকে পেলে সন্তুষ্ট হবেন না। তাই তিনি ঋষিকে ভোলাবার উদ্দেশ্যে এক একদিন এক একজন ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ ক'রে অগ্নির কাছে যেতে লাগলেন। এভাবে স্বাহা পর পর ছ'জন ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নিকে ছলনা করলেন, কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করতে সাহস পেলেন না।

সপ্তর্ষিদের মধ্যে একমাত্র বশিষ্ঠ বাদে বাকি ছ'জন ঋষি যখন তাঁদের স্ত্রীদের কলঙ্কের কাহিনী শুনলেন, তখন তাঁরা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তাঁদের আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এঁরাই আকাশে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে দল বেঁধে রয়েছেন। অরুন্ধতীর কোন ত্রুটি প্রকাশ পায়নি তাই তিনি আজও স্বামীর পাশেই রয়েছেন।

একই তারা সন্নিবেশ দেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাহিনী রচিত হয়েছিল, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বেদে অদিতির উল্লেখ আছে। অদিতিও দক্ষের কন্যা। একদা বাসন্ত বিষুবদিনে ঊষার পূর্বে কালপুরুষের উদয় হ'ত। ঋষি মনে করলেন, কালপুরুষই দিবা ও রাত্রি সমান করেছে। কাজেই কালপুরুষ দক্ষ, অর্থাৎ নিপুণ। কালপুরুষের উদয়ের পরই অদিতির উদয় হয়; অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা। মনে হয়, সময়ান্তরে অদিতিই স্বাহা নামে পরিচিত হয়েছিল। বাস্তবিক, আকাশে সপ্তর্ষি, স্বাহা, দক্ষ, অগ্নি, কৃত্তিকা প্রভৃতির অবস্থান লক্ষ্য করলে এই কাহিনীর সারমর্ম বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না।

হিন্দু পুরাণে এইরূপ উপাখ্যান আরও অনেক আছে, আর তাদের চিত্ররূপ ফুটে রয়েছে আকাশের পটে।

বিদ্যানিধি মহাশয় একদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অপরদিকে বেদ, পুরাণ এবং সামাজিক অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ মন্থন ক'রে সংশয়াতীত রূপে প্রমাণ

করেছেন যে বেদ ও পুরাণের অসংখ্য দেবতা, তাদের স্তব বা কীর্তি-কাহিনী কোনটিই সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং তাদের অবস্থানের সঙ্গে এসবের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বেদের মন্ত্র বা পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিচার না করলে এদের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই রহস্য সমাধানের প্রধান চাবিকাঠি আমরা পেয়েছি বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাছ থেকে। তিনি যে শুধু আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে গণনা ক'রে বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেছেন তা নয়, বিভিন্ন উপাখ্যানের সঙ্গে আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অবস্থান ও গতিবিধির সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে অসংখ্য তথ্য এবং প্রমাণাদিও উপস্থিত করেছেন। এগুলি একদিকে যেমন অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন সাহিত্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে নূতন আলোকপাত ক'রে আমাদের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে তোলে। আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীন ঋষিরা প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা আকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সম্যক পরিচয় জানতেন, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে নির্ভুল গণনা করতে পারতেন আর আকাশের কোন বৈচিত্র্যই তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বছরের পর বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁরা যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাই তাঁরা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুলি আমরা বিচার ক'রে দেখতে পারিনি তাই এদের সারমর্মও আমরা এতকাল ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে সভ্যতার ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে ভারত আজ এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।

আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রাচীন যুগের মানুষ যখন পৃথিবীকে দেখতে শিখল, অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করতে

শিখল, তখন তার মন অপূর্ব এক অনুভূতির আনন্দে ভরপূর হ'য়ে উঠল। ঋষি তখন হ'য়ে উঠলেন কবি। বৈদিক ঋষিদের অসংখ্য মন্ত্রে ও গানে কবিত্ব আছে যথেষ্ট, কিন্তু তা অবিমিশ্র কাব্য নয়। একটা বিস্ময়ের প্রেরণায় সেখানে ধর্ম ও সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে রয়েছে।

বৈদিক ঋষিরা যেমন সূর্য, চন্দ্র, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তব করতেন, তেমনি দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর স্তব ও প্রার্থনা করতেন। ঋষি বলছেন—

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

'পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত প্রাণীদের পিতামাতার ক্রোড়ে শিশুর মতো রক্ষা করছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী! আমাদের মহাপাপ থেকে রক্ষা কর।'

তাঁরা শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারও স্তব করতেন। এঁর কাছে ঋষি প্রার্থনা করছেন—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বন্তরীক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত-
রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ
শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্॥

'ওষধিসমূহ আমাদের জন্য মধুময় হোক, দ্যুলোকসমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুময় হোক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুময় হোন। আমরা অহিংসিত হ'য়ে তাঁকে অনুসরণ করব। বলীবর্দসমূহ সুখে (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কাজ করুক) এবং লাঙল সুখে কর্ষণ করুক।'

এই প্রার্থনারই পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যায় নীচের মন্ত্রে—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

'বাতাস সব ঋতুতেই মধু বহন করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে, আমাদের ওষধিসমূহ মধুময় হোক ; রাত্রি মধুময় হোক, ঊষা মধুময় হোক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক, আমাদের পিতা ও দ্যুলোক মধুময় হোক ; আমাদের বনস্পতি মধুময় হোক, সূর্য মধুমান্ হোক, আমাদের গাভীগুলিও মধুময় হোক।'

বিশ্বসৃষ্টির পানে তাকিয়ে বৈদিক ঋষিগণ প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ
সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরীক্ষং॥
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতা সো
ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতি শৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রং॥

'পৃথিবী, দ্যুলোক, জলসমূহ, সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদের শ্রবণ করুন। মরুদ্‌গণ এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হ'য়ে আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সঙ্গে অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, মরুদ্‌গণ আমাদের কল্যাণকর সুখ দান করুন।'

এ ছাড়া অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডে পৃথিবীর যে বন্দনা আছে তা একদিকে যেমন সহজ কবিত্বময়, অন্যদিকে সেই বন্দনার ভেতর দিয়েই মাতা বসুন্ধরার সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কটি অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, বন-উপবন, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা সব-কিছুর ভেতর

দিয়ে সেই জননীর স্নেহ আমাদের উপর বর্ষিত হোক, এই হ'ল ঋষি-কবির প্রার্থনা।

এখানে গ্রীক্ পুরাণের প্রসার্পিনীর কাহিনীটি আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'লেন সেরেজ। তাঁর কৃপাতেই শস্যক্ষেত্র ফুলে ফলে ভরে ওঠে, কাজেই এই বিশাল পৃথিবীর সকল মানুষের খাদ্য, অর্থাৎ তাদের জীবন, একান্তভাবে তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। তাঁর একটি অতি সুন্দর এবং সুখী মেয়ে ছিল; নাম তার প্রসার্পিনী। তিনি সখীদের সঙ্গে ফুলের বনে নেচে গেয়ে আনন্দে দিন কাটাতেন। অন্ধকার পাতালপুরীর রাজা প্লুটো একদিন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রসার্পিনীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। আর তাকে জোর ক'রে রথে তুলে পাতালপুরীতে পালিয়ে গেলেন।

সেরেজ তাঁর মেয়েকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। মেয়েকে না দেখে, তিনি পাগলের মতো কেঁদে কেঁদে চারদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর কর্তব্যে অবহেলা হ'তে লাগল। মাঠের ফসল শুকিয়ে গেল, চারদিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অসহায় বুভুক্ষু মানুষ করুণ কণ্ঠে দেবী সেরেজের কৃপা প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু বিফলকাম সেরেজ সুদীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত করুণ আঁখি মেলে ধীরে ধীরে বললেন, "যতদিন আমার প্রাণাধিক প্রিয় প্রসার্পিনীকে খুঁজে না পাব, ততদিন শুধু মেয়ের কথাই ভাবব, অবহেলিত পৃথিবীর যত্ন নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।" পৃথিবীর মানুষ তখন দেবরাজ জুপিটারের শরণ নিল। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাল, যাতে প্রসার্পিনীকে তার মায়ের কাছে অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে জুপিটারের দয়া হ'ল। তিনি বললেন, প্রসার্পিনী তার মার কাছে ফিরতে পারবে, যদি প্লুটোর রাজত্বে থাকাকালে সে কিছুই আহার না ক'রে থাকে। দেবী সেরেজ মহানন্দে ছুটে গেলেন পাতালপুরীতে, তাঁর মেয়ের কাছে। কিন্তু হায়! ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে সেই দিনই প্রসার্পিনী মাত্র ছ'টি ডালিমের বীজ খেয়েছেন। কাজেই

ব্যবস্থা হ'ল, এর শাস্তিস্বরূপ প্রসার্পিনীকে প্রতিবছর ছ'মাস ক'রে পাতালপুরীতে প্লুটোর কাছে কাটাতে হবে।



চিত্র ২৯। প্রসার্পিনীর প্রত্যাবর্তন

প্রসার্পিনী ছ'মাস তার মায়ের কাছে থাকে। এসময় সেরেজ আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে ওঠেন। চারদিকে ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, প্রকৃতি যেন তাঁর আদরিনী কন্যাকে সাদর আহ্বান জানান।

'লিজেণ্ডস্ অব্ গ্রীস্ অ্যাণ্ড রোম' নামক গ্রন্থে আছে—"Some people say that Proserpine really is the springtime, and that while she is with us all the earth seems fair and beautiful. But when the time comes for Proserpine to

rejoin King Pluto in his dark home underground, Ceres hides herself and grieves through all the weary months until her daughter's return.

Then the earth, too, is sombre and sad. The leaves fall to the ground, as though the trees were weeping for the loss of the fair, young queen ; and the flowers hide underground, until the eager step of the maiden, returning to earth, awakens all nature from its winter sleep."

* * *

The Voice of Spring

I come, I come ! ye have called me long ;
I come o'er the mountains, with light and song.
Ye may trace my step o'er the waking earth
By the winds which tell of the violets' birth,
By the primrose stars in the shadowy grass,
By the green leaves opening as I pass

....

—*Felicia Hemans*

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তন সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কবিমনে নিত্য নূতন আবেগের সৃষ্টি হয়। ষড়্-ঋতুর রূপবৈচিত্র্যে কবিমন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। আর কবির বিচিত্র অনুভূতি রূপায়িত হ'তে থাকে নিত্য নূতন কাব্যে ও সঙ্গীতে। এজন্য আমরা দেখতে পাই, ঋষি-কবি বাল্মীকির রামায়ণ,‡ মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার ও অন্যান্য কাব্য এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য, কবিতা ও গান ষড়্-ঋতুর অসংখ্য বর্ণনায় সমৃদ্ধ।

কবির পালা সুরু হয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী দিয়ে। ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল। বসন্তে প্রকৃতির এক অভিনব নবীন বেশ। গাছে গাছে নূতন

‡ রামায়ণের উদ্ধৃতিগুলি শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর "বাল্মীকি-রামায়ণ" নামক গ্রন্থ থেকে অনুবাদসহ গৃহীত হয়েছে।

পাতা, গাছে গাছে ফুলের সমারোহ। প্রজাপতির দল রং-বেরঙের ডানা মেলে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, দিকে দিকে কোকিল ও অন্যান্য পাখীর সুমধুর ডাক। বসন্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বলেছেন—

"পদ্মকুমুদশোভিত মৎস্যসমাকুল পম্পাসরোবরের তীরে এসে রাম বললেন,

পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগ প্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্॥
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ॥
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখাঃ নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুতশ্চলিতঃ স্থানৈঃ ষট্‌পদৈরনুগীয়তে॥
মত্তকোকিলসংনাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ॥

—সৌমিত্রি, এই পুষ্পিত বনরাজির রূপ দেখ, মেঘ যেমন জলবর্ষণ ক'রে বন সেরূপ পুষ্পবর্ষণ করছে। কাননের বিবিধ বৃক্ষ বায়ুবেগে সঞ্চালিত হ'য়ে রমণীয় প্রস্তরভূমির উপর পুষ্প বিকীর্ণ করছে। কতক পুষ্প পড়ে গেছে, কতক পড়ছে, কতক বৃক্ষেই রয়েছে, বায়ু যেন সর্বত্র পুষ্প নিয়ে খেলা করছে। নানা বৃক্ষের কুসুমময় শাখা সঞ্চালিত ক'রে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, ভ্রমরগণ গুঞ্জন ক'রে তার অনুসরণ করছে। পর্বতকন্দর থেকে সশব্দে নিষ্ক্রান্ত বায়ু যেন গান করছে এবং মত্ত কোকিলের ধ্বনি সহকারে যেন পাদপসমূহকে নাচাচ্ছে।"

বসন্তে প্রকৃতির অভিনব রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন.

"ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।



ফাগুন লেগেছে বনে বনে—

রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে ॥

এ ছাড়া 'বসন্ত' নৃত্যনাট্যে কবি ঋতুরাজ বসন্তের যে বন্দনা গান গেয়েছেন তার কোন তুলনা নেই।

ঋতুরাজের আগমন-বার্তা নিয়ে এল দখিন হাওয়া। চাঁপা, করবী সাজলো রঙিন সাজে, তাদের ডালপালা হ'য়ে উঠলো উতলা। উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে মুকুলছাওয়া বকুলবনে দোল দিয়ে যায়। আকাশে ওঠে পূর্ণিমার চাঁদ। বকুলদল গেয়ে ওঠে,

"ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।

* * *

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।"

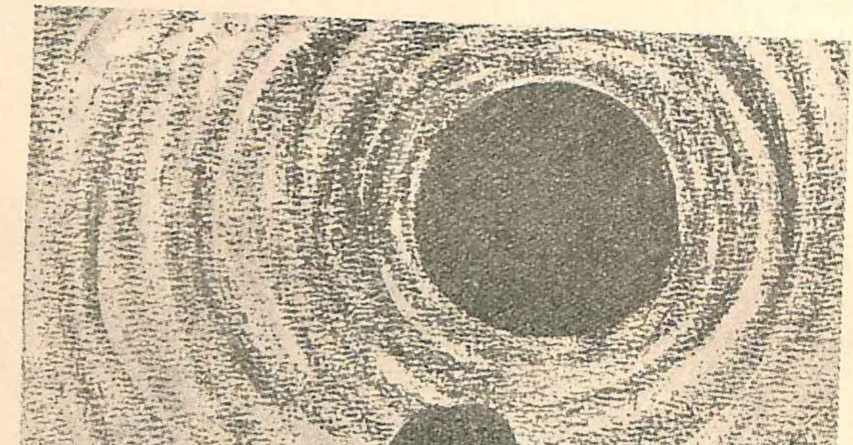
আর নদী গায়,

"কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগাল
ওই চাহনি তুফান তোলা।"

এরপর এলেন ঋতুরাজ বসন্ত। তাঁর চূড়ায় কৃষ্ণচূড়া, মালার মাঝে বকুল। তাঁর পথের ধারে বনের ঘাসে ফুটেছে নাম-না-জানা বনফুল। তাঁর সাজি ভরবে সেই আশায় ফুটেছে শিরীষ।

বসন্তের পরেই আসে গ্রীষ্ম। বাইরের উষ্ণ বাতাসে সহসা প্রকৃতি যেন জ্বলে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়। তাই কবি বলেছেন,

"রসহীন তরু, নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধার করে হাহাকার
ধরা-ভাণ্ডার রিক্ত ॥"



চিত্র ৩০। প্রখর তপন তাপে
আকাশ তৃষায় কাঁপে
বায়ু করে হাহাকার।

অন্যত্র—

"প্রখর তপন তাপে
আকাশ তৃষায় কাঁপে
বায়ু করে হাহাকার।"

তাপদগ্ধ পৃথিবী যেন তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে ওঠে, একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করতে থাকে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাড়নায় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবিও যেন অসহ্য ব্যথায় কাতর হ'য়ে ওঠেন, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেয়ে ওঠেন—

"চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥"

তখন কবি করুণকণ্ঠে প্রার্থনা জানান,

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল ছলছল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল, কলকল ছলছল।"

অবশেষে তৃষাতুরা, তপঃক্লিষ্ট প্রকৃতির প্রতীক্ষার একদিন অবসান হয়। বর্ষার স্নিগ্ধ বারিধারায় স্নান ক'রে তাপদগ্ধ পৃথিবীর বুক শীতল হয়, মধুর হয় প্রকৃতির পরিবেশ। শুষ্কতার, তৃষাদীর্ণ আকুলতার অবসান ঘটিয়ে বর্ষা নিয়ে আসে নূতনের আভাস, পূর্ণতার ইঙ্গিত। মনে ও বনে, হৃদয়ে ও মাটিতে সুরু হয় বর্ষার নববোধন। বর্ষা মানুষকে করেছে কবি, তাই যুগে যুগে কবিরা বর্ষার বন্দনা ক'রে গেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বর্ষাঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু।"

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে আছে—

"রাম মাল্যবান্ পর্বতে গিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন,

অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সংপশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ॥
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্॥

শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপান পঙ্‌ক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ॥
এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥

—দেখ, বর্ষাকাল সমাগত হয়েছে, পর্বততুল্য মেঘে নভোমণ্ডল আবৃত। সূর্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান ক'রে আকাশ ন'মাস গর্ভধারণ করেছিল, এখন জলরূপ রসায়ন প্রসব করছে। এই মেঘের সোপানপঙ্‌ক্তি দিয়ে আকাশে উঠে কুটজ (কুড়চি) অর্জুন পুষ্পের মালায় সূর্যকে অলংকৃত করা যেতে পারে। পৃথিবী সূর্যতাপে পরিক্লিষ্ট ছিলেন, এখন নববারিপাতে সিক্ত হ'য়ে যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পমোচন করছেন।

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদ্‌প্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য॥
বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্র কূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥
বর্ষোদকাপ্যায়িত শাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্যোৎসব বর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি॥

—মেঘ বিক্ষিপ্ত থাকায় আকাশ কোথাও দেখা যাচ্ছে, কোথাও অদৃশ্য হয়েছে, কোথাও কোথাও পর্বতাকীর্ণ নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় বোধ হচ্ছে। বিদ্যুৎ পতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করছে। দেখ, অপরাহ্নে বন যেন অধিকতর শোভান্বিত হয়েছে, তাতে ময়ূরের দল নৃত্যোৎসব করছে।

ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং
প্লবং গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ—
র্বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্॥

—বনে যেন সঙ্গীত হচ্ছে—ভ্রমরঝংকার তার মধুর বীণাধ্বনি, ভেকের রব কণ্ঠতাল, মেঘগর্জন মৃদঙ্গনিনাদ।

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি।
বর্ষ প্রবেগা বিপুলাঃ পতন্তি
প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং
নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ॥
ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ।

—নানা আকারের নানা বর্ণের ভেক অবরুদ্ধ স্থানে দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিল, এখন তারা মেঘের শব্দে জাগরিত এবং নবজলধারায় সিক্ত হ'য়ে নানা-প্রকার রব করছে। বিপুল বৃষ্টিপাত হচ্ছে, বায়ু প্রবল বেগে বইছে, নদীর জলপ্রবাহ তটদেশ ভগ্ন এবং পথ রোধ ক'রে খরবেগে চলেছে। আকাশ মেঘে আবৃত, তারা সূর্য দেখা যায় না, নবজলধারায় ধরণী পরিতৃপ্ত, সর্বদিক অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়েছে।"

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বর্ষাকে নব নব ভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁদের বিভিন্ন কাব্যে। কালিদাস তাঁর ঋতুসংহার কাব্যে বর্ষার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দ্দলঃ।
সমাগতোরাজবদুদ্ধত দ্যুতি
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে। ১ ॥
নিতান্তনীলোৎপল পত্রকান্তিভিঃ
ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশি সন্নিভৈঃ।
....
সমাহিতং ব্যোমঘনৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥

—"প্রিয়ে দেখো বর্ষা ঋতু এসেছে রাজার মতো তার দ্যুতি, জলভরা মেঘ এই রাজার মত্তহস্তী, তড়িৎ তার পতাকা, বজ্রের নির্ঘোষ মাদলের জয়ধ্বনি। আকাশে মেঘ টলমলো, কোন মেঘ নীলোৎপলের মতো নীল, কোন মেঘ কাজলের মতো কালো।"

কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে বর্ষার এক সার্থক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোন সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর-বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।"

ষড়্-ঋতুর প্রতিটি পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের কবিমনে দোলা জাগালেও তাঁর কাছে বর্ষা ঋতুর একটা পৃথক আবেদন ছিল। বর্ষার মতো আর কোন ঋতুই তাঁকে এমন ক'রে আকুল ক'রে তোলেনি।

বর্ষার জলভারাক্রান্ত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দেখে তিনি বলেছেন—

"দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং।

ও-পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপ্সা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায় এক শ মাণিক জ্বালা।

অন্যত্র,

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।"

নবীনা বরষার আগমনে কবির মনে এক অপূর্ব আবেগের সঞ্চার হয়েছে, তাই তিনি উচ্ছ্বাসভরে গেয়েছেন—

"এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন-সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।"

নব বরষার প্রকৃতির মধ্যে কবি যেন তাঁর মানসীর দেখা পেলেন। তিনি গাইলেন,

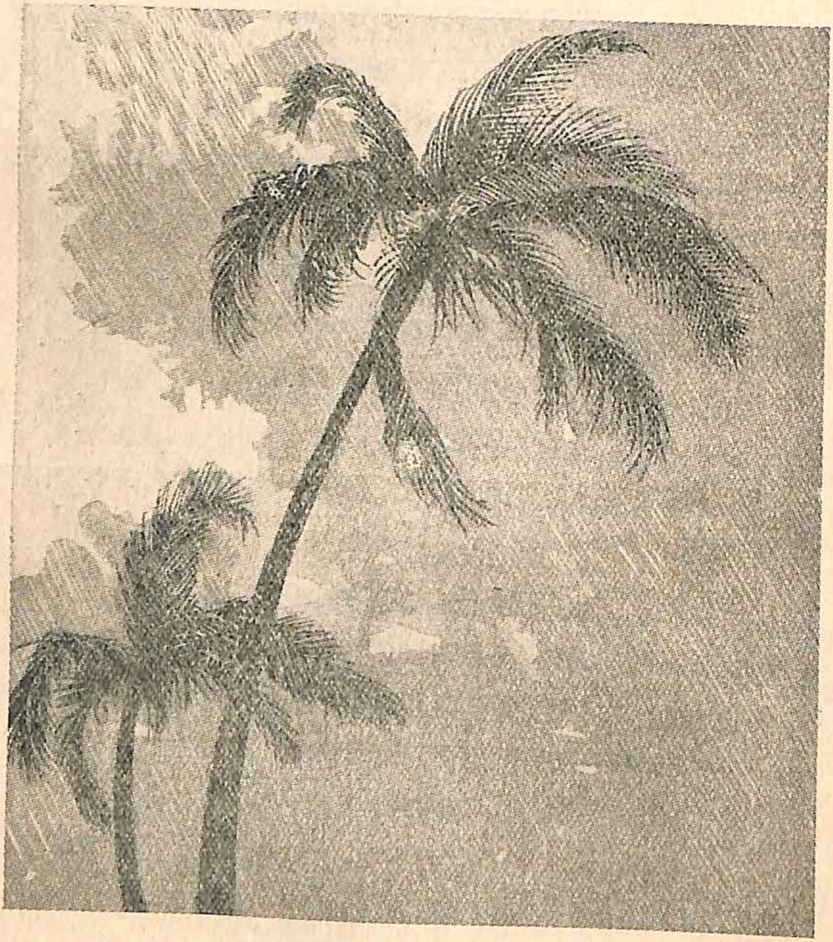
"আজি আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"

কবি তাঁর মানসীকে অন্তরের আকূতি জানালেন,

"এস গো গগনে আঁচল লুটায়ে
এস গো সকল স্বপন ছুটায়ে
এ পরাণ ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়
আজি জলভরা বরষায়।"

আবার বর্ষার রিমিঝিম ধ্বনি কবিকে মাতাল ক'রে তুলল। হংস-বলাকার পাখায় ভর ক'রে তাঁর মন উধাও হ'য়ে যেতে চাইল কোন্ সুদূরের পানে। তিনি গাইলেন,

"মন মোর মেঘের সঙ্গী,
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে
রিমিঝিম-রিমিঝিম-রিমিঝিম ॥



চিত্র ৩১। এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা।

মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিত ক্বচিত চকিত তড়িত-আলোকে।"

এরপর একদিন বর্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে আসে, সাদা সাদা মেঘের দল ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। শিউলিতলায় ফুলের সমারোহ, ভোরবেলার শিশির আর সোনার বরণ রোদ শরতের আগমন ঘোষণা করে।

শরৎ ঋতুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বলেছেন, "সীতাকে স্মরণ ক'রে রাম শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে বললেন, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সলিলদানে বসুন্ধরাকে তৃপ্ত করেছেন, শস্য উৎপাদন ক'রে কৃতকার্য হয়েছেন। মেঘ সকল জলবর্ষণ ক'রে পরিশ্রান্ত হয়েছে। মেঘ হস্তী ময়ূর আর প্রস্রবণের রব সহসা থেমে গেছে।

শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং
প্রভাসু তারার্কনিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং
শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা॥
মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ
পুষ্পাগ্রভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণ গৌরৈর্নয়নাভিরামৈ—
রুদ্যোতিতানীব বনান্তরাণি॥
ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং
কৃশপ্রবাহাণি নদী জলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি
তমোবিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ॥

—সপ্তচ্ছদের (ছাতিম গাছের) শাখায়, সূর্য-চন্দ্র-তারার প্রভায় এবং গজেন্দ্রের লীলায় নিজ শোভা বিভক্ত ক'রে শরৎ আজ উপস্থিত হয়েছে। সুগন্ধ সুন্দর সুবর্ণ গৌর প্রচুর পুষ্পভারে প্রিয়ক (পিয়াশাল) তরুর শাখাগ্র অবনত, তাতে বন যেন আলোকিত হয়েছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে, তার বর্ণ পরিমার্জিত অসির ন্যায়, নদীর জলপ্রবাহ ক্ষীণ হয়েছে, কহ্লার

(শ্বেতপদ্ম) সুরভিত শীতল বায়ু বইছে, সর্বদিক তমোমুক্ত হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্নমিবান্তরীক্ষম্ ॥
নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি ॥
জলং প্রসন্নং কুসুমং প্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্বম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ
শংসপ্তি বর্ষব্যপনীতকালম্ ॥

—ওই বিশাল হ্রদের জলে অনেক কুমুদ ফুটে আছে, তার মধ্যে একটি হংস সুপ্ত রয়েছে, যেন রাত্রিতে মেঘশূন্য তারাসমাকীর্ণ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। নদীর তীরে নববিকশিত কাশপুষ্প মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত হ'য়ে ধৌত নির্মল ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। স্বচ্ছ জল, প্রস্ফুটিত কুসুম, ক্রৌঞ্চের রব, পরিপক্ক ধান্যের ক্ষেত্র, মৃদুবায়ু ও বিমল চন্দ্র বর্ষার অন্ত সূচনা করছে।"

শরতের আগমন ঘোষণা ক'রে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন,—

"আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা,
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।"

আবার শারদলক্ষ্মীকে আবাহন জানিয়ে তিনি গেয়েছেন,—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,



"ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা,

এসো নির্মল নীল-পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরি-পর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল শীতল-শিশির-ঢালা ॥"

আবার শরৎ রাণীকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি গাইলেন,—

"শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি ॥"

শরতের অবসানে হেমন্তের আগমন হয়। তখন প্রকৃতি যেন হিমের স্বচ্ছ ওড়না টেনে অবগুণ্ঠনবতী হন। বাল্মীকি অরণ্যকাণ্ডে হেমন্ত-ঋতুর এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

"সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম পঞ্চবটীতে সুখে বাস করতে লাগলেন। শরৎকাল অতীত হ'য়ে হেমন্ত আগত হ'ল। একদিন প্রভাতকালে রাম গোদাবরীতে স্নান করতে গেলেন, তাঁর পশ্চাতে সীতা এবং কলসহস্তে লক্ষ্মণ চললেন। লক্ষ্মণ রামকে বললেন,—

অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলংকৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ ॥
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ ॥
বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ ॥
খর্জূরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥
অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা ॥

এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্‌ভা ইবাহবম্‌॥

—প্রিয়ংবদ, যে ঋতু আপনার প্রিয় তা এখন উপস্থিত, এর আগমনে সংবৎসর যেন মঙ্গলময় ও অলংকৃত হয়েছে। পশ্চিমবায়ু স্বভাবত শীতল-স্পর্শ, এখন হিমের জন্য দ্বিগুণ শীতল হ'য়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অরণ্য সকল বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হয়েছে, সূর্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করছে। তণ্ডুলপূর্ণ কনকবর্ণ ধান্যের শীর্ষ খর্জূরপুষ্পের ন্যায় কিঞ্চিৎ নত হ'য়ে শোভা পাচ্ছে। নীহারপাতে ঈষৎ আর্দ্র হরিদ্বর্ণ তৃণময় স্থানে তরুণ সূর্যকিরণ পড়ায় বনভূমি শোভিত হয়েছে। ভীরুজন যেমন যুদ্ধে নামে না, এ সকল জলচর বিহঙ্গ সেরূপ জলের নিকটে থেকেও অবগাহন করছে না।"

হেমন্তে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা॥
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।"

কিংবা,

"হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
... ...
শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।"

হেমন্তের পরে এল শীত। মাঠে মাঠে ধান পাকতে লাগল। কবি গাইলেন,—

"এলো যে শীতের বেলা বরষ-পরে।
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে॥"

কিন্তু শীতের কুহেলিস্পর্শে বনপ্রকৃতি যেন ক্রমশ বিবর্ণ ও মুমূর্ষু হ'য়ে যেতে লাগল। তাই দেখে কবি কাতরকণ্ঠে গাইলেন,—

"হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে।
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী।
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী ॥"

তারপর একদিন সত্য সত্যই রসের কাণ্ডারী ঋতুরাজ বসন্তের পুনরাবির্ভাব ঘটে। কোকিলের কুহুতানে আবার দশদিক মুখরিত হ'য়ে ওঠে। মৃতকল্প বনভূমি আবার নবজীবন লাভ করে, নবসাজে সজ্জিত হ'য়ে ওঠে। হৃদয়ে হৃদয়ে মন্দ্রিত হয়,—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরোনা বিড়ম্বিত তারে ॥"

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের মূল ধারা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

"বৈদিক গাথাগুলি হইতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় মনের আদিম ধারাটির সন্ধান মিলিবে। এই ধারাটিই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে পরবর্তী যুগে। এইগুলির সহিত বাল্মীকির ও কালিদাসের কাব্য মিলাইয়া পড়িলে মনে হইবে, বাল্মীকির কাব্য যেমন দাঁড়াইয়া আছে কালিদাসের কাব্যের পটভূমিরূপে, বৈদিক সাহিত্য তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে বাল্মীকির কাব্যের পটভূমিরূপে। বৈদিক যুগে যাহা দেখা গিয়াছিল মানুষের একটা সহজ সরল বিশ্বাসরূপে, বাল্মীকির যুগে তাহারই সহিত এখানে সেখানে কিছু কিছু কবিকল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কালিদাসের যুগে আসিয়া দেখিতে পাই, সেই আদিম বিশ্বাস কবিমানসের অবচেতনে মগ্ন হইয়াছে; তাহার উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবিকল্পনা এবং কবি-কল্পনাশ্রিত বিবিধ মণ্ডনশ্রী।

.........শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রাচীনের

স্বীকরণের ভিতরে অবমাননা নাই, ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। নিরন্তর এই স্বীকরণের ভিতর দিয়াই তো চলিতেছে ইতিহাসের অখণ্ড ধারা।

·········মানুষ তাহার অখণ্ড সাধনার দ্বারাই চাহিতেছে তাহার চরম বিকাশ, 'কাল'-এর সঙ্গে 'আজ'-এর নিবিড় যোগের ভিতরেই রহিয়াছে মানুষের সকল সাধনার অখণ্ডতা। সাধনার যৌথত্বের ভিতরেই নিহিত চরম মঙ্গলের আদর্শ ও আশা।

·········এক যুগের সাহিত্য তাই যুগের বুকে ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া যায় নব নব সম্ভাবনার বীজরূপে নবযুগের নবীন উর্বর ক্ষেত্রে। বাল্মীকির বীজ তাই ফুটিয়া ওঠে কালিদাসের নূতন ফুলে, আবার কালিদাসের প্রতিভা ও সাধনা বীজরূপে ঝরিয়া পড়িয়া নূতন নূতন ফুল ফুটাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিতে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে।"

এভাবে যুগে যুগে কবিরা প্রকৃতির বন্দনা গান গেয়ে গেছেন। তার ফলে মানুষের সাহিত্যের ভাণ্ডার নিত্য নূতন সম্পদে ভরে উঠেছে। সুদূর অতীত থেকে একদল মানুষ যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির অপরূপ রূপমাধুরী উপলব্ধি ক'রে এক অচিন্তনীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করতে শিখল এবং সভ্যসমাজকে নিত্য নূতন কাব্য, কবিতা ও গান উপহার দিতে লাগল, তেমনি আর একদল জ্ঞানতপস্বী আবার বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত রহস্য-সন্ধানে নিরন্তর সাধনা করতে লাগল।

আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য বৈচিত্র্য লক্ষ্য ক'রে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষের মনেই নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হ'তে লাগল। ঋতু-চক্রের আবর্তন হচ্ছে, এর কারণ কি? অনাবৃষ্টি চলেছে, মানুষ-পশু-পাখী তাপক্লিষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে না কেন? আবার বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই, কোন বিরাম নেই, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতও হচ্ছে। এরই বা কারণ কি? গাছপালা সবুজ পত্র-পল্লবে ছেয়ে যায়, গাছে গাছে রং-বেরঙের ফুল ফোটে। দিনের পর দিন চন্দ্রের ক্ষয় হ'তে থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পরে আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। এসবেরই বা কারণ কি? এমনি শত শত জিজ্ঞাসা

মানুষের মনকে অহরহ পীড়ন করতে লাগল। এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়েই একদিন সুরু হ'ল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। মানুষ নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করতে লাগল, কিন্তু তবুও তার জ্ঞানের পিপাসা মিটল না। আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার তাই আরও নূতন নূতন সম্পদে পূর্ণ হ'য়ে উঠতে লাগল।

দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্রমে বিজ্ঞানের অনেক শাখার সৃষ্টি হ'ল, এর ফলে তাদের পঠন-পাঠন এবং অনুশীলন আরও সহজ হ'ল। এভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতি ক্রমশ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু এতেও মানুষের সব সমস্যার সমাধান হয়নি। তারই সমাধান খুঁজতে গিয়ে মানুষ অবিরত এগিয়ে চলেছে সাধনার দুর্গম পথে। মানুষের কৌতূহলের যেমন শেষ নেই, তার এগিয়ে চলারও তেমনি বিরাম নেই। তাই আমাদের দেশের ঋষিদের শাশ্বত বাণী হ'ল— "চরৈবেতি, চরৈবেতি।" এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৌরজগৎ

গ্রহ-উপগ্রহের কথা

দিনের আকাশ সূর্যের আলোয় ঝলমল করে, তখন আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে চারদিক আঁধার হ'য়ে আসে, অন্ধকার কালো আকাশের গায়ে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার দীপ। ওগুলোর মধ্যে আছে আটটি গ্রহ (Planet) আর গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids), বাকি সবগুলোই নক্ষত্র (Star)।

নক্ষত্রদের থেকে গ্রহদের চেনবার উপায় কি ? নক্ষত্র যেন সব সময়ই ঝিক্‌মিক্ করছে ব'লে মনে হয়, কিন্তু গ্রহ স্থিরভাবে উজ্জ্বল আলো দেয়, ঝিক্‌মিক্ করে না। এর কারণ, নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ ক'রে আসে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর কখনও স্থির থাকে না, উত্তাপের তারতম্য অনুসারে সব সময়ই তাদের কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হয়। কাজেই নক্ষত্রটি থেকে যে আলো আসছে তার গতিপথও প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। নক্ষত্র এতদূরে রয়েছে যে তার আলো যেন একটি বিন্দু থেকে আসছে। কাজেই তার আলোর গতিপথে সামান্য পরিবর্তন হ'লেই তা আমাদের চোখে ধরা পড়ে। এর ফলে প্রতিমুহূর্তেই মনে হয় নক্ষত্রটি যেন একটু সরে গেল। তাই আমাদের চোখে একটা ঝিকিমিকির অনুভূতি জাগে। নক্ষত্রের তুলনায় গ্রহ অনেক কাছে আছে ব'লে তাকে একটা ছোট চাক্‌তির মতো দেখায়। এই চাক্‌তির অনেকগুলি বিন্দু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পৌঁছায়। বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ায় এই আলোক-রশ্মিগুলোর সবেরই

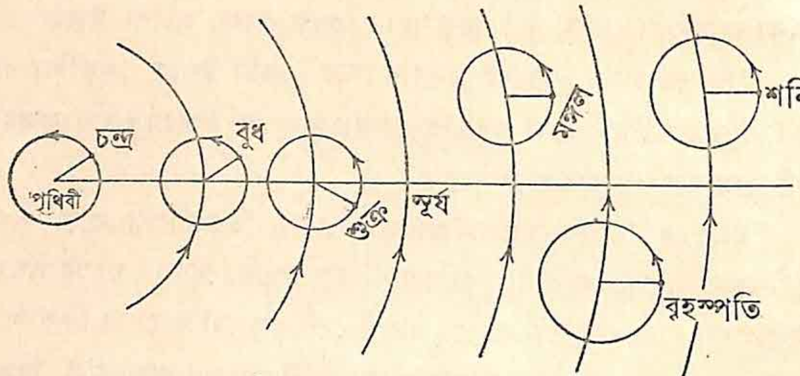
কিছু-না-কিছু দিক্ পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই দিক্-পরিবর্তনের ফল পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি যায়, কাজেই এদের সমবেত ফলে বিশেষ কোন পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এজন্য গ্রহের আলো উজ্জ্বল এবং স্থির ব'লে মনে হয়। গ্রহদের চেনবার আর একটা উপায়, কিছুদিন ধরে একটা গ্রহের অবস্থান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে নক্ষত্রমণ্ডলের তুলনায় গ্রহটি ক্রমাগত স্থানচ্যুত হ'য়ে যায়।

নক্ষত্রের নিজের আলো আছে। এজন্য বিজ্ঞানীদের কাছে সূর্যও একটি নক্ষত্র ব'লে গণ্য হয়। গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলো এদের গায়ে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। সেই ছড়ানো আলোর কিছু অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আঁধার ঘরে একটা আয়না রাখা হ'ল, কিছুই দেখা যাবে না, কারণ এ থেকে কোন আলো বেরোয় না। এখন একটা প্রদীপ জ্বাললে দেখা যাবে, তা থেকে আলো বেরুচ্ছে। এবারে প্রদীপের সামনে আয়নাটা রাখা হ'ল। প্রদীপের আলো তার গায়ে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই এবারে আয়নাটাও দেখা যাচ্ছে। সূর্যও একটা বিশাল দীপের মতো জ্বলছে আর গ্রহগুলো তারই আলো যেন আয়নার মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাই আমরা গ্রহদের উজ্জ্বল রূপ দেখতে পাই।

আগে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী মাঝখানে স্থির রয়েছে আর তাকে কেন্দ্র ক'রে তার চারদিকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সব ঘুরছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী টলেমী ১৪০ খৃস্টাব্দে যে মতবাদ প্রকাশ করেন তাই প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী ধ'রে সত্য ব'লে গৃহীত হয়েছিল।

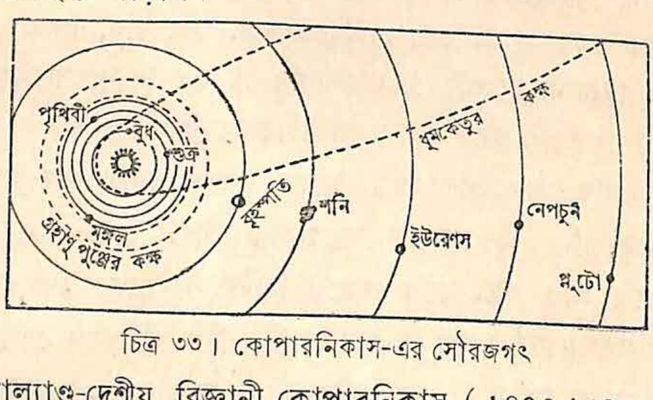
টলেমীর মতে প্রত্যেকটি গ্রহের নিজস্ব একটি কক্ষ আছে, কিন্তু গ্রহটি সোজাসুজি এই কক্ষপথে ঘোরে না। গ্রহটি একটি ছোট বৃত্তাকার পথে ঘোরে, আর এই বৃত্তের কেন্দ্রটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। চন্দ্র ও সূর্য অবশ্য সোজাসুজি নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে, তাদের গতি অন্যান্য গ্রহের মতো এত জটিল নয়। চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের কক্ষপথ সূর্যের কক্ষপথের অভ্যন্তরে অবস্থিত, কিন্তু অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথ সূর্যের

বাইরে অবস্থিত। তা ছাড়া বুধ ও শুক্রের বৃত্তপথের কেন্দ্র সর্বদাই পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে সমসূত্রে থাকে।



চিত্র ৩২। টলেমীর সৌরজগৎ

এই মতবাদের সাহায্যে আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতিবিধির কারণ নির্দেশ করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু দিন দিন পরীক্ষা ও নিরীক্ষার কাজ যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষতর হ'তে থাকল, তত বোঝা গেল যে, এই মতবাদের সাহায্যে জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। গণনার সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহের প্রকৃত অবস্থানের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য তাই জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর ব'লে গণ্য হ'তে লাগল। এর ফলে যে-কোন একটি জ্যোতিষ্কের গতিবিধি নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল।



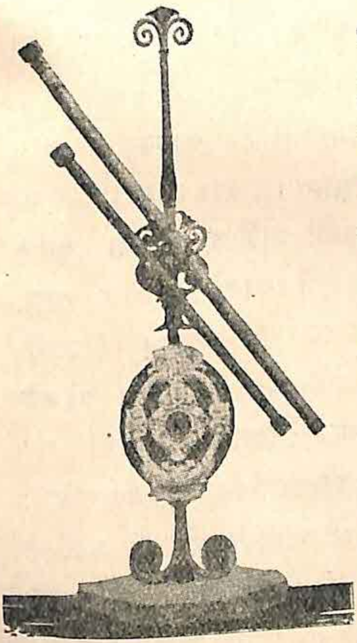
চিত্র ৩৩। কোপারনিকাস-এর সৌরজগৎ

পোল্যাণ্ড-দেশীয় বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃস্টাব্দ) সর্বপ্রথম বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সে নিজের মেরুদণ্ডের উপর

লাট্টুর মতো ঘুরছে তাই আমরা গ্রহ-নক্ষত্রের দৈনিক গতি দেখতে পাই। আরও গবেষণা ক'রে তিনি নিশ্চিত বুঝলেন, সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে এরূপ মনে করলে গ্রহদের গতিবিধি নির্ণয় করা অনেক সহজ হয়। কিন্তু তার এসব আবিষ্কার তখনকার অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের এতই বিরোধী ছিল যে, দীর্ঘ তের বছর ধরে তিনি কাউকে একথা বলতেই সাহস পেলেন না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তার মধ্যে তাঁর এই আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে যান। সেই থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঠিকমতো চিন্তা করার সুযোগ পেল; যদিও অনেকেই এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করল না। এরপরে ইটালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খৃস্টাব্দ) নিজহাতে একটি দূরবীণ তৈরি করেন এবং ১৬১০ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি এর সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতে সুরু করেন। এভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানা আরও সহজ হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে কোপার-নিকাস-এর মতো তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা তিনি একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করলেন, এর নাম "Dialogue on the two Principal Systems of the World." ১৬৩২ খৃস্টাব্দে পুস্তকটি প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু এজন্য তাঁকে খুবই বিপদে পড়তে হ'ল। ধর্মবিরোধী শিক্ষা দিচ্ছেন ব'লে তাঁর



চিত্র ৩৪। গ্যালিলিও



চিত্র ৩৫। গ্যালিলিও-র দূরবীণ

বিচার হ'ল। প্রাণরক্ষার জন্য শেষে তিনি তাঁর এই মতবাদ অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে প্রখ্যাত জীবনীকার গিব্‌সন্ লিখেছেন, "At a further trial Galileo was commanded to deny the doctrine that the Earth is not the centre of the universe, and that it moves. His reply was, 'I do not hold, and have not held, this opinion of Copernicus since the command was given that I must abandon it. For the rest I am here in your hands ; do with me as you please'. No doubt we have a feeling of disappointment, but we must remember that this abjuration was arrived at by fear of torture being resorted to should he refuse to recant."

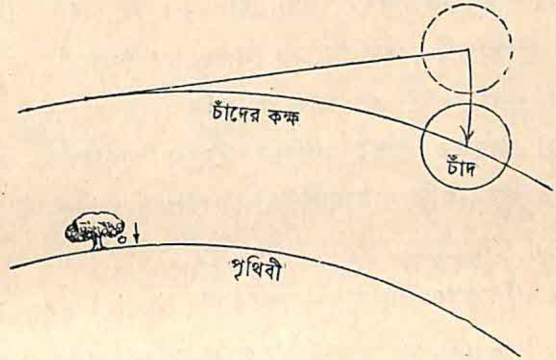
এ থেকেই বোঝা যাবে, আগেকার মানুষ কত অজ্ঞ ছিল, আর তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করা ছিল কত কঠিন। কিন্তু এসব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ ক'রেই মানুষ তার সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। বিজ্ঞানী নিউটন বাগানে গাছতলায় শুয়ে আছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো। তাঁর মনে প্রশ্ন হ'ল, তাই তো, আপেলটা মাটিতে পড়লো কেন? ফল পাকলে তো চিরকালই মাটিতে পড়ে, এ নিয়ে আবার কে কত ভাবে! বিজ্ঞানী নিউটনের মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল ব'লেই আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, পৃথিবী সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই পৃথিবীর আকর্ষণে আপেলটি মাটিতে পড়ে। এই পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়েই চাঁদ তার চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর আকর্ষণে গাছ থেকে আপেল পড়া এবং পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরা, এ দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র



চিত্র ৩৬। নিউটন

আবিষ্কার করা খুবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, সূর্যের বিপুল আকর্ষণ আছে ব'লেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার চারদিকে ঘুরছে। এভাবে একটা সামান্য ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে, একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হ'ল।



চিত্র ৩৭

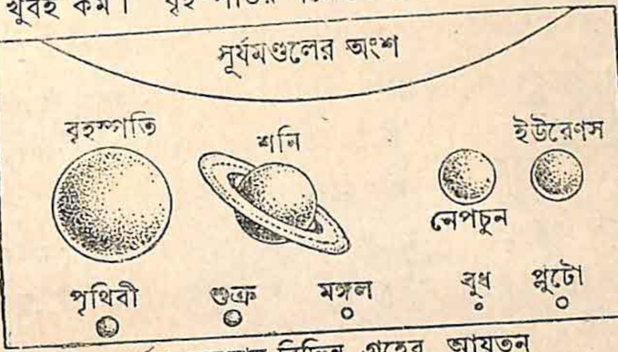
পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিনে বা একবছরে একবার ক'রে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। আর পৃথিবী যেমন নিজের কক্ষে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তেমনি অন্যান্য গ্রহগুলিও নিজ নিজ কক্ষপথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আর নিউটন-আবিষ্কৃত মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে এসব গ্রহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির হিসেব এত সহজ নয়। তার কারণ, গ্রহগুলি নিজেরাও আবার পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কাজেই নিকটবর্তী গ্রহের আকর্ষণে প্রত্যেকটি গ্রহ এবং উপগ্রহের গতি প্রভাবান্বিত হ'তে বাধ্য। কাজেই সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণ হিসেব ক'রে একটি গ্রহের গতি এবং অবস্থান নির্ভুলভাবে বের করতে হ'লে বহুদিন ধরে বহু দুরূহ অঙ্কের সমাধান করতে হয়। তবে ভরসার কথা এই যে সূর্যের বিপুল ওজনের তুলনায় অন্যান্য গ্রহের ওজন অত্যন্ত কম, তাই তাদের আকর্ষণ-শক্তিও সূর্যের তুলনায় নগণ্য। কাজেই শুধু সূর্যের আকর্ষণ-শক্তি বিবেচনা ক'রেই গ্রহদের গতিবিধি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।

পৃথিবীর কক্ষের অন্তর্বর্তী কক্ষে অবস্থিত হ'লে তাকে **অন্তগ্র্হ** (inferior planet), আর পৃথিবীর কক্ষের বাইরে অবস্থিত হ'লে তাকে **বহিগ্র্হ** (superior planet) বলা হয়। যে-কোন গ্রহের গতি দু'রকম। প্রত্যেকটি গ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে, এর নাম **পরিক্রমণ** (revolution)। আবার একটা লাট্টু যেমন ঘোরে, তেমনি প্রত্যেকটি গ্রহও নিজের মেরুদণ্ডের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার ক'রে পাক খায়, এর নাম **আবর্তন** (rotation)। সৌরজগতে ইউরেনস ছাড়া অন্যসব গ্রহই পশ্চিম থেকে পুবদিকে আবর্তিত হয়, অর্থাৎ তাদের আবর্তন-গতি বামাবর্তী (anti-clock-wise) বা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

গ্রহদের পরিক্রমণ-পথ উপবৃত্তাকার (Elliptic) এবং সেই উপবৃত্তের এক নাভিতে (Focus) আছে সূর্য। প্লুটো ছাড়া অন্যসব গ্রহের বেলায় এই কক্ষের নাভি দু'টি পরস্পরের এত কাছে অবস্থিত যে কক্ষটিকে বৃত্তাকার ব'লে মনে করলে খুব দোষ হয় না। ধূমকেতুর বেলায় তা চলে না, কারণ তার কক্ষের নাভি দু'টি পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই তারা বহুকাল পর পর সূর্যের কাছে ফিরে আসে। এ পর্যন্ত ন'টি প্রধান গ্রহ এবং কয়েক হাজার ক্ষুদ্র গ্রহের সমষ্টি বা গ্রহাণুপুঞ্জের অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। সূর্যের চারদিকে এদের সবারই ঘুরবার গতি বামাবর্তী (anti-clock-wise), অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। আর একটা মজার কথা, সূর্য নিজে যে সমতলে পাক খাচ্ছে ব'লে মনে হয়, প্লুটো ছাড়া অন্য গ্রহগুলি সবই প্রায় সেই সমতলে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। প্লুটোর কক্ষতল এদের কক্ষতলের সঙ্গে সামান্য হেলে রয়েছে।

সূর্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রহ আছে তার নাম হ'ল **বুধ**, তারপর **শুক্র** এবং তারপর **পৃথিবী**। অন্যান্য গ্রহগুলোর কক্ষ বা পরিক্রমণ-পথ পৃথিবীর কক্ষের বাইরে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে একদিকে আছে শুক্র এবং আর একদিকে **মঙ্গল**। কাজেই খালি চোখেও এই গ্রহ দু'টি সহজেই চেনা যায়। মঙ্গলের পরে আছে **গ্রহাণুপুঞ্জ**, অর্থাৎ ছোট ছোট কয়েক হাজার

গ্রহ-কণিকার সমষ্টি। এরপর আছে **বৃহস্পতি**, গ্রহদের মধ্যে যার আয়তন এবং ওজন সবচেয়ে বেশি। সূর্যের তুলনায় অবশ্য বিভিন্ন গ্রহের আয়তন এবং ওজন খুবই কম। বৃহস্পতির পরে যে গ্রহটি আছে, তার নাম **শনি**।



সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহের আয়তন

চিত্র ৩৮

দূরবীণ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, একে বেষ্টন ক'রে আছে পর পর সুন্দর তিনটি বলয়। শনির পরে আছে **ইউরেনস, নেপচুন ও প্লুটো**।

গ্রহদের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এবং প্লুটো সমগোত্রীয় বলা যায়। এরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর মতো ছোট এবং প্রায় পৃথিবীর মতোই ভারি। কাজেই মনে হয় এদের উপাদানগত সাদৃশ্য বেশি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এরা প্রধানত লোহা, নিকেল ও পাথর দিয়ে তৈরি। এদের তুলনায় বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস ও নেপচুন প্রত্যেকেই অতিকায় দৈত্যের মতো। আয়তন অনুপাতে তাদের সবারই ওজন কিন্তু খুব কম, এর ফলে তাদের গড় ঘনত্ব হয়েছে প্রায় জলের সমান। এদের নিজেদের মধ্যেও আবার উপাদানগত সাদৃশ্য খুব বেশি। সৌরজগতের বিভিন্ন অধিবাসীর আয়তন এবং দূরত্ব একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটি বলকে যদি সূর্য ব'লে মনে করা যায় তাহ'লে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই গ্রহগুলি যথাক্রমে ৭, ১৩, ১৮ এবং ২৭ গজ দূর দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ব'লে মনে হবে। আর এদের কোনটিরই আয়তন একটি ক্ষুদ্র সরষে বীজের চেয়ে বড় ব'লে মনে হবে না। অতিকায় গ্রহগুলিকে, অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস এবং নেপচুনকে, এক একটি মটরবীজের মতো দেখাবে, আর

সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব হবে যথাক্রমে ৯০, ১৭০, ৩৫০ এবং ৫৪০ গজ। প্লুটোকে সূর্য থেকে প্রায় ৭০০ গজ দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতো দেখাবে।

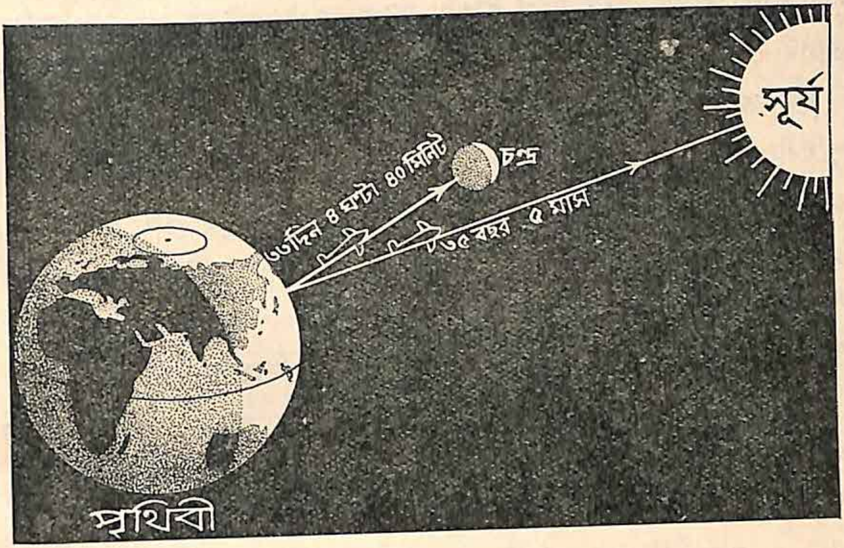
চাঁদ যেমন পৃথিবীর **উপগ্রহ** (Satellite) তেমনি কোন গ্রহের একটি আর কোন গ্রহের অনেকগুলো উপগ্রহ আছে—যেমন মঙ্গলের দু'টি, বৃহস্পতির এগারটি, শনির ন'টি, ইউরেনসের চারটি এবং নেপচুনের মাত্র একটি উপগ্রহ আছে। অন্যান্য গ্রহদের কোন উপগ্রহ নেই। বৃহস্পতি ও শনির আয়তন এত বেশি এবং তাদের প্রত্যেকের চারদিকে এত বেশি-সংখ্যক উপগ্রহ ঘুরছে যে তাদের সৌরজগতেরই এক একটি ছোট সংস্করণ বলতে দোষ নেই।

সূর্য

সূর্যকেই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ব'লে মনে হয়। তবে আকাশে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আরও অনেক আছে। কিন্তু সূর্যের চেয়ে তারা রয়েছে আরও অনেক দূরে, তাই তাদের এত ছোট দেখায়। সূর্য যেন একটা বিশাল আগুনের কুণ্ডের মতো দাউদাউ ক'রে জ্বলছে। যুগ যুগ ধরে এ থেকে প্রচণ্ড তাপ এবং চোখ-ঝল্‌সানো আলো বেরুচ্ছে। এর কোন বিরাম নেই। একটা জ্বলন্ত উনানের পাশে দাঁড়ালে বেশ তাপ লাগবে, একটু দূরে গেলেই তাপ আর বোঝা যাবে না। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডটি পৃথিবী থেকে প্রায় ন' কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে তাই রক্ষে, খুব কাছে থাকলে এই পৃথিবীটা জ্বলে পুড়ে শেষ হ'য়ে যেত।

সূর্যের এই অপরিসীম দূরত্ব কি কিছু আন্দাজ করা গেল? ধরা যাক, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দশ ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটে চলেছি। হয়তো পনর মাইল যেতে পারব। যদি রেলগাড়িতে চেপে এই দশ ঘণ্টা চলি, তাহ'লে হয়তো তিন শ' মাইল যেতে পারব। আজকাল এরোপ্লেন খুবই দ্রুতগামী, ঘণ্টায় তিনশ' মাইল বেগে চলতে পারে। কাজেই এরোপ্লেনে

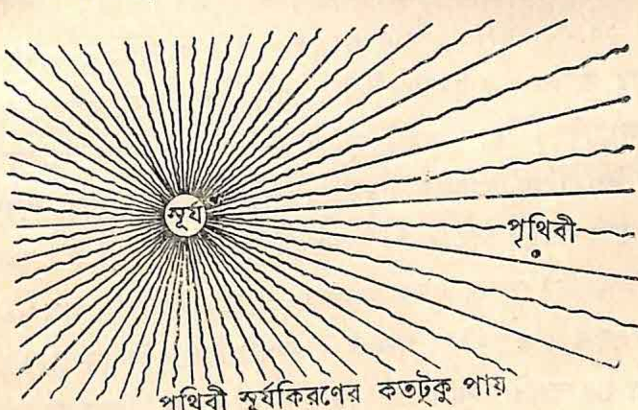
চেপে এই দশ ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল যাওয়া সম্ভব। যদি একটা



চিত্র ৩৯। একটি এরোপ্লেনে ক'রে পৃথিবী থেকে সূর্যে অথবা চাঁদে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে।

এরোপ্লেনে চেপে কোথাও না থেমে ক্রমাগত সূর্যের দিকে যাওয়া যেত তাহ'লে সূর্যে পৌঁছাতে লাগত প্রায় ৩৫ বছর ৫ মাস !

গ্রীষ্মকালে দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছটফট করতে হয়, একবার



পৃথিবী সূর্যকিরণের কতটুকু পায়

চিত্র ৪০

রোদে দাঁড়ালেই বোঝা যাবে কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে এত-দূরে থাকা সত্ত্বেও এতটা তাপ পাওয়া যাচ্ছে, এ থেকেই বোঝা যাবে সূর্যের তাপটা কেমন ভয়ংকর! জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড তাপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২৩ কোটি ভাগের ১ ভাগ) এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ংকর তার হিসেব বিজ্ঞানী করেছেন—সমস্ত পৃথিবীর উপর একসঙ্গে যে তাপ এসে পৌঁছায় তা যদি এক জায়গায় জমা হ'ত তাহ'লে দশ লক্ষ মণ জল এক মিনিটের মধ্যেই টগবগ ক'রে ফুটে উঠত! পূর্ণিমার রাতে চাঁদ থেকে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায়, সূর্যের আলো তার প্রায় ছ' লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।

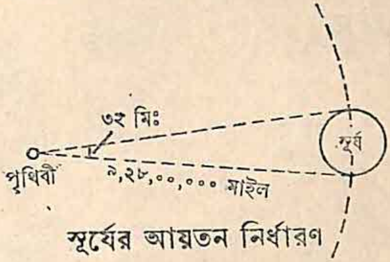
কিন্তু সূর্য থেকে আলো ও তাপ না পাওয়া গেলে কি হ'ত? পৃথিবীতে বিরাজ করত চির অন্ধকারে, চাঁদের শোভাও লোপ পেত চিরতরে। আর পৃথিবীতে গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি কোন জীবই বাঁচত না। সূর্যের তাপ ও আলো পেয়েই পৃথিবী হয়েছে শস্যশ্যামলা, অসংখ্য জীবজন্তু আর মানুষের লীলাভূমি।

সূর্যের আয়তন

হিসেব ক'রে দেখা গেছে যেখানে পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল সেখানে সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮,৬৪,০০০ মাইল। এই হিসেবে পৃথিবীর পরিধি হ'ল প্রায় ২৫,০০০ মাইল, আর সূর্যের পরিধি প্রায় ২৭,০০,০০০ মাইল। এতে সূর্যের আয়তন দাঁড়ায় পৃথিবীর প্রায় তের লক্ষ গুণ। ধরা যাক, একটা রেলগাড়িতে চেপে সমস্ত পৃথিবীটা একবার ঘুরে আসতে লাগল সাড়ে চৌত্রিশ দিন, তাহ'লে সেভাবে সূর্যের উপর দিয়ে ঘুরে আসতে লাগবে প্রায় দশ বছর চার মাস। এতেই বোঝা যাবে পৃথিবীর তুলনায় সূর্য কত বড়! আবার সূর্যের ওজনও (ভর) নেহাত কম নয়, ২×১০^{৩৩} গ্রাম (পৃথিবীর ওজন ৬×১০^{২৭} গ্রাম)। অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর প্রায় তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ ভারি। পৃথিবীর মতো সূর্যও সব জিনিসকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূর্য বহুগুণ ভারি ব'লে তার আকর্ষণী শক্তিও অনেক

প্রবল। বিজ্ঞানীর হিসাবে পৃথিবীতে যা এক মণ ভারি তাই সূর্যে প্রায় ২৭ মণ ভারি ব'লে মনে হবে।

বিজ্ঞানীরা সূর্যের আয়তন বের করলেন কি ক'রে? ধরা যাক, একটি বৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী এবং তার পরিধিতে আছে সূর্য। একটি দূরবীণ প্রথমে সূর্যের একপ্রান্তে ফোকাস করা হ'ল, তারপর দূরবীণটি ঘুরিয়ে অপর প্রান্তে ফোকাস করা হ'ল। এজন্য দূরবীণটি যতটুকু ঘোরাতে



সূর্যের আয়তন নির্ধারণ
চিত্র ৪১

হ'ল সেই কোণের পরিমাপ হল মাত্র ৩২ মিনিট। একটি বৃত্তের কৌণিক মাপ হ'ল মোট ৩৬০ ডিগ্রী বা ৩৬০ × ৬০ মিনিট। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯,২৮,০০,০০০ মাইল। একে ব্যাসার্ধ ধরে যে বৃত্ত অঙ্কিত হবে, তার পরিধি = ২ × $\frac{২২}{৭}$ × ৯২৮০০০০০ [পরিধি = $2\pi r$]

সুতরাং সূর্যের ব্যাস = $\frac{২ \times \frac{২২}{৭} \times ৯২৮০০০০০}{৩৬০ \times ৬০}$ × ৩২ মাইল

= ৮,৬৪,০০০ মাইল [পৃথিবীর ব্যাস = প্রায় ৮০০০ মাইল]

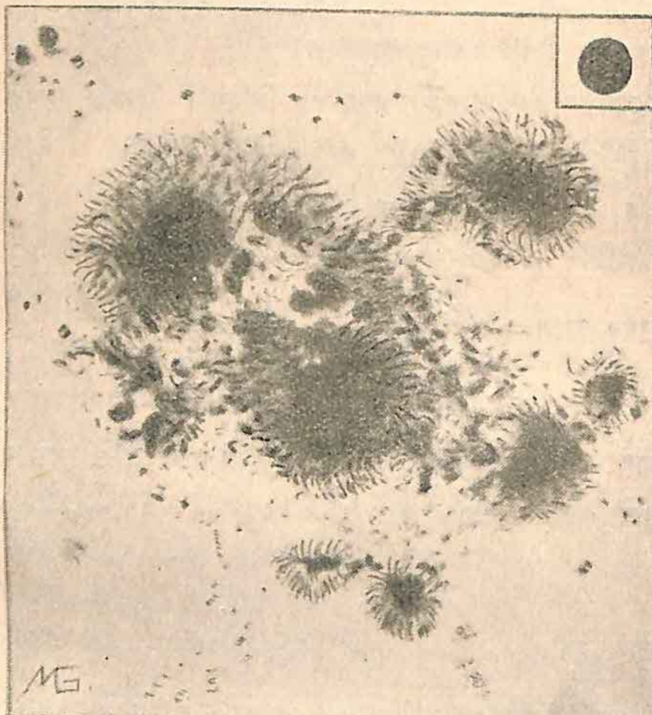
এ থেকে অনায়াসে সূর্যের পরিধি কত হবে তাও বের করা যায়, কারণ পরিধি = $2\pi r$ = ২ × $\frac{২২}{৭}$ × ৪৩২০০০ = ২৭,০০,০০০ মাইল [প্রায়]

সূর্যমণ্ডল

সূর্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড, এর কোথাও কঠিন বা তরল পদার্থের অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে যেমন বায়ুমণ্ডল আছে সূর্যের চারদিকেও তেমনি একটি গ্যাসের আবরণ রয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শীতল ব'লে নিষ্প্রভ, কিন্তু সূর্যের এই আবরণটি ভয়ংকর উত্তপ্ত, সর্বদাই জ্বলছে ব'লে মনে হয়। সূর্যকে মোটামুটি তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে—আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল।

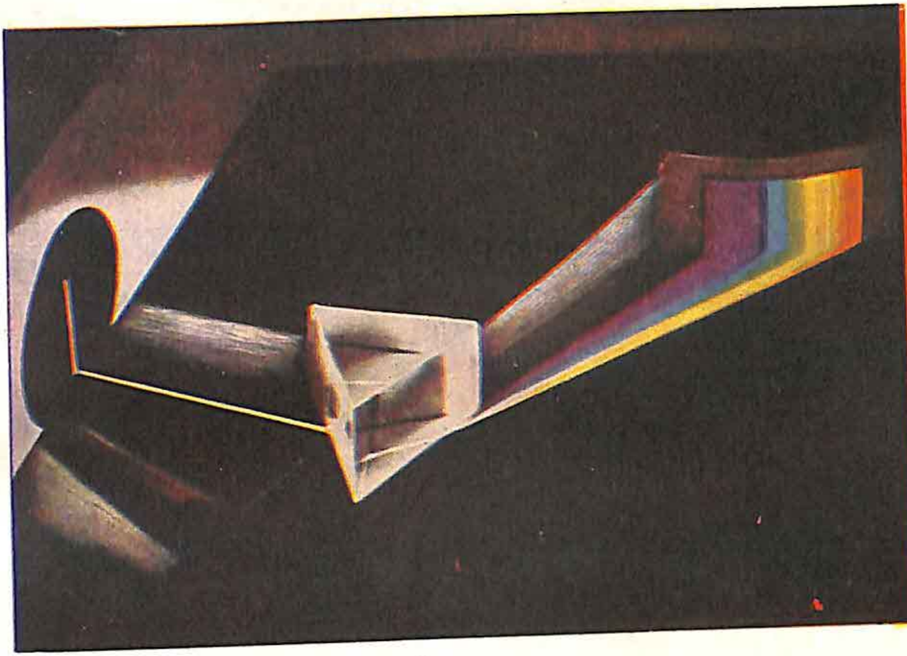
খালি চোখে আমরা সূর্যের যে অত্যুজ্জ্বল আলোকময় অংশ দেখতে পাই, তাকে **আলোকমণ্ডল** (Photosphere) বলা হয়। এর সকল অংশ কিন্তু সমান উজ্জ্বল ব'লে মনে হয় না—মধ্যভাগ প্রান্তদেশ অপেক্ষা বেশি উজ্জ্বল দেখায়।

রঙিন কাচে ঢাকা দূরবীণের সাহায্যে সূর্যের উজ্জ্বল গায়ে অনেক কালো কালো দাগ দেখা যায়, ওগুলো **সৌরকলঙ্ক** (Sun-spots)। এগুলি এক একটি বিরাট গহ্বর, এদের কোনটি এতবড় যে দু'তিনটি পৃথিবী

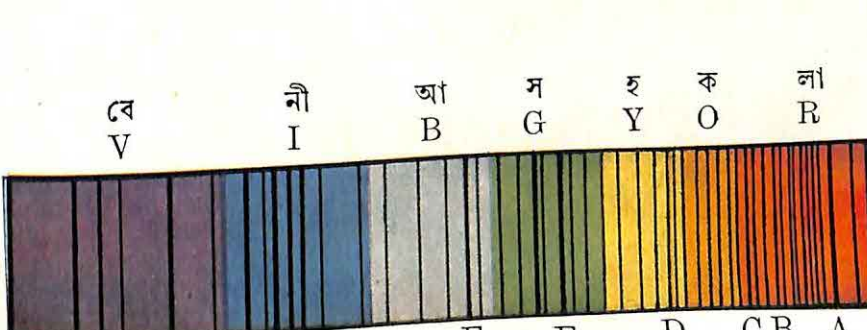


চিত্র ৪২। সৌরকলঙ্ক। উপরের কোণে পৃথিবীর আয়তন তুলনা ক'রে দেখানো হয়েছে।

অনায়াসে তার মধ্যে তলিয়ে যাবে। সৌরকলঙ্ক পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর মতো সূর্যও নিজের মেরুদণ্ডের উপর পাক খাচ্ছে। কিন্তু সূর্যের সকল অংশের ঘুরবার বেগ সমান নয়। নিরক্ষরেখার উপরস্থ অংশ



সৌর বর্ণালী



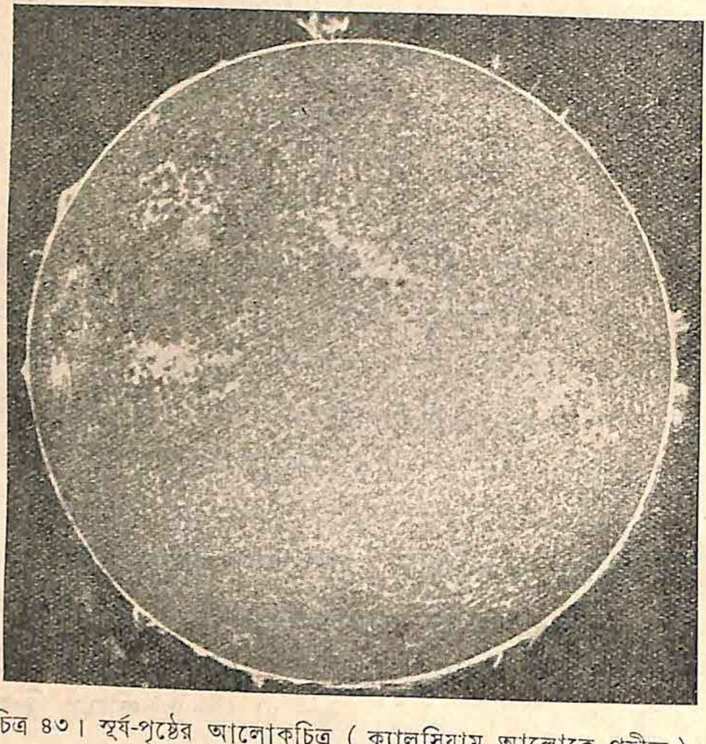
সৌর বর্ণালী—ফ্রন্‌হফার রেখাগুলি দেখানো হয়েছে

২৪ দিন ১৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে কিন্তু মেরুপ্রদেশস্থ অংশের ঘুরতে লাগে প্রায় ৩৪ দিন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সূর্য ঘনীভূত পদার্থ নয়—অতি উত্তপ্ত গ্যাসের সমুদ্র বিশেষ।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য-পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে ভয়ংকর ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হ'লে অথবা অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় অভ্যন্তরস্থ গ্যাসরাশির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হ'লে এইরূপ কলঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই জ্বলন্ত গ্যাসরাশি আলোকমণ্ডল ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসাতে তার উষ্ণতা হঠাৎ কমে যায়, এর ফলে অত্যুজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের তুলনায় তাকে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও কালো দেখায়। একটা একহাজার-ওয়াট বৈদ্যুতিক বাতির পাশে একটি মোমবাতিকে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম। সূর্য-গোলকের মেরু অঞ্চলে এদের সৃষ্টি হয়, তারপর এরা ক্রমশ নিরক্ষরেখার দিকে সরে এসে মিলিয়ে যায়। সাধারণত ১১ বছর পর পর এদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায়। যে-বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বেশি হয় সেবার ভূ-পৃষ্ঠে গ্রীষ্মের তীব্রতা বাড়ে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম প্রদেশ তড়িৎ-ভাবাপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে চুম্বক-ঝড়ের প্রকোপ দেখা দেয়। এর ফলে তড়িৎ-সরবরাহ, টেলিগ্রাফ, বেতার প্রভৃতি কাজে বিঘ্ন ঘটে।

আলোকমণ্ডলের বাইরের অংশকে বিশোষণমণ্ডল (Reversing layer) বলা হয়। সূর্যের আলো যখন এই মণ্ডলের ভেতর দিয়ে আসে তখন সেখানকার উত্তপ্ত গ্যাসরাশি নিজ নিজ বর্ণালীর আলো সূর্যালোক থেকে শোষণ ক'রে নেয়। একটি প্রিজম্ বা ত্রিপার্শ্ব কাচের ভিতর দিয়ে সূর্য-রশ্মি পাঠালে তা সাতটি বর্ণে ভাগ হ'য়ে যায়, এর নাম বর্ণালী (Spectrum)। কিন্তু বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সৌর-বর্ণালী পরীক্ষা করলে তা নিরবচ্ছিন্ন মনে হয় না, মাঝে মাঝে অনেক কালো রেখা দেখা যায়। এদের ফ্রনহফার রেখা (Fraunhofer lines) বলা হয়। এসব কালো দাগ বিশ্লেষণ ক'রে বোঝা গেছে যে সূর্যও পৃথিবীর মতো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সোনা, রূপা, লোহা, নিকেল, সোডিয়াম প্রভৃতি উপাদানে গঠিত।

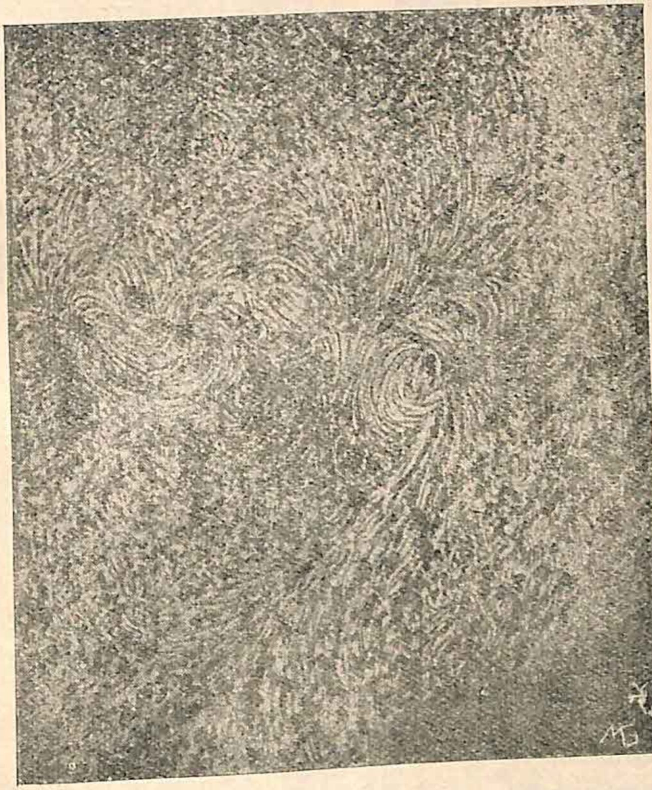
পৃথিবীর বাইরে যেমন বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্যের চারদিকেও তেমনি জ্বলন্ত গ্যাসের আবরণ আছে। এর নাম **বর্ণমণ্ডল** (Chromosphere)। এর বিস্তৃতি ৭।৮ হাজার মাইল। সূর্যের তীব্র আলোকে সাধারণত এর অস্তিত্ব বোঝা যায় না। পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্যের আলোকমণ্ডল ঢেকে ফেলে, তাই শুধু তখনই বর্ণমণ্ডল দেখা সম্ভব হয়।



চিত্র ৪৩। সূর্য-পৃষ্ঠের আলোকচিত্র (ক্যাল্সিয়াম আলোকে গৃহীত)।

উত্তপ্ত ক্যাল্সিয়াম অথবা হাইড্রোজেন বাষ্প থেকে যে আলো পাওয়া যায়, শুধু সেই আলোটুকু সংগ্রহ ক'রে সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মনে হয়, সূর্য-পৃষ্ঠে জ্বলন্ত গ্যাসরাশি যেন উত্তপ্ত তরল পদার্থের মতো টগবগ ক'রে ফুটছে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্রের সঙ্গেই শুধু এর তুলনা চলে। যেখানে ক্যাল্সিয়াম অথবা হাইড্রোজেন বাষ্প অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত বেশিমাত্রায়

তেজশক্তি নিঃসৃত হয়, তাই সে জায়গা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখায়। আর যেখানে উষ্ণতা কম, সে জায়গা নিষ্প্রভ দেখায়। সূর্য-পৃষ্ঠের অলোকচিত্রে এরূপ যেসব উজ্জ্বল এবং নিষ্প্রভ দাগ দেখা যায়, তাদের **সৌর-বুদ্‌বুদ** (flocculi) বলা হয়। সৌর-বুদ্‌বুদ ক্ষণস্থায়ী, দেখা যাওয়ার কয়েক

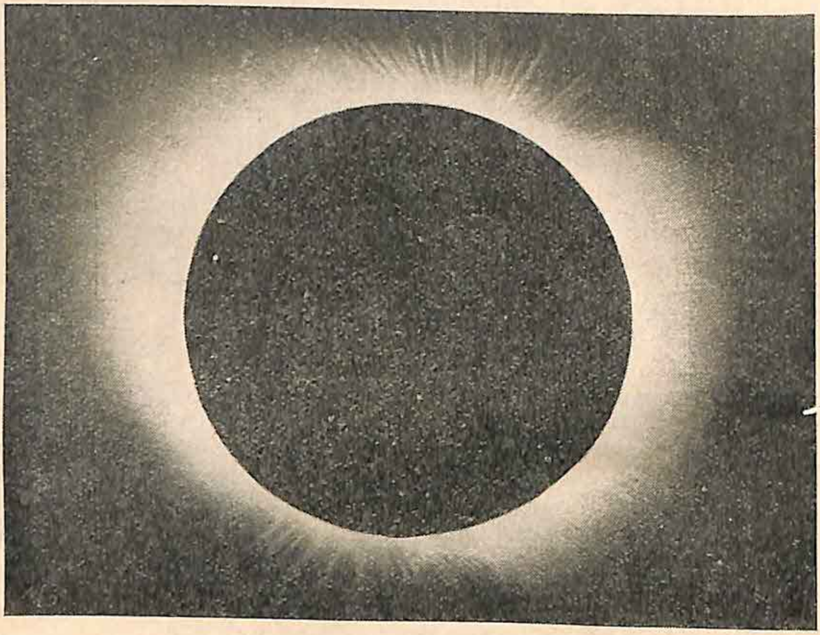


চিত্র ৪৪। সূর্য-পৃষ্ঠের একটি অংশ (হাইড্রোজেন আলোকে গৃহীত আলোকচিত্র)। হাইড্রোজেন-বুদ্‌বুদের আবর্ত-গতি দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি সৌরকলঙ্ক বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মিনিটের মধ্যেই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে মিলিয়ে যায়। সময় সময় এর মাঝে সৌর-কলঙ্কও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ক্যাল্‌সিয়াম-আলোকে গৃহীত আলোকচিত্র স্থূল ও অস্পষ্ট। সে তুলনায় হাইড্রোজেন-আলোকে গৃহীত আলোকচিত্র অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় কখন কখন আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে এক একটি প্রচণ্ড লেলিহান রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা সূর্য-পৃষ্ঠের উর্ধ্বদেশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম **সৌরশিখা** (solar prominence)। সৌরশিখা বর্ণমণ্ডল থেকে উঠে আসে এবং কোন কোন সময় দশ লক্ষ মাইল দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ সৌরশিখারই উৎপত্তি হয় সক্রিয় কলঙ্ক থেকে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য-পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়লে বর্ণমণ্ডলের চারদিকে যে তীব্র আলোকছটা দেখা যায়, তাকেই **ছটামণ্ডল** (corona)



চিত্র ৪৫। সূর্যের ছটামণ্ডল, অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে অবস্থিত উজ্জ্বল গ্যাসের আবরণ। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছাড়া ছটামণ্ডল দেখা যায় না।

বলা হয়। ইহা প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল অবধি বিস্তৃত থাকে। সূর্যের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত গ্যাসীয় অণুগুলির সাহায্যে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ (scattering) হয় ব'লে এরূপ দেখা যায়। এ দৃশ্য সত্যই অপূর্ব। এ দৃশ্য



সৌর শিখা
পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় গৃহীত আলোকচিত্র অনুসারে অঙ্কিত। ডানপাশের সাদা চিহ্নদ্বারা পৃথিবীর আয়তন বোঝানো হয়েছে।

দেখবার জন্য তাই বিজ্ঞানীরা ভিড় করেন সেসব দেশে যেখান থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

বুধ

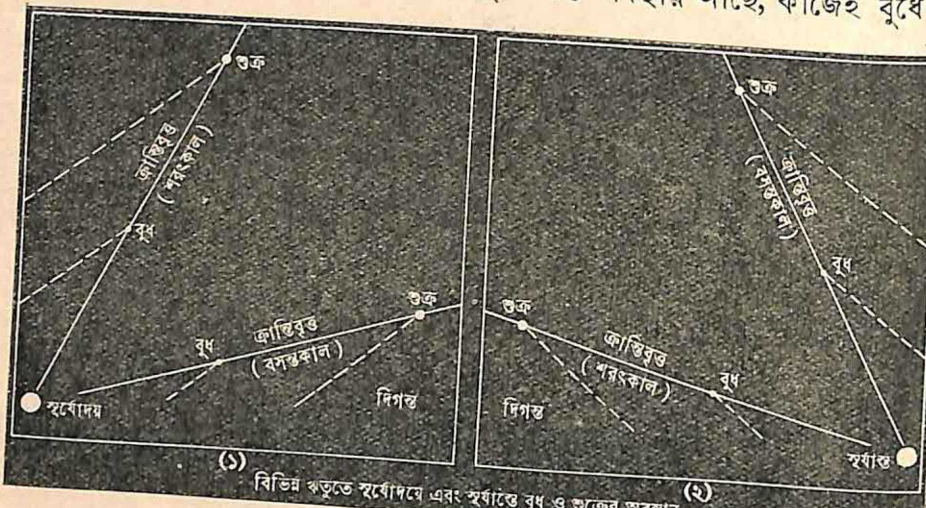
সূর্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রহটি আছে তার নাম বুধ। এই গ্রহটিকে সূর্যের সামনে দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে দেখা যায়, তাই রোমানদের দেবদূতের নামানুসারে ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া হয়েছে Mercury। গ্রহদের মধ্যে বুধই আকারে সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে কম সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৮৮ দিনে সে সূর্যকে একবার ক'রে প্রদক্ষিণ করছে। এর ব্যাস মাত্র ২১০০ মাইল এবং ওজন পৃথিবীর ১/২৩ ভাগের সমান।



চিত্র ৪৬। বুধগ্রহকে সূর্যের সামনে দিয়ে ছুটে যেতে দেখা যায়। তাই রোমানদের দেবদূতের নামানুসারে ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া হয়েছে Mercury। সেই সময় বুধের অন্ধকার দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। এজন্য উজ্জ্বল সূর্য-পৃষ্ঠের সামনে একে একটা কালো চাকতির মতো দেখা যায়।

সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে ব'লে একে সূর্যোদয়ের একটু আগে কিংবা পরে দেখা যায়। এর পরিক্রমণ-পথ উপবৃত্তাকার, কাজেই এ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে যায় তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব হয় ২,৮৬,০০,০০০ মাইল। এর ৪৪ দিন পরে বুধ সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে, তখন এর দূরত্ব হয় প্রায় ৪,৩৪,০০,০০০ মাইল। সাধারণ হিসেবে সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব

৩,৬০,০০,০০০ মাইল ধরা যেতে পারে। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে এই গ্রহটির অনেক রকম মিল আছে। চাঁদের মতো বুধেরও কলা দেখা যায়। সূর্যের খুব কাছে থাকায় এ খুব উত্তপ্ত অবস্থায় আছে, কাজেই বুধে



বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে বুধ ও শুক্রের অবস্থান

চিত্র ৪৭।

কোন আবহমণ্ডল থাকা সম্ভব নয়। এজন্য বুধের পরিধি-রেখা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গ্রহটির আবর্তনকাল প্রদক্ষিণকালের সমান, কাজেই বুধের একটি দিকই সব সময় সূর্যের দিকে ফিরে আছে। একপিঠে একটানা দিন চলেছে, রাতের অন্ধকার এসে কখনও কোন বিঘ্ন ঘটায় না। অপরদিকে চিররাত্রি, সেখানে কোনদিনই সূর্যের আলো পৌঁছায় না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বুধের আলোকিত অংশের উষ্ণতা ৭৭০° ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। এই উষ্ণতায় সীসা এবং রাং গলে যায়। এসব কারণে বুধে কোন জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

শুক্র

সন্ধ্যামণি কনকতারা! সন্ধ্যামণি জলের ঝারা! মেয়েলী ব্রতের ছড়ায় সন্ধ্যামণি নাম দিয়ে সন্ধ্যার যে তারকাটিকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, সেটি কিন্তু তারকা নয়, বিজ্ঞানীদের কাছে তা মহাকাশচারী একটি গ্রহ,

নাম শুক্র (Venus)। একেই আবার কিছুদিন ধরে প্রভাতের শুকতারা-রূপে দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলতে দেখা যায়। কবি বলেছেন,—"তুমি প্রভাতের শুকতারা; আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে কখনও বা তুমি দেখা দাও গোধূলির দেহলীতে।" প্রভাতের শুকতারা আর সন্ধ্যামণি কনকতারা দুই-ই শুক্রগ্রহ। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, পশ্চিম আকাশে যখন সাঁঝের তারা দেখা যায়, তখন পুব আকাশে শুকতারা ওঠে না, আবার যখন শুকতারা উঠতে আরম্ভ করে, তখন সাঁঝের তারাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

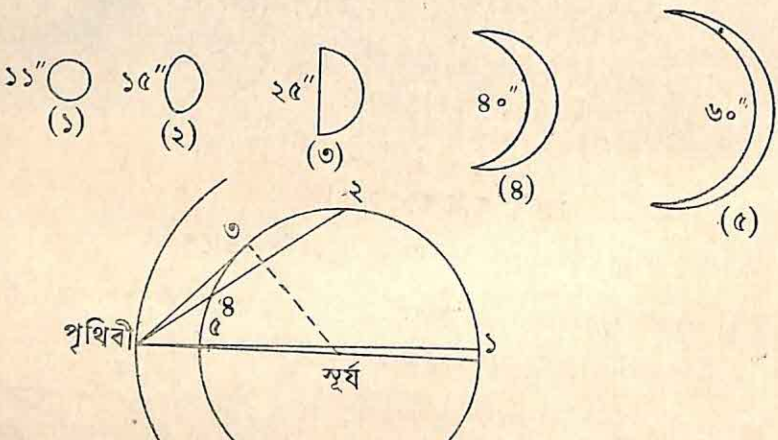
আকাশের যেসব নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল তাদের বিশ-পঁচিশটিকে একত্র করলেও শুকতারার সমান উজ্জ্বল হয় না। শুকতারার দীপ্ত হাসি তাই কবির চোখে আকাশচারিণী এক রূপসীর হাসি ব'লে মনে হয়েছে। কবি বলেছেন,—

"সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিকভ্রান্তে।"

ভারতীয় পুরাণে শুকতারা এক রূপসী নারী, নাম মায়াবতী, কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের তিনি অনুরাগিণী। দীপ্তিময়ী শুকতারার সুন্দর রূপ সব দেশের মানুষকেই মুগ্ধ করেছে। রোমক পুরাণের ভেনাস, আর গ্রীক পুরাণের অ্যাফ্রোদিতে অভিন্ন। প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস, যিনি সমুদ্রতরঙ্গের ফেনপুঞ্জ থেকে আবির্ভূতা দিব্যকান্তিময়ী রূপসী, আর দক্ষিণ সমীরের দেবতা জেফার যাঁর প্রণয়ী, তাঁরই নামে এই গ্রহকে নামাঙ্কিত করা হ'ল কেন, তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না।

শুক্র এত উজ্জ্বল কেন? কতকগুলো কারণ আছে। হিসেব করে দেখা গেছে, শুক্র পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ আলো ও তাপ পায়। তা ছাড়া শুক্রই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ, কাজেই এর দীপনমাত্রা (intensity of illumination) অনেক বেশি। এ ছাড়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন,

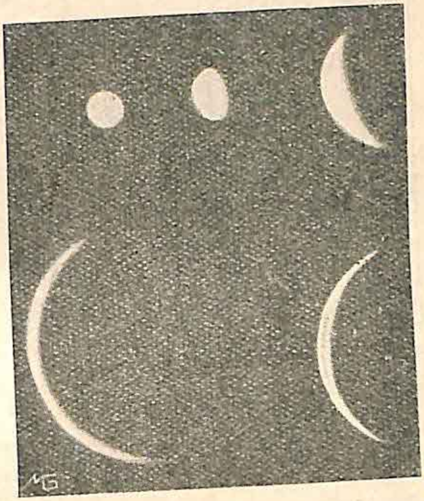
পৃথিবীর মতো শুক্রের আবহমণ্ডলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ধূলিকণা এবং মেঘ সব সময় ভেসে বেড়ায়। এদের গা থেকে সূর্যরশ্মি অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিফলিত (reflected) ও বিক্ষিপ্ত (scattered) হয় ব'লে শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়। মাটি, পাথর ইত্যাদির চেয়ে মেঘের ওপর থেকে যে অনেক বেশি সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় তার প্রমাণ উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠলেই পাওয়া যায়। তখন একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, নীচের মেঘের উপর সূর্যরশ্মি পড়াতে তাকে আশেপাশের গাছ-পালা, মাটি-পাথর ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। শুক্র কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা নারীর মতো, মেঘের ঘোমটা খুলে সে কখনও পৃথিবীর দিকে তাকায় না। তাই অবগুণ্ঠনমুক্ত শুক্রের সৌন্দর্য উপভোগ করা আজও সম্ভব হয়নি।



চিত্র ৪৮। কক্ষপথে শুক্র ও পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে শুক্রের কলা কিরূপ দেখা যায়, তাই এঁকে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অবস্থানে দৃশ্যমান শুক্রের আয়তন তুলনা ক'রে দেখানো হয়েছে।

শুক্রের আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান, তবে ওজন একটু কম, পৃথিবীর ওজনের $\frac{৪}{৫}$ ভাগের সমান। শুক্র একটি অন্তর্গ্রহ, সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ৬,৭০,০০,০০০ মাইল। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর প্রায় ২২৫ দিন লাগে। এই গ্রহটি যখন পৃথিবীর

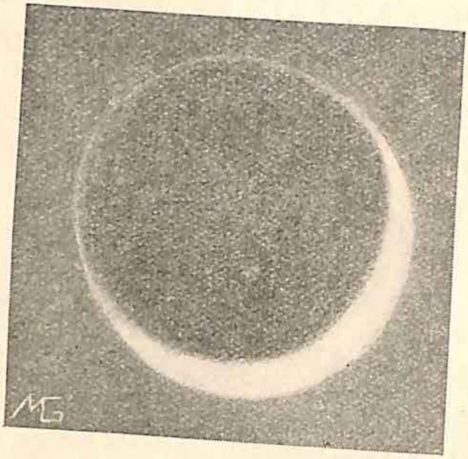
সবচেয়ে কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব থাকে প্রায় ২,৫০,০০,০০০ মাইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন একে দেখা যায় না, কারণ তখন শুক্রের অন্ধকার দিকটাই পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। বুধ বা চন্দ্রের মতো শুক্রেরও কলা দেখা যায়, কাজেই তখন শুক্রের অমাবস্যা। শুক্র যখন কাস্তের মতো সরু হ'য়ে যায় (তৃতীয়ার চাঁদের মতো) তখনো



চিত্র ৪৯। শুক্রগ্রহের কলা-পরিবর্তন—আকৃতি ও আয়তন লক্ষণীয় (কক্ষপথে বিভিন্ন অবস্থানে গৃহীত আলোকচিত্র অনুসারে অঙ্কিত)। নিকটতম অবস্থানে শুক্রকে দেখা যায় না, কারণ তখন শুক্রের অন্ধকার দিকটাই পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। এর অল্পদিন আগে বা পরে শুক্রকে একফালি চাঁদের মতো দেখায়। যখন গোলাকার শুক্রকে দেখার সুযোগ আসে তখন তা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তাই তখনই তার আয়তন সবচেয়ে কম ব'লে মনে হয়।

দেখা যায়, শুক্রের আলোকিত অংশ দু'পাশেই অর্ধেকের চেয়ে খানিকটা বেশিদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আবার শুক্রের যখন অমাবস্যা তখন শুক্র একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায় না। গোলাকার এবং কালো শুক্র-পৃষ্ঠের চারিধার দিয়ে যেন একটু আবছা আলো ফুটে বেরুচ্ছে বলে ম'নে হয়।

শুক্রে আবহমণ্ডল না থাকলে এ জিনিস কখনও দেখা যেত না। আবহমণ্ডল আছে ব'লে পৃথিবীতে যেমন সূর্যাস্তের পর গোধূলি দেখা যায়, শুক্রেও যে সেরকম গোধূলির সৃষ্টি হয় তা অনায়াসে বলা যেতে পারে।



চিত্র ৫০। অন্ধকার দিক দিয়েও শুক্রগ্রহের আলো ফুটে বেরুচ্ছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে শুক্রে আবহমণ্ডল আছে।

শুক্রের আলোকিত অংশের উত্তাপ প্রায় ১৪০° ফারেনহাইটে পৌঁছায়, আবার অন্ধকার দিকের উত্তাপ −৯° ফারেনহাইটে নামে। শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের অনেক কাছে আছে, কিন্তু সেই তুলনায় শুক্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা খুব বেশি ওঠা-নামা করে না। এজন্য মনে হয়, শুক্রের চারদিকে গ্যাসের পুরু আবরণ রয়েছে ব'লে শুক্র-পৃষ্ঠের উষ্ণতা খুব বেশি উঠতে পারে না। আর দিনের বেলা যেটুকু উত্তপ্ত হয় রাত্রিবেলা সেই তাপ বিকিরণ ক'রে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হ'তে পারে না, যেমন শীতের দিনে লেপমুড়ি দিয়ে থাকলে আমাদের দেহ বেশি ঠাণ্ডা হ'তে পারে না। কাজেই শুক্রের অন্ধকার দিকের তাপমাত্রা বেশি নীচে নামতে পারে না। আর একটা কথা, চাঁদ কিংবা বুধের মতো শুক্রের একটা পিঠই যদি বরাবর সূর্যের দিকে ফেরানো থাকত তাহ'লে এর অন্ধকার পিঠের তাপমাত্রা আরও অনেক নীচে নেমে যেত। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে মার্কিন

জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিচার্ডসন বলেছেন, শুক্র যদি পশ্চিম থেকে পুবে ঘোরে, তাহ'লে নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পাক খেতে তার সাতদিনের বেশি লাগে ; কিন্তু সে যদি পুব থেকে পশ্চিমে ঘোরে, তাহ'লে একবার পাক খেতে তার লাগে প্রায় সাড়ে তিন দিন।

শুক্রের আবহমণ্ডলে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ পরীক্ষায় অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। এই দু'টি গ্যাস যদি থাকেই তবে তাদের পরিমাণ নিশ্চয়ই এত কম যে সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুর চেয়ে প্রায় দেড়গুণ ভারি। এই গ্যাস শুক্রের আবহমণ্ডলের উর্ধ্বতম প্রদেশে আছে, কাজেই এর নীচে অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্পের মতো হালকা গ্যাস আছে ব'লে কল্পনাও করা যায় না। শুক্রের মেঘ যদি পৃথিবীর মেঘের মতো জলভরা মেঘ হ'ত তাহ'লে সেখানকার আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া উচিত ছিল। তাহ'লে ওগুলো কিসের মেঘ? কিছুদিন আগে শুক্রের আবহমণ্ডল সম্পর্কে বিজ্ঞানী ভিল্‌ট যে নূতন মতবাদ প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, অতিবেগনী আলোর সংস্রবে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে ফর্‌ম্যালডিহাইড (Formaldehyde) গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এভাবে শুক্রের আবহমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প নিঃশেষিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই বিক্রিয়ার সময় খানিকটা অক্সিজেন গ্যাসও সৃষ্টি হওয়ার কথা। সেই অক্সিজেন কোথায় গেল? ভিল্‌ট বলেন, অক্সিজেন অত্যন্ত সক্রিয় গ্যাস, এর পক্ষে উত্তপ্ত শুক্রের নানারূপ উপাদানের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নানারূপ যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। আমরা জানি, ভূ-পৃষ্ঠে নানারূপ অক্সাইড-জাতীয় খনিজ সৃষ্টি করায় পৃথিবীর আবহমণ্ডল থেকে অক্সিজেনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খরচ হ'য়ে গেছে। কাজেই উপরোক্ত উপায়ে শুক্রের আবহমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেন নিঃশেষিত হওয়ার

কথা অনায়াসে কল্পনা করা চলে। কিন্তু এতেও সমস্যা মিটল না। ভিল্‌ট অনেক অনুসন্ধান ক'রেও শুক্রে ফর্‌ম্যালডিহাইড গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলেন না। ভিল্‌ট তাঁর মতবাদের সমর্থনে আর একটা যুক্তি দিলেন। ফর্‌ম্যালডিহাইড গ্যাস জলের সংস্পর্শে এলেই ঘন মেঘের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই মেঘ জলকণার পরিবর্তে অসংখ্য প্লাস্টিক (Plastic)-জাতীয় পদার্থের কণা দিয়ে তৈরি। কাজেই ভিল্‌ট বললেন, আবহমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নীচু এবং উত্তপ্ত স্তরে ফর্‌ম্যালডিহাইড ও জলের ক্রিয়ায় যে প্লাস্টিক মেঘের সৃষ্টি হয় তারই উজ্জ্বল রূপ আমরা দেখতে পাই। এই প্লাস্টিক-জাতীয় পদার্থ বিশেষ উদ্বায়ী নয়, কাজেই আবহমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্লাস্টিক মেঘের ঊর্ধ্বে বহুদূর পর্যন্ত শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রয়েছে, কাজেই শুধু সেই গ্যাসের অস্তিত্বই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। ভিল্‌ট-এর মতবাদ অনেকখানি কল্পনা আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে, কাজেই এর উপর নির্ভর ক'রে এখনই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না।

কোন গ্রহে জীবের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায়, যদি সেখানে অক্সিজেন এবং জল থাকে। শুক্রে অক্সিজেন এবং জল আছে কি নেই, তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায়নি। কাজেই সেখানে জীব আছে কিনা তাও নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ ক'রে দেহের পুষ্টি সাধন করে এবং অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। শুক্রে এখন প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং হয়তো সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন আছে। কাজেই পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, গ্রহদের ক্রম-বিকাশের ধারায় শুক্র এখনও পৃথিবীর অনেক পেছনে পড়ে আছে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, শুক্রগ্রহ নিষ্প্রাণ ও জীবন-স্পন্দনহীন। সেখানকার অসীম নৈঃশব্দের কথা চিন্তা ক'রে এইসব বিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। শুক্রগ্রহে এখনও হয়তো শুধু জড়ের ক্রিয়া চলছে। বাতাস আছে, মেঘ আছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা আছে, আর আছে আলোক ও অন্ধকারের আনাগোনা। কোটি কোটি বছর আগে যখন পৃথিবীতে প্রাণ

ছিল না, শুধু জড়ের লীলা ছিল, পৃথিবীর সেই শৈশব রূপ হয়তো দেখা যাবে শুক্রগ্রহে।

কিন্তু সম্প্রতি এমন কতগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে এই ধারণা বদলাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শুক্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ ক'রে মেঘমণ্ডলের মাথার উপরে অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তবে তার পরিমাণ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে তার হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। শুক্রে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বের কথা পৃথিবী থেকে জানা যায়নি। কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানী স্ট্রং ১৯৬০ সালে দূরবীণ সঙ্গে নিয়ে ১৫ মাইল উঁচুতে উঠে পরীক্ষা ক'রে শুক্রে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পেয়েছেন। ফরাসী বিজ্ঞানী লিয়ো শুক্রের আলোকের ধ্রুবীভবন (Polarisation) সম্পর্কে পরীক্ষা ক'রেও বুঝতে পেরেছেন যে, শুক্রে জলবিন্দুপূর্ণ মেঘ থাকা সম্ভব।

এইসব কারণে সোভিয়েট বিজ্ঞানী বারবাশোভ মনে করেন, পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব যেভাবে ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে শুক্র-গ্রহে। সেখানে সবেমাত্র জীবনের আবির্ভাব ঘটতে আরম্ভ করেছে। তবে পৃথিবীর সমুদ্রের আদিমতম প্রোটোপ্লাজ্ম, না অন্য কিছু, এই জীবনের সূত্রপাত করেছে, তা এখনও নিশ্চয় ক'রে বলা যায়নি। কিন্তু একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোটি কোটি বছর আগে, কার্বনিফেরাস্ যুগে, পৃথিবী যে অবস্থা অতিক্রম ক'রে এসেছে, শুক্র এখন সেই অবস্থায় সবেমাত্র পৌঁচেছে। উদ্ভিদের এই জীবনধারা যদি অপ্রতিহত গতিতে কোটি কোটি বছর ধরে চলতে থাকে তবে পৃথিবীর মতোই সেখানকার বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ কমবে, আর তার বদলে প্রাণদায়ী অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়বে। আর সেই অবসরে শুক্রে হয়তো আবির্ভূত হবে পৃথিবীর মতোই নানাপ্রকার প্রাণী। শুক্রে জীব আছে একথা যেমন নিশ্চিতরূপে বলা যায়নি, তেমনি সেখানে জীব থাকা সম্ভব নয় একথাও জোর ক'রে বলা যায়নি। মোট কথা, ঘোমটার আড়ালে শুক্রের কি রহস্যময় রূপ লুকানো রয়েছে, তা আজও কেউ জানতে পারেনি।

পৃথিবী

আমাদের এই পৃথিবীটাও একটা গ্রহ। এর ব্যাস ৭,৯২৭ মাইল এবং ওজন প্রায় $১\cdot৭ \times ১০^{২৩}$ মণ বা ৬×১০^{২৭} গ্রাম। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। একটা লাট্টু যেমন ঘোরে, পৃথিবীও তেমনি ক্রমাগত ঘুরছে। একবার ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা বা একদিন, এ থেকেই দিবা-রাত্রির প্রকাশ হয়। পৃথিবী কি শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পাক খাচ্ছে? মোটেই না, এইভাবে পাক খেতে খেতে সে আবার নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তাইতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতু প্রকাশ পাচ্ছে। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে লাগে ৩৬৫ দিন বা এক বছর। এক বছর পরে তাই ঋতুগুলো আবার পর পর ফিরে আসে। পৃথিবী সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

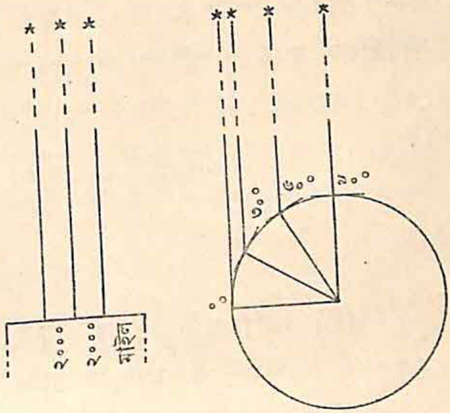
পৃথিবী যে গোল তার প্রমাণ

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ সবই গোলাকার, এই দেখে প্রাচীন বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পৃথিবীও গোলাকার। কালক্রমে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে, তারই কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হ'ল।

(১) চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চাঁদের উপর পড়ে তা সব সময়ই গোলাকার দেখা যায়। পৃথিবী যদি গোলকের মতো না হ'য়ে একটা থালার মতো চেপ্‌টা হ'ত তাহ'লে তার ছায়া সব সময় গোলাকার হ'তে পারত না।

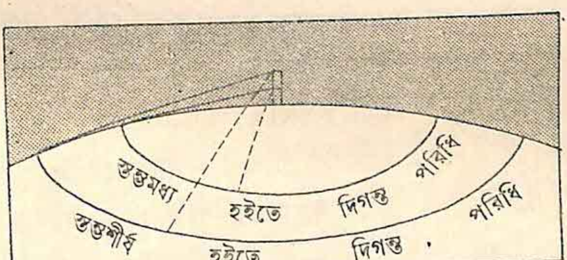
(২) ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র এক সময় সূর্যোদয় হয় না, পুবদিকের দেশ-গুলিতে পশ্চিমের দেশগুলির চেয়ে একটু আগে সূর্যোদয় হয়। পৃথিবী সমতল হ'লে সর্বত্র একই সময় সূর্যোদয় হ'ত। পৃথিবীকে একটা গোলক মনে করলে এবং নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে মনে করলে দেখা যায় গণিতের হিসেব অনুযায়ীও বিভিন্ন দেশগুলিতে পর পর সূর্যোদয় হওয়া উচিত। এতেই বোঝা যায় পৃথিবী গোল।

(৩) সুমেরু-বিন্দুর ঠিক মাথার উপর ধ্রুবতারা দেখা যায়। এখান থেকে নিরক্ষরেখার দিকে ২০০০ মাইল এগিয়ে গেলে দেখা যায় ধ্রুবতারা মাথার ওপর থেকে ৩০° নেমে গেছে। এভাবে আরও ২০০০ মাইল এগিয়ে গেলে ধ্রুবতারা আরও ৩০° নেমে যাবে। শেষে যখন আরও ২০০০ মাইল এগিয়ে নিরক্ষরেখায় উপস্থিত হওয়া যাবে তখন দেখা যাবে ধ্রুবতারা আরও ৩০° নেমে একেবারে দিগন্তরেখার সঙ্গে মিশে গেছে। ভূ-পৃষ্ঠ গোলাকার ব'লেই এরূপ দেখা সম্ভব হয়। ভূ-পৃষ্ঠ সমতল হ'লে দর্শকের এরূপ বিভিন্ন অবস্থানেও ধ্রুবতারার অবস্থানে কোন তারতম্য হ'তে পারে না।



চিত্র ৫১

(৪) কোন বিশাল প্রান্তরে বা সমুদ্র-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে

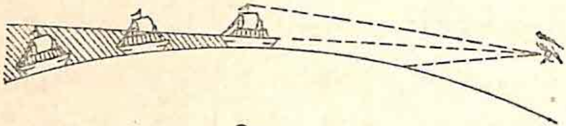


চিত্র ৫২

তাকালে মনে হয় আকাশ ও পৃথিবী যেন একটি বৃত্তরেখায় মিলিত হয়েছে। এর নাম দিগন্ত (horizon)। সেইখানে দর্শক যদি উপরদিকে আরও উঠে যায় তাহ'লে দিগন্তের পরিধি আরও বেড়ে যাবে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ একটা গোলকের অংশ না হ'লে এরূপ দেখা যেত না।

(৫) দূর সমুদ্র থেকে কোন জাহাজ যখন তীরের দিকে আসতে

থাকে তখন তীর থেকে প্রথম তার মাস্তুলের অগ্রভাগ বা চিম্‌নির অগ্রভাগ দেখা যায়। জাহাজটি যত কাছে আসতে থাকে তত তার নীচের অংশগুলি ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ সমতল হ'লে জাহাজটি একবারেই প্রকাশিত হ'ত। পৃথিবী গোলাকার ব'লে সমুদ্র-পৃষ্ঠও গোল তাই এরূপ দেখা সম্ভব হয়।

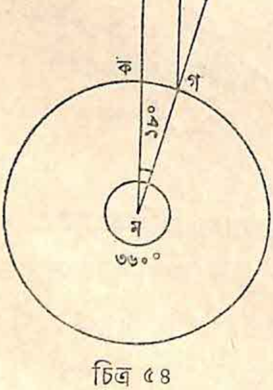


চিত্র ৫৩

(৬) ম্যাজেলান, ড্রেক, কুক প্রভৃতি নাবিকগণ পুবদিক থেকে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে জাহাজ চালিয়ে যান। এইভাবে চলতে চলতে বিশেষ দিক্ পরিবর্তন না ক'রেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে যাত্রা করেছিলেন সেখানেই ফিরতে পেরেছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে পৃথিবী গোলাকার।

পৃথিবীর আয়তন

পৃথিবীর আয়তন জানতে হ'লে সব আগে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করা দরকার। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে মিশরদেশীয় বিজ্ঞানী ইরাতোস্থিনিস (Eratosthenes) যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন সেই সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হ'ল।



চিত্র ৫৪

ধরা যাক, ক ও গ বিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে দু'টি শহরের অবস্থান নির্দেশ করছে, এদের দূরত্ব ১২৪২ মাইল। একটি নক্ষত্র যখন ক শহরের ঠিক মাথার উপরে, অর্থাৎ খ সোজা থাকে, ঠিক সে-সময় গ শহর থেকে নক্ষত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা ঠিক মাথার উপর খ' সোজা না থেকে একটু হেলানো অবস্থায়, অর্থাৎ স সোজা রয়েছে ব'লে মনে

হবে। যন্ত্র সাহায্যে সগখ' কোণ মেপে দেখা গেল তার পরিমাপ হ'ল ১৮°। নক্ষত্রটি বহুদূরে অবস্থিত কাজেই তা থেকে যে আলোক-রশ্মিগুলি আসছে সেগুলি সবই সমান্তরাল মনে করা যেতে পারে। জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে খক রেখা এবং খ'গ রেখা দু'টি বর্ধিত করলে তারা কেন্দ্রবিন্দু ম-তে মিলিত হবে। কখ এবং গস সমান্তরাল এবং মখ' রেখা তাদের ছেদ করেছে, কাজেই ∠কমগ = ∠সগখ' = ১৮°। ম বিন্দুর চতুষ্পার্শ্বস্থ কোণের পরিমাপ হ'ল ৩৬০°। এখন ১৮°র অনুপাত হ'ল ১২৪২, কাজেই ৩৬০° অনুপাত হবে

$$\frac{১২৪২}{১৮} \times ৩৬০ = ২৪৮৪০ \text{ মাইল।}$$

সুতরাং পৃথিবীর পরিধি ২৪৮৪০ মাইল।

গণিতের নিয়ম অনুসারে পরিধি $= 2\pi r$

অর্থাৎ, $২৪৮৪০ = ২ \times \frac{২২}{৭} \times$ ব্যাসার্ধ

অথবা, ব্যাসার্ধ $= \frac{২৪৮৪০ \times ৭}{৪৪}$

= প্রায় ৪০০০ মাইল

(প্রায় ৬,৪০০ কিলোমিটার)।

পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ক্রমাগত পাক খাচ্ছে ব'লে উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা। সূক্ষ্ম হিসেবে দেখা যায় পুব-পশ্চিমের ব্যাস ৭৯২৬ মাইল, আর উত্তর-দক্ষিণের ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল, অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণের ব্যাসের পরিমাপ পুব-পশ্চিমের ব্যাসের চেয়ে প্রায় ২৭ মাইল কম।

পৃথিবীর ব্যাস ৩৯৬৩ মাইল (অথবা ৬৩,৭৮,৩৮৮ সেন্টিমিটার) ধরে পৃথিবীর যে আয়তন পাওয়া যায় তার হিসেব নীচে দেওয়া হল।

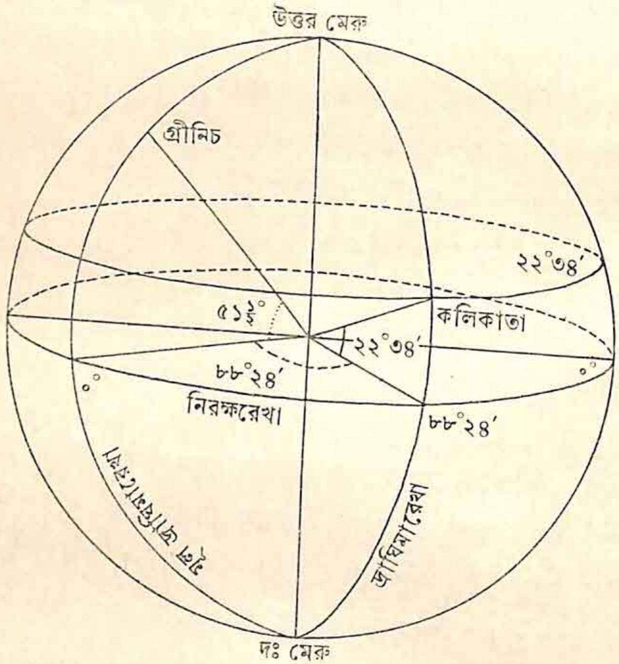
পৃথিবীর আয়তন $= \frac{4}{3}\pi r^3$

$= ২৬{\cdot}০৮ \times ১০^{১০}$ ঘন মাইল

(অথবা $১{\cdot}০৮ \times ১০^{২৭}$ ঘন সেন্টিমিটার)।

অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা

পৃথিবীর অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি রেখা কল্পনা করা হয়, এর নাম **অক্ষ** (Axis)। এই অক্ষের দুই প্রান্তের নাম **ভূ-মেরু** (Poles)। পৃথিবীর মধ্যস্থলে, দুই মেরু থেকে সমান দূরে, ভূ-পৃষ্ঠকে বেষ্টন ক'রে যে রেখা কল্পনা করা হয়েছে, তার নাম **নিরক্ষবৃত্ত** (Terrestrial equator)। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে দু'টি সমান অংশে ভাগ করেছে। যে অংশটি নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত, তার নাম **উত্তর গোলার্ধ** (Northern hemisphere) এবং যেটি নিরক্ষরেখার দক্ষিণে, তার নাম **দক্ষিণ গোলার্ধ** (Southern hemisphere)।



চিত্র ৫৫

নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনস্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের **অক্ষাংশ** (Latitude) বলা হয়। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০° ধরে উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরুর অক্ষাংশ যথাক্রমে ৯০° উত্তর ও ৯০° দক্ষিণ ধরা হয়। আবার পূর্ব-পশ্চিমের অবস্থান জানার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে উত্তর থেকে দক্ষিণ

মেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ ক'রে এরূপ আর একটি নির্দিষ্ট রেখার প্রয়োজন। নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত প্রতিটি বিন্দুকে লম্বভাবে ছেদ ক'রে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এক একটি রেখা কল্পনা করা যায়। এরূপ রেখার নাম দ্রাঘিমারেখা (Lines of longitude)। লণ্ডনের উপকণ্ঠস্থ গ্রীনিচ নামক স্থানের উপর দিয়ে যে রেখাটি গিয়েছে তাকেই মূল দ্রাঘিমারেখা ধরে অন্যান্য স্থানের দ্রাঘিমারেখার অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

কলকাতার অক্ষাংশ ২২° ৩৪´ উত্তর। এর অর্থ, কলিকাতা উত্তর গোলার্ধে এমন একটি স্থানে অবস্থিত, নিরক্ষরেখা থেকে যার কৌণিক দূরত্ব ২২° ৩৪´। আবার কলকাতার দ্রাঘিমা ৮৮° ২৪´ পূঃ বললে বোঝা যায় যে, কলকাতা মূল দ্রাঘিমারেখার পূর্বে এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেখানকার দ্রাঘিমারেখা এবং মূল দ্রাঘিমারেখার মধ্যে কৌণিক দূরত্ব ৮৮° ২৪´ (চিত্র ৫৫ দ্রষ্টব্য)।

পৃথিবীর আবর্তন

প্রতিদিন আমরা দেখি, ভোরবেলা পুব আকাশে সূর্য উদিত হ'ল, সারাদিন ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল আকাশপথে এবং শেষে পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হ'ল। এভাবে দিন ও রাত্রির প্রকাশ হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সূর্যই স্থির আছে, আর পৃথিবী একটা লাট্টুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, তাই এমন দেখা যাচ্ছে।

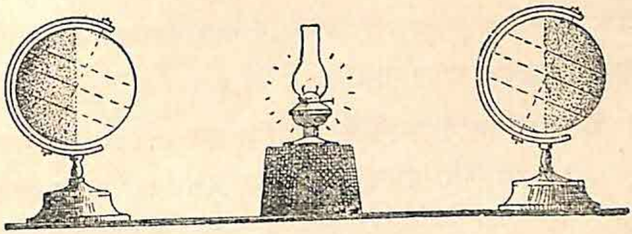
পৃথিবী থেকে সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি সবই কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে। এত দূরে থেকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময়ে এরা পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে, একথা কল্পনাও করা যায় না। আর সে অবস্থায় সূর্য বা গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে এত দ্রুতগতিতে ঘুরতে হ'ত যে তা নিতান্ত অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। তা ছাড়া এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির

অনেকেই পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড় ও ভারি। বৃহত্তর বা গুরুভার বস্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা বস্তুর চারদিকে ঘুরছে এরূপ ঘটনা নিউটন-এর মহাকর্ষের সূত্র অনুসারে মোটেই সম্ভব নয়।

আমরা বলি, দূরের ঐ গাছ কিংবা বাড়ি স্থির রয়েছে। এর অর্থ কি? গাছ বা বাড়ি নিজের স্থান ত্যাগ করে না, বরাবর একই জায়গায় থাকে। আবার যখন বলব, গাড়িটি গতিশীল, তখন বুঝতে হবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি তার স্থান পরিবর্তন করছে। গতি এবং স্থিতির অবস্থাটা কিন্তু আপেক্ষিক, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের অবস্থার উপর। ধরা যাক একটি রেলগাড়ির মধ্যে অনেক যাত্রী বসে রয়েছে এবং গাড়িটি দ্রুতবেগে কোন স্টেশন অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। একটি কামরার জানালা, দরজা সব-কিছু বন্ধ, বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই কামরার একজন যাত্রীর কাছে মনে হবে, অন্যান্য যাত্রী, গাড়ি প্রভৃতি সবই যেন স্থির আছে, কেউই স্থান পরিবর্তন করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গাড়ি ও যাত্রী সবইতো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে! স্টেশনের কোন পর্যবেক্ষক একথা সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু এসময় গাড়ির জানালা খুলে কোন যাত্রী হঠাৎ বাইরের দিকে তাকালে দেখতে পাবে, গাড়িটি যেন স্থির রয়েছে আর স্টেশনের বাড়িটা যেন দ্রুতবেগে পেছনদিকে সরে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যাত্রীটি যা দেখছে তা হ'ল স্টেশনের আপেক্ষিক গতি, এই গতি যাত্রীর নিজস্ব গতির উল্‌টো। পৃথিবী একটা লাট্টুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, তাই পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের বা গ্রহ-নক্ষত্রের এরূপ আপেক্ষিক গতি দেখতে পাই, আমাদের মনে হয় সূর্যই যেন পুবদিকে উঠে পশ্চিমদিকে অস্ত যাচ্ছে। কাজেই এই ধারণাটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীই পশ্চিম থেকে পুবদিকে আবর্তিত হচ্ছে। এভাবে একবার ঘুরতে লাগে প্রায় ২৪ ঘণ্টা, এর নাম পৃথিবীর আহ্নিক গতি।

যে সময়ে পৃথিবীর এক অর্ধাংশে সূর্যকিরণ পড়ছে, সেখানে হচ্ছে দিন। অপর অর্ধাংশ তখন সূর্যের বিপরীত দিকে রয়েছে, সেখানে সূর্যকিরণ পড়ছে না, তাই সেখানে রাত্রি। টেবিলের উপর একটা বাতি রেখে একটা

ভূ-গোলক ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যাবে, কিভাবে দিন ও রাত্রির প্রকাশ হয়।



চিত্র ৫৬

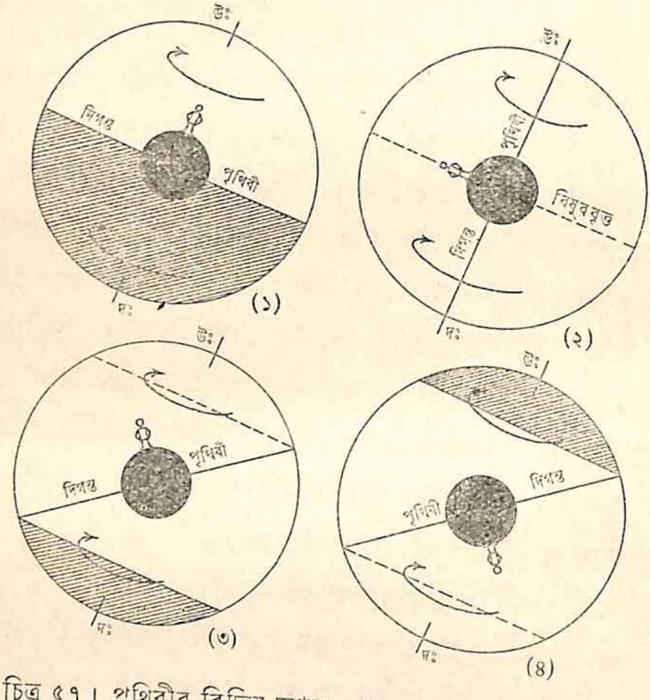
বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে আসছে। এর ফলে, প্রত্যহ দিনের দৈর্ঘ্য এক সেকেণ্ডের হাজারভাগের একভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গণনা অনুযায়ী, আপন কক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ যদি বর্তমান হারেই হ্রাস পেতে থাকে, তাহ'লে গতিবেগ হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে স্থির হ'তে তার প্রায় ১৬০০ কোটি বছর লাগবে! অতি দূরভবিষ্যতে হ'লেও যেদিনে ও যেক্ষণে পৃথিবীর আবর্তন একেবারে থেমে যাবে তখন তার একটা পিঠ থাকবে সূর্যের দিকে এবং অন্য পিঠ থাকবে সূর্যের বিপরীত দিকে। তার ফলে অন্তহীন সূর্যের অক্ষয় আশীর্বাদে ভূ-পৃষ্ঠের একদিক হবে চিরদিবসদ্বারা দীপ্ত, কিন্তু অপরদিক নিমজ্জিত থাকবে চিররাত্রির নীরন্ধ্র অন্ধকারে।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যে আকাশ দেখা যায় তা বিভিন্নরূপ, আর সেখান থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের আপাতগতিও বিভিন্নরূপ ব'লে মনে হয়। পৃথিবীর চারিটি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আকাশ যেমন দেখাবে সে সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

(১) ধরা যাক, দর্শক ঠিক উত্তর-মেরুর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে খ-মধ্য ও সুমেরু এক হবে আর সুমেরুকে কেন্দ্র ক'রে, দিগন্তরেখার সমান্তরালভাবে, নক্ষত্রগুলিকে ঘুরতে দেখা যাবে। এখান থেকে আকাশের অর্ধাংশ মাত্র দেখা সম্ভব হবে, বাকি অর্ধাংশ দিগন্তরেখার নীচে দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে থাকবে।

(২) দর্শক নিরক্ষরেখার উপর থাকলে দেখবে, খ-মধ্য বিষুববৃত্তের উপর রয়েছে। এখান থেকে দর্শক প্রতিটি নক্ষত্রকে উদিত হ'তে এবং অস্ত যেতে দেখবে, তবে সুমেরু এবং কুমেরুর নিকটস্থ নক্ষত্রগুলিকে দিগন্তরেখার বেশি উপরে উঠতে দেখা যাবে না।

(৩) উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে থাকলে সুমেরুর নিকটস্থ নক্ষত্রগুলিকে সব সময় দেখা যাবে, এগুলি কখনও অস্ত যাবে না। বিষুব-



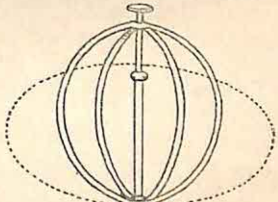
চিত্র ৫৭। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আকাশ যেরূপ দেখা যায়

বৃত্তের নিকটস্থ নক্ষত্রগুলিকে উদিত হ'তে এবং অস্ত যেতে দেখা যাবে, কিন্তু কুমেরুর নিকটস্থ নক্ষত্রগুলি সব সময়ই দৃষ্টির অন্তরালে থাকবে।

(৪) দক্ষিণ গোলার্ধে গেলে সবই উলটো ব'লে মনে হবে। এই অঞ্চল থেকে দক্ষিণের নক্ষত্রগুলি সবই দেখা যাবে, কিন্তু সুমেরুর নিকটবর্তী নক্ষত্রগুলি কখনই দেখা যাবে না।

পৃথিবী যে উত্তর-দক্ষিণে চাপা তার কারণ কি ?

বিজ্ঞানীদের মতে সুদূর অতীতে পৃথিবী যখন কোমল ছিল, তখন পৃথিবী দ্রুত আবর্তিত হওয়ার ফলে এরূপ উত্তর-দক্ষিণে চাপা হ'য়ে গেছে। কোমল অবস্থায় পৃথিবী যখন দ্রুত আবর্তিত হচ্ছিল তখন ভূ-পৃষ্ঠের সব জায়গার ঘুরবার বেগ সমান ছিল না। এই গতিবেগ নিরক্ষরেখার উপরস্থ বিন্দুরই সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ এই বিন্দু ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। কিন্তু উত্তর বা দক্ষিণদিকে বৃত্তের পরিধি ক্রমশ কমে যাচ্ছে, কাজেই গতিবেগও ক্রমশ কমছে। এভাবে কমতে কমতে শেষে উত্তর বা দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে এই গতি একেবারেই থাকে না। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে, কাজেই আবর্ত-গতির নিয়ম অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত সকল বিন্দুর উপরই অপকেন্দ্র-বল প্রযুক্ত হচ্ছে। উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে এই বলের মাত্রা নিরক্ষবৃত্তের উপরস্থ বিন্দুর উপরই সবচেয়ে বেশি হবে। এর ফলে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের জড়কণিকার চেয়ে নিরক্ষরেখা অঞ্চলের জড়কণিকাগুলির বাইরের দিকে ছুটে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা অনেক বেশি হবে। গোড়ার দিকে পৃথিবী কোমল ছিল তাই তার মধ্যভাগ একটু স্ফীত হ'য়ে উঠেছিল, আর মধ্যভাগে অধিক-পরিমাণ জড়পদার্থ পুঞ্জীভূত হওয়াতে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণে একটু চেপে গিয়েছিল। দ্রুত আবর্তনের ফলে যে পৃথিবী এরূপ উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা হ'য়ে যেতে পারে তা নীচের পরীক্ষা থেকে সহজেই বোঝা যাবে।



চিত্র ৫৮

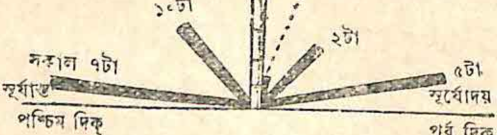
একটি যন্ত্র নেওয়া হ'ল, তার মাঝখানে ধাতুনির্মিত একটি অক্ষ খাড়াভাবে রয়েছে। এই অক্ষটির গোড়ায় চারটি স্থিতিস্থাপক ধাতব পাত এমনভাবে আটকানো রয়েছে যে, তারা দু'টি সমতলে আছে এবং সেই সমতল দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে। পাতগুলি উপরদিকে একটা আংটার সঙ্গে আটকানো রয়েছে। এই আংটাটি স্থির থাকে না, উপরে

বা নীচে উঠা-নামা করতে পারে। স্থির অবস্থায় একে সম্পূর্ণ গোলাকার পৃথিবী যেমন ছিল তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এবার যন্ত্র সাহায্যে একে দ্রুতবেগে ঘোরাতে থাকলে দেখা যাবে, এর মাঝখানটা বেশ স্ফীত হ'য়ে উঠেছে এবং তার ফলে উপরের আংটাটি বেশ খানিকটা নীচের দিকে নেমে এসেছে। এ অবস্থায় একে অনেকটা ডিম্বাকৃতি ব'লে মনে হয়। এ থেকেই বোঝা যাবে পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে কেন একটু চাপা হয়েছে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল। ঐ পরিধির উপরস্থ যে-কোন বস্তুর গতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও কিছু বেশি। উত্তর ও দক্ষিণে এই গতিবেগ ক্রমশ কমে গেছে। ভূ-পৃষ্ঠে থেকে আমরাও অবিরত প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছি। কিন্তু এই বিপুল গতিবেগ সম্পর্কে আমরা মোটেই সচেতন নই, তার কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোন স্থানের এবং সেই স্থানের মানুষের গতিবেগ সমান, অর্থাৎ আমাদের তুলনায় পৃথিবীর কিংবা পৃথিবীর তুলনায় আমাদের কোন গতি নেই। পৃথিবী সর্বদাই আমাদের ভূ-কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে তাই এরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও আমরা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাইরের দিকে ছিটকে যাই না। দৈবাৎ পৃথিবীটা যদি থেমে যায়, তবে হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি খেয়ে আমরা কে যে কোথায় ছিটকে যাব তা ধারণা করাও সম্ভব নয়!

পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণ

(১) **দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি**—আমরা জানি আলোর সামনে কোন জিনিস রাখলে আলোর উলটোদিকে তার ছায়া পড়ে। তেমনি

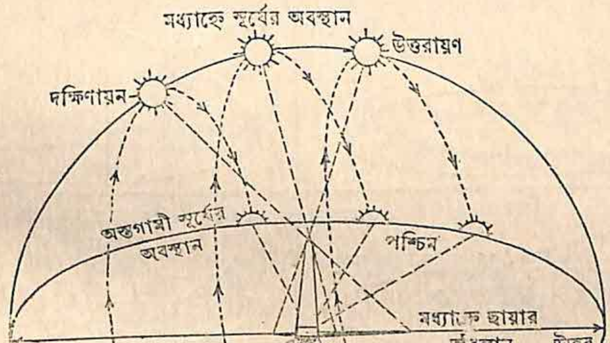


চিত্র ৫৯

সূর্য-কিরণের পথেও কোন জিনিস থাকলে সূর্যের উলটোদিকে তার ছায়া পড়বে। উঠানের মাঝখানে একটা কাঠি ঠিক খাড়াভাবে পুঁতে প্রতিদিন

তার ছায়া পর্যবেক্ষণ করলে একটা মজার জিনিস দেখা যাবে। সকাল বেলায় সূর্য থাকে পুব আকাশে, কাজেই তখন সব-কিছুর ছায়া পড়ে পশ্চিম-দিকে, আর সেই ছায়াটাই হয় সবচেয়ে লম্বা। ক্রমে বেলা যত বাড়তে থাকে এই ছায়াও তত ছোট হ'তে থাকে। ঠিক দুপুর বারোটায় এই ছায়া হয় সবচেয়ে ছোট। এরপর সূর্য ক্রমশ পশ্চিমদিকে হেলতে থাকে, এর ফলে কাঠির ছায়াও ক্রমশ বড় হ'তে থাকে এবং পুবদিকে সরতে থাকে। সূর্যাস্তের সময় ছায়া আবার খুব লম্বা হয় এবং পুবদিকে পড়ে।

এরপর প্রতিমাসের পয়লা তারিখে ঠিক মধ্যাহ্নে কাঠিটার ছায়া মেপে দেখতে হবে। এতে বোঝা যাবে, প্রতিমাসে এই ছায়ার মাপ এক সমান হয় না, তার কারণ প্রতিমাসে মধ্যাহ্নে সূর্য আকাশের ঠিক একই জায়গায় থাকে না। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, প্রতিমাসে

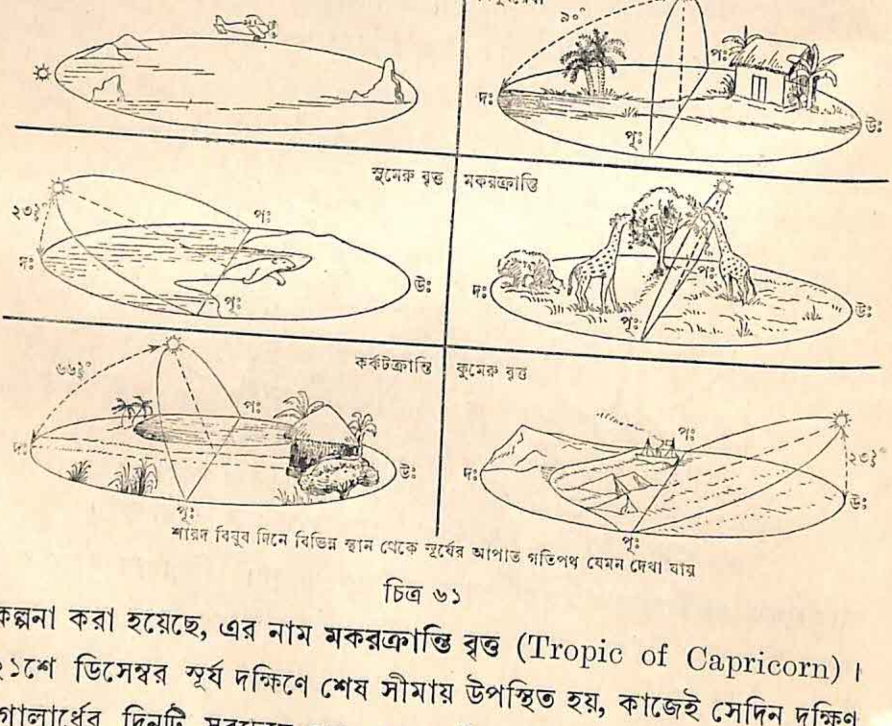


চিত্র ৬০। নিরক্ষরেখার উত্তরে কিন্তু কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত কোন স্থান থেকে বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যের আপাতগতিপথ যেরূপ দেখা যায়।

আকাশের একই জায়গায় সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হয় না। ডিসেম্বর মাসে সূর্য অনেকটা দক্ষিণ ঘেঁষে উদিত হয়। সে-সময় দক্ষিণের বারান্দায় রোদ আসে, আর দিনের চেয়ে রাত বড় হয়। এর নাম সূর্যের **দক্ষিণায়ন**। ২১শে ডিসেম্বর সূর্য সবচেয়ে দক্ষিণে সরে উদিত হয়। আবার জুন মাসে

দেখা যায়, অনেকটা উত্তরে সরে সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন আর দক্ষিণের বারান্দায় রোদ আসে না। এই সময় দিনের চেয়ে রাত ছোট হয়। এর নাম সূর্যের **উত্তরায়ণ**। ২১শে জুন সূর্য সবচেয়ে উত্তরে সরে যায়। ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর সোজা পুবদিকে সূর্যোদয় হয়। এজন্য এই দুই তারিখে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়।

ধরা যাক, কোন দর্শক নিরক্ষরেখার উত্তরে কোন স্থান থেকে সূর্যের এই আপাতগতি পর্যবেক্ষণ করছে। তাহ'লে সে কি দেখবে? শীতকালে সূর্য থাকে দক্ষিণ গোলার্ধের উপরে। কাজেই তখন দর্শক সূর্যকে দক্ষিণ আকাশে দেখবে। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ২৩½° দক্ষিণে সরে আকাশপথে সঞ্চরণ করে। সূর্য এর চেয়ে আর দক্ষিণে সরে যায় না। এজন্য নিরক্ষবৃত্তের ২৩½° দক্ষিণে ভূ-পৃষ্ঠের উপর একটি বৃত্তের



শারদ বিষুব দিনে বিভিন্ন স্থান থেকে সূর্যের আপাত গতিপথ যেমন দেখা যায়

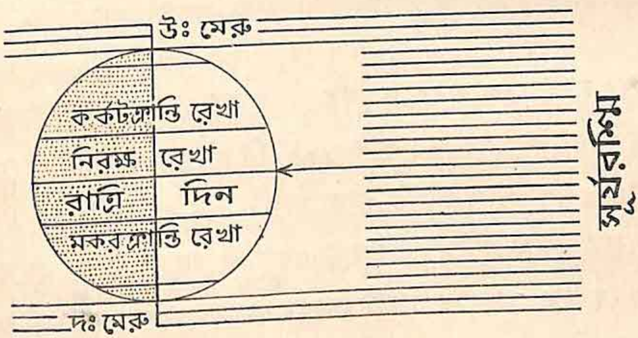
চিত্র ৬১

কল্পনা করা হয়েছে, এর নাম **মকরক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Capricorn)। ২১শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণে শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, কাজেই সেদিন দক্ষিণ গোলার্ধের দিনটি সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট। কিন্তু উত্তর

গোলার্ধে তখন ঠিক তার বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ সেখানে এই দিনটি সবচেয়ে ছোট আর রাত্রি সবচেয়ে বড়।

এরপর থেকে মনে হয় সূর্য আবার ক্রমশ যেন উত্তরদিকে সরে সরে উদিত হচ্ছে। এভাবে সরতে সরতে ২১শে মার্চ সূর্য ঠিক নিরক্ষবৃত্তের উপর এসে উপস্থিত হয়। তখন উভয় গোলার্ধেই দিন-রাত্রি সমান হয়। এরপর সূর্য ক্রমশ আরও উত্তরে সরে যেতে থাকে এবং ২১শে জুন তারিখে সে তার উত্তরদিকে শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। তখন দর্শক নিরক্ষবৃত্তের ২৩½° ডিগ্রী উত্তর দিয়ে সূর্যকে সঞ্চরণ করতে দেখবে। নিরক্ষবৃত্তের ২৩½° উত্তরে অবস্থিত এই কাল্পনিক বৃত্তের নাম **কর্কটক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Cancer)। উত্তর গোলার্ধে ঐ দিনটি সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন ঠিক বিপরীত অবস্থা। এরপর থেকে সূর্য আবার দক্ষিণদিকে সরে যাচ্ছে ব'লে মনে হয় এবং শেষে ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য আবার নিরক্ষবৃত্তের উপর এসে উপস্থিত হয়। সেই তারিখে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র দিন-রাত্রি আবার সমান হয়। এরপর আরও দক্ষিণে সরে সূর্য আর এক বছরের ২১শে ডিসেম্বর পুনরায় মকরক্রান্তিতে উপস্থিত হয়। এভাবে প্রতিবছরই পূর্বোক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকে।

(২) **দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার কারণ**—পৃথিবী যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাটুর মতো পাক খেত তাহ'লে প্রতিদিন একই



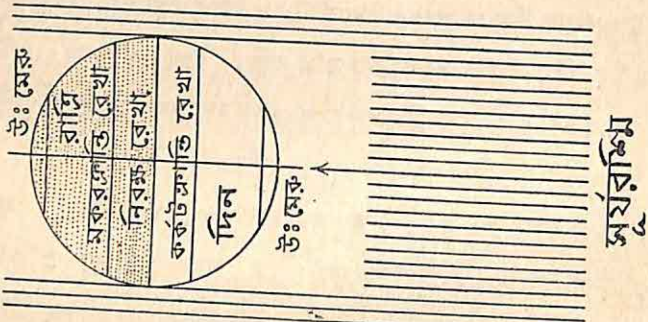
চিত্র ৬২

জায়গায় সূর্যোদয় হ'ত। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর পাক খেতে খেতে

আবার নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তা ছাড়া পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে ২৩½° কোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে। এজন্য সূর্যকে এভাবে সরে সরে উদিত হ'তে দেখা যায়।

সূর্য-পরিক্রমণকালে পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষতলের উপর লম্বভাবে থাকলে, অর্থাৎ পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত কক্ষতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকলে পৃথিবীর যে-কোন অবস্থানেই সূর্যকিরণ প্রতিদিনই নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ত। তাহ'লে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র দিবা-রাত্রির পরিমাণ চিরকাল সমান থেকে যেত।

আবার পৃথিবীর অক্ষরেখা যদি সূর্যাভিমুখী হ'য়ে কক্ষতলের সমান্তরালভাবে থাকত, অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্ত এই সমতলের উপর লম্বভাবে থাকত, তাহ'লে পৃথিবীর অর্ধাংশে নিরবচ্ছিন্ন দিন এবং অপরাংশে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি বিরাজ করত। আর আমাদের কাছে দিবা-রাত্রি এবং শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি

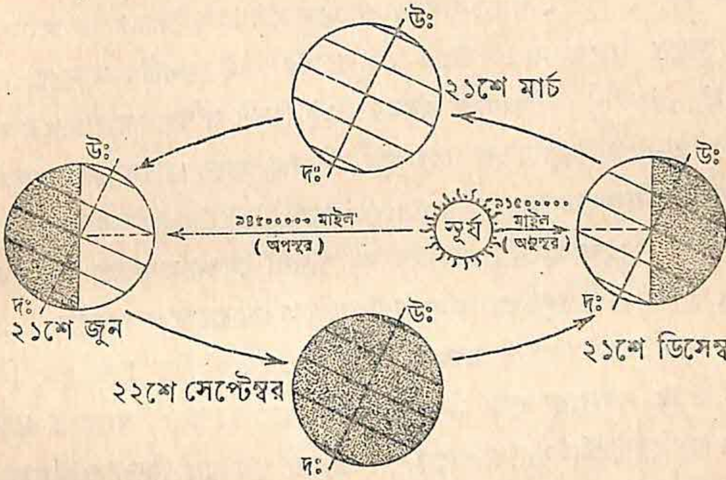


চিত্র ৬৩

ঋতু-বৈচিত্র্য সবই অজ্ঞাত থেকে যেত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর অক্ষরেখা ধ্রুব নক্ষত্রাভিমুখী হ'য়ে কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬½° ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে, তাই সূর্যের এরূপ আপাতগতি দেখা যায়। টেবিলের উপরে একটি বাতি এবং ভূগোলক রেখে পরীক্ষা করলেই একথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। নীচে সূর্য-পরিক্রমণপথে পৃথিবীর চারটি বিশেষ অবস্থান দেখানো হয়েছে এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) ২১শে মার্চ তারিখে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে

সমান দূরে থাকে। এই অবস্থায় নিরক্ষরেখার উপরে ঠিক দুপুরবেলায় সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে এবং ঐ দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয় (১২ ঘণ্টা)। এসময় খ-গোলকে (Celestial-sphere) সূর্য যে বিন্দুতে অবস্থান করে, তার নাম **বাসন্ত বিষুব** (Vernal equinox)।



চিত্র ৬৪

ঐ তারিখের পর থেকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে সূর্য প্রতিদিনই একটু ক'রে উত্তর-দিকে সরে যেতে থাকে, এরই নাম উত্তরায়ণ। সূর্য-পরিক্রমার এই অবস্থায় পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য একটু একটু ক'রে বাড়ে, এবং রাত্রির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ২১শে জুন তারিখের অবস্থানে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে, অর্থাৎ সূর্য তখন উত্তরায়ণের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছায়। ঐ তারিখে উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হবে। আবার দক্ষিণ গোলার্ধ তখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে সরে গেছে, তাই সেখানে দিন সবচেয়ে ছোট এবং রাত্রি সবচেয়ে বড়।

ঐ দিন মধ্যাহ্নে ২৩½ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকবে, সেজন্য এই অক্ষাংশকে **কর্কটক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Cancer)

বলা হয়। এসময় খ-গোলকে সূর্য যে বিন্দুতে অবস্থিত থাকে তার নাম **দক্ষিণায়নাদি** (Summer solstice)।

আর একটা কথা এই যে, ৬৬½ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের উত্তরভাগে অবস্থিত ভূ-পৃষ্ঠের উপর তখন ২৪ ঘণ্টা ধরেই অবিচ্ছিন্নভাবে সূর্যকিরণ পড়তে থাকে, অর্থাৎ রাতের আঁধার এসে সেখানে দিনের আলো কখনও ম্লান করতে পারে না। উত্তর গোলার্ধের এই বৃত্তটির নাম **সুমেরুবৃত্ত** (Arctic circle)। আবার এসময় ৬৬½ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণ-ভাগের ভূ-পৃষ্ঠে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার বিরাজ করে। দক্ষিণ গোলার্ধের এই বৃত্তটির নাম **কুমেরুবৃত্ত** (Antarctic circle)।

(খ) ২১শে জুনের পর থেকে পৃথিবী যেমন কক্ষপথে এগিয়ে যায় তেমনি সূর্যও আপাতদৃষ্টিতে ক্রমশ দক্ষিণদিকে সরে যেতে থাকে। এভাবে শেষে ২২শে সেপ্টেম্বর সূর্য আবার ঠিক পুবদিকে উদিত হয় এবং নিরক্ষ-রেখার উপর মধ্যাহ্নে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। আর ঐ তারিখে দিবা ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান থাকে। এসময় সূর্য যে বিন্দুতে থাকে তার নাম **শারদ বিষুব** (Autumnal equinox)।

চিত্র দেখে সহজেই বোঝা যাবে যে, ২১শে মার্চ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছ'মাস ধরে উত্তর-মেরুতে নিরবচ্ছিন্ন দিন চলতে থাকে, আর ঐ ছ'মাস ধরে দক্ষিণ-মেরুতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে।

(গ) ২২শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধ ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে সূর্য আরও দক্ষিণে সরে যেতে থাকে এবং ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য তার দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। ঐ তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট এবং রাত্রি সবচেয়ে বড়, আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের উপর ঐ দিন মধ্যাহ্নে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে তাই এর নাম **মকরক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Capricorn)। এসময় সূর্য যে বিন্দুতে থাকে তার নাম **উত্তরায়ণাদি** (Winter solstice)। ঐ তারিখে ৬৬½ ডিগ্রী দক্ষিণ

অক্ষাংশের দক্ষিণভাগের ভূ-পৃষ্ঠে সর্বদাই সূর্যকিরণ পড়ে, কাজেই পৃথিবীর কুমেরুবৃত্তের মধ্যে অবস্থিত সকল স্থানে তখন নিরবচ্ছিন্ন দিন চলতে থাকবে।

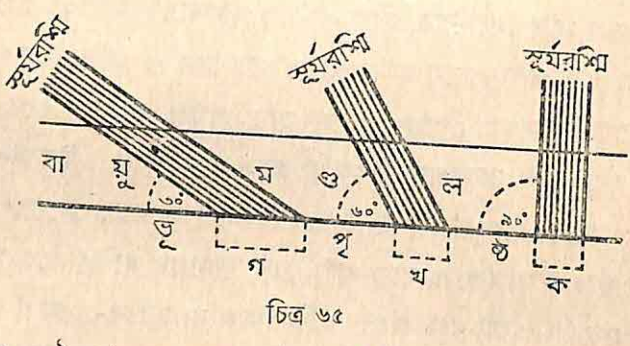
(ঘ) ২১শে ডিসেম্বরের পর থেকে উত্তর গোলার্ধ আবার ক্রমশ সূর্যের কাছে আসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ দূরে যায়। এজন্য উত্তর গোলার্ধে তখন দিবাভাগের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এভাবে শেষে ২১শে মার্চ তারিখে আবার পৃথিবীর সর্বত্র দিবা-রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। এর ফলে ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত ছ'মাস ধরে উত্তর-মেরুতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি এবং দক্ষিণ-মেরুতে নিরবচ্ছিন্ন দিন থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, কক্ষপথে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর অক্ষরেখাটি সর্বদাই কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬½ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে থাকে ব'লে এরূপ দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব হয়েছে। উত্তর গোলার্ধে যখন দিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন ঠিক বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ সেখানে তখন দিনের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। পৃথিবীর ঠিক নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত যে-কোনস্থানে দিবা-রাত্রির পরিমাপ সর্বদাই সমান থাকে, কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ৬৬½ ডিগ্রী উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বৎসরের মান দু'টি দিন, অর্থাৎ ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর, দিবা-রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। আর উত্তর বা দক্ষিণ-মেরুতে পর্যায়ক্রমে ছ'মাসকাল ধরে দিন ও রাত্রি চলতে থাকে।

২১শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত ছ'মাস ধরে আমাদের মনে হয় সূর্য যেন ক্রমাগত উত্তরদিকে সরে যাচ্ছে। উত্তরদিকে সূর্যের গতির নাম সূর্যের **উত্তরায়ণ** বা উত্তর-গমন। আবার, ২১শে জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছ'মাসকাল ধরে সূর্য যেন ক্রমাগত দক্ষিণদিকে সরে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। এরই নাম সূর্যের **দক্ষিণায়ন** বা দক্ষিণ-গমন।

পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে আসে। এ সময়কে বলা হয় **সৌরবৎসর**, আর পৃথিবীর এই গতির নাম **বার্ষিক গতি**। সৌরবৎসর প্রকৃতপক্ষে ৩৬৫ দিনের চেয়ে একটু বেশি তাই ইংরাজী মতে ৪ বৎসর অন্তর একটা দিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনা করা হয়,

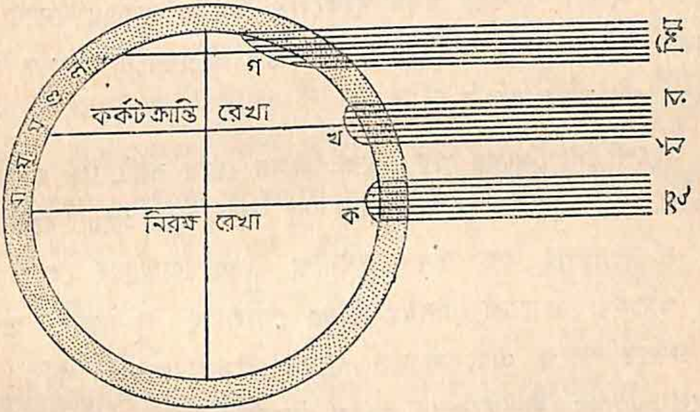
এই বৎসরটাকে **অধিবর্ষ** (Leap-year) বলা হয়। ইংরাজী বৎসরের হিসেবে সেই বছর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিন না ধরে ২৯ দিন ধরা হয়। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতি থাকায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সূর্য যেন সারা বছর ধরে আকাশে একটি পথ পরিক্রমণ করছে। এই কাল্পনিক পথের নাম ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic)। এই পথে চলবার সময় বছরের কোন সময় সূর্য কোথায় থাকে তা স্থির করা দরকার। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌রা লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে এই পথে মেষ, বৃষ ইত্যাদি বারোটি প্রধান নক্ষত্রমণ্ডল আছে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী সেগুলি এক একটি রাশি (চিত্র ৬৫ দ্রষ্টব্য)। সূর্য যখন এক রাশি ছেড়ে পরবর্তী রাশিতে যায়, তাকে **সংক্রান্তি** বলে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী এক সংক্রান্তি থেকে অপর সংক্রান্তি পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান একটি **সৌরমাস**। এই হিসেবে সূর্য যেদিন মেষরাশিতে প্রবেশ করে সেদিন ১লা বৈশাখ, আর সেদিন থেকেই বাংলা বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। সূর্য একমাস করে একটি রাশিতে থেকে তারপর পরবর্তী রাশিতে প্রবেশ করে। প্রত্যেক রাশিতে সূর্যের স্থিতিকাল এক সমান হয় না, তাই বাংলা মাস ৩০ দিন, ২৯ দিন, ৩১ দিন বা ৩২ দিন হয়। ইংরাজী মাস প্রত্যেকটির দিনসংখ্যা কিন্তু একেবারে স্থির করা আছে।



চিত্র ৬৫

(৩) **সৌরতাপের হ্রাস-বৃদ্ধি**—পৃথিবীর কোনস্থানের উপর সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়লে সূর্যরশ্মিকে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাবার আগে অপেক্ষাকৃত কম বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসতে হয়। এর ফলে সেস্থানের উপরস্থ বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত কম তাপ শোষণ করবে, তাই তখন ভূ-পৃষ্ঠ বেশি উত্তপ্ত হবে।

আবার দেখা যায় যে, সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়লে প্রতি বর্গক্ষেত্র পরিমিত স্থানের উপর উত্তাপের তীব্রতা বেশি হয়। লম্বভাবে পড়লে নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যকিরণ যতটা জায়গায় পড়বে, হেলানোভাবে পড়লে সেই পরিমাণ সূর্যকিরণ আরও বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই আগের তুলনায় পরের জায়গায় কম উত্তাপ অনুভূত হবে। সাধারণভাবে



চিত্র ৬৬

প্রতিদিনই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারি। কারণ সকালে সূর্যকিরণ হেলানোভাবে পড়ে তাই তখন উত্তাপ কম থাকে, কিন্তু ত্বপুরবেলা সূর্যকিরণ প্রায় লম্বভাবে পড়ে তাই তখন উত্তাপের তীব্রতা বেশি হয়।

(৪) **ঋতু-চক্র**—২১শে মার্চ তারিখের পর থেকে পৃথিবীর উত্তর-মেরু ক্রমশ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধের দিবাভাগ ক্রমশ বড় হ'তে থাকে। তাই দিনের বেলা ভূ-পৃষ্ঠ যতটা তাপ শোষণ করে, রাত্রিবেলা তার সবটা বিকিরণ ক'রে আবার ঠাণ্ডা হ'তে পারে না, কিছুটা তাপ অবশিষ্ট থেকে যায়। এ ছাড়া তখন পৃথিবীর এই অংশে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়তে থাকে। এই ত্ব'টো কারণে ২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন তারিখ পর্যন্ত রোজই উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা একটু ক'রে বাড়তে থাকে। এসময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১লা জুলাই তারিখ উত্তর গোলার্ধে যদিও গ্রীষ্মের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি কিন্তু তখনই পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে (চিত্র ৬৪ দ্রষ্টব্য)।

২১শে জুনের পর থেকে দিন ক্রমশ ছোট হ'তে আরম্ভ করে কিন্তু ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত রোজই দিবাভাগের দৈর্ঘ্য রাত্রির চেয়ে বড় থেকে যায়। এসময় গরম থাকলেও দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্যের মধ্যে ব্যবধানটা ক্রমশ কমে যায় ব'লে উত্তাপটা তত তীব্রভাবে অনুভূত হয় না। এসময়কে **শরৎকাল** বলা হয়।

২২শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে দিনের চেয়ে রাত্রি বড় হ'তে থাকে এবং এসময় পৃথিবীর উত্তর-মেরু ক্রমশ সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। সূর্যের দক্ষিণায়নের জন্য তখন সূর্যরশ্মি উত্তর গোলার্ধে হেলানোভাবে পড়তে থাকে। কাজেই এসময় উত্তর গোলার্ধে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে এবং আমরা শীতের তীব্রতা অনুভব করি। উত্তর গোলার্ধে এসময় **শীতকাল**। ৩১শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে শীতের তীব্রতা খুব বেশি কিন্তু তখনই পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে (চিত্র ৬৪ দ্রষ্টব্য)।

২১শে ডিসেম্বরের পর থেকে দিন আবার বড় হ'তে থাকে এবং ২১শে মার্চ পুনরায় দিন ও রাত্রি সমান হ'য়ে যায়। এসময় দিনের চেয়ে রাত্রি বড় থাকে ঠিক কিন্তু এই প্রভেদটা ক্রমশ কমে যায় ব'লে শীতের তীব্রতাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এসময়কে **বসন্তকাল** বলা হয়।

বলা বাহুল্য, উত্তর গোলার্ধের মতো দক্ষিণ গোলার্ধেও পর্যায়ক্রমে এসব ঋতুগুলির আবির্ভাব হয়। তবে উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল, আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।

পৃথিবীতে প্রধান ঋতু দু'টি—গ্রীষ্ম ও শীত। গ্রীষ্ম থেকে শীতে পরিবর্তন হওয়ার মাঝে দেখা দেয় শরৎকাল, আবার শীত থেকে গ্রীষ্মে

পরিবর্তন হওয়ার মাঝে দেখা দেয় বসন্তকাল। ভারতে এ ছাড়া আরও দু'টি ঋতুর আবির্ভাব হয়—**একটি বর্ষা অন্যটি হেমন্ত।**

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে এসময়ে ভারতে গ্রীষ্মের প্রখরতা কিছুটা কমে যায়। কাজেই ভারতে বর্ষাকাল একটি পৃথক্ ঋতু ব'লে গণ্য হয়। আবার কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয় ব'লে সে-সময় ভারতের জলবায়ু শুষ্ক হ'য়ে পড়ে, তাই তখন থেকেই একটু একটু শীতের আমেজ বোঝা যায়। একেই হেমন্তকাল বলা হয়। এজন্য ভারতে মোট ছ'টি ঋতু দেখা দেয়—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দু'মাস গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ ও মাঘ শীতকাল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র এই দু'মাস বসন্তকাল।



চিত্র ৬৭

(৫) **বিভিন্ন তাপমণ্ডল**—আমরা জানি, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্যকিরণ হেলে পড়ে তাই মধ্যাহ্নের তুলনায় উষ্ণতা অনেক কম হয়। তেমনি এই পৃথিবীর নিরক্ষরেখার উপর সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে ব'লে সেখানে উষ্ণতা খুব বেশি এবং মেরু-অঞ্চলে সূর্যকিরণ হেলানোভাবে পড়ে ব'লে সেখানে উষ্ণতা খুব কম হয়। এদের মাঝামাঝি অঞ্চলে উষ্ণতা খুব বেশিও নয় আবার খুব কমও নয়।

কর্কটক্রান্তি হ'ল সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ সীমা আর মকরক্রান্তি হ'ল দক্ষিণায়নের শেষ সীমা। সূর্য বছরের সব সময়েই এই দু'টি ক্রান্তিরেখার মধ্যে থাকে। নিরক্ষরেখা থেকে সূর্যের অবনতি কখনও ২৩½ ডিগ্রীর বেশি দেখা যায় না, আবার কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সূর্যের অবনতি কখনও ৪৭ ডিগ্রীর বেশি হ'তে দেখা যায় না। কাজেই এই দু'টি

ক্রান্তিরেখার মাঝে ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশ আছে তা সব সময়েই অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। এই অংশের নাম **উষ্ণমণ্ডল**।

উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরবৃত্ত পর্যন্ত যে অংশ আছে সেখানে বছরের সকল সময়েই সূর্যকে দিগন্তরেখার উপরে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু কখনও মাথার উপরে উঠতে দেখা যায় না। তা ছাড়া এই অংশে দিন ও রাত্রির পরিমাণ কখনও ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশি হয় না, সেজন্য এই অংশে সূর্যের উত্তাপ খুব কমও নয় আবার খুব বেশিও নয়। এই অংশকে **নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল** বলা হয়।

৬৬½ ডিগ্রী অক্ষাংশ থেকে সুমেরু পর্যন্ত যে অংশটি আছে সেখানে সূর্যকে সব সময়েই খ-মধ্য থেকে ৪৭ ডিগ্রীরও নীচে দেখা যায় এবং মেরু থেকে সূর্যকে কখনও দিগন্তরেখার ২৩½ ডিগ্রীর উপরে দেখা যায় না। এসব কারণে এই অঞ্চলে উষ্ণতা অত্যন্ত কম, তাই এখানে সব সময়েই অল্প-বিস্তর তুষার জমে থাকে, এই অংশকে **হিমমণ্ডল** বলা হয়।

অনুরূপভাবে দক্ষিণ গোলার্ধেও একটি নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং একটি হিমমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। উত্তাপের তারতম্য অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠকে মোট পাঁচটি তাপমণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। সুমেরুবৃত্ত, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি এবং কুমেরুবৃত্ত দিয়ে এই তাপমণ্ডলগুলোর সীমা নির্দেশ করা হয়েছে।

চাঁদের কথা

পূর্ণিমার রাতে পুব আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, তখন তার সুন্দর রূপ দেখে কার না ভালো লাগে! চাঁদের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে বিভিন্ন দেশের কবিরা আজ পর্যন্ত যে কত কবিতা লিখেছেন তার হিসেব কে জানে! মায়ের কোলে খোকা যখন কাঁদে, তখন চাঁদ দেখিয়ে মা তার কান্না থামান, ডেকে বলেন,—আয় চাঁদ আয়, খোকার কপালে এসে 'টী' দিয়ে যা। চাঁদকে দেখে একমুহূর্তেই খোকার কান্না যায় থেমে, সে তখন হাত বাড়িয়ে চাঁদকে ধরতে চায়।

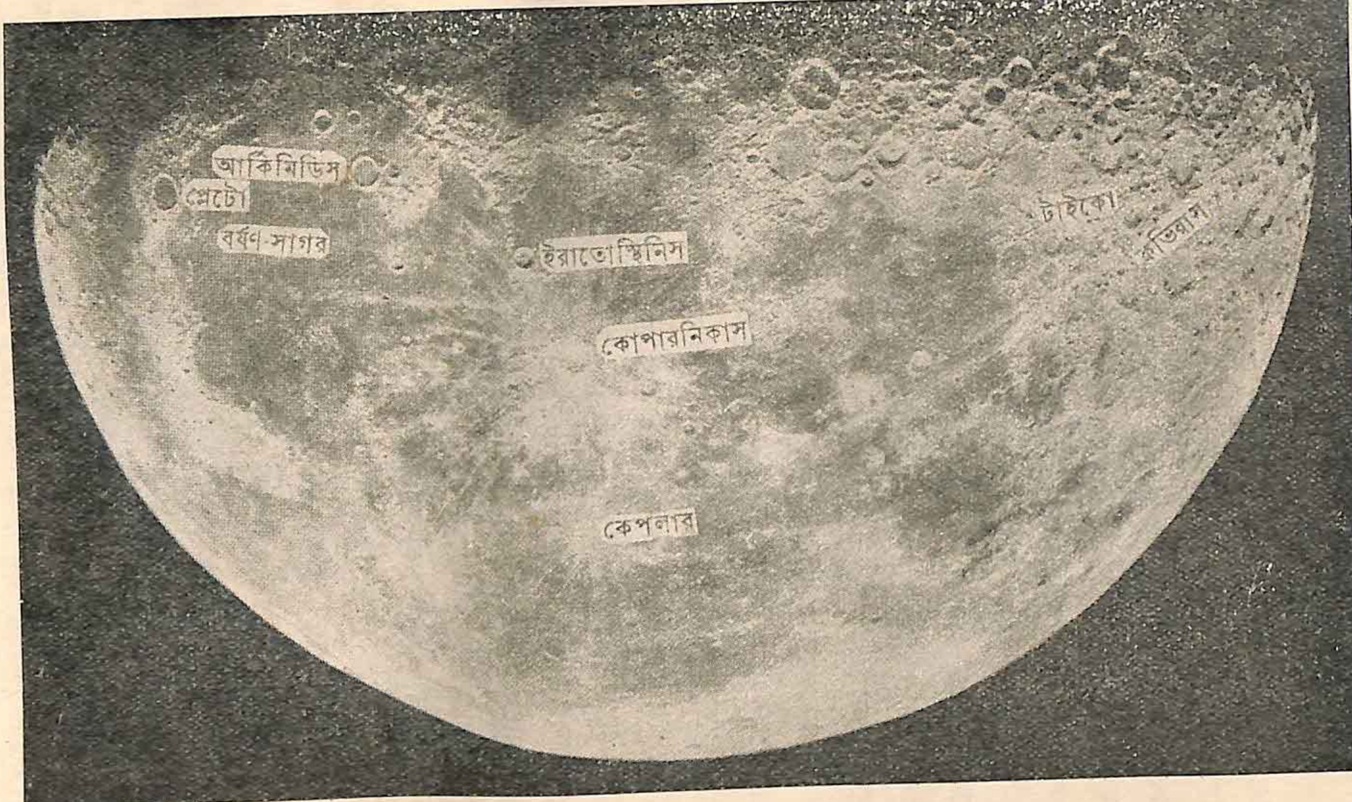

শান্তি-সাগর
অমৃত-সাগর
স্নিগ্ধ-সাগর
প্লেটো
আর্কিমিডিস
বর্ষণ-সাগর
ইরাতোস্থিনিস
টাইকো
কোপারনিকাস
কেপলার

কিন্তু হাত বাড়ালেই কি চাঁদকে ধরা যাবে? চাঁদ রয়েছে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—২,৩৯,০০০ মাইল দূরে। অবশ্য সূর্যের তুলনায় চাঁদ রয়েছে যেন আমাদের ঘরের কাছে। বাস্তবিক মহাশূন্যে চাঁদই হ'ল পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। যে এরোপ্লেনে চড়ে সূর্যে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ বছর, তাতে ক'রে চাঁদে পৌঁছাতে লাগবে মাত্র তেত্রিশ দিন চার ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট (চিত্র ৩৯ দ্রষ্টব্য)।

চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। তাহ'লে আমরা জোৎস্নার আলো পাই কোথা থেকে? সূর্য একটা বিশাল দীপের মতো জ্বলছে ব'লে তা থেকে সব সময় জোরালো আলো বেরুচ্ছে। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে লেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তার যেটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাকেই আমরা চাঁদের জ্যোৎস্না বলি। কিন্তু চন্দ্র-পৃষ্ঠে যতটুকু সূর্যালোক পড়ে, তার শতকরা সাতভাগ মাত্র চাঁদ এভাবে ফিরিয়ে দিতে পারে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মিহি বালি বা ধূলিকণার স্তর থেকে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়, কাজেই মনে হয়, চাঁদের সমতল অংশ অপেক্ষাকৃত বড় বড় পাথরের নুড়ি দিয়ে ছাওয়া।

চাঁদের ব্যাস ২১৬০ মাইল। চাঁদের আয়তন পৃথিবীর প্রায় $\frac{১}{৫০}$ অংশ এবং ওজন পৃথিবীর $\frac{১}{৮১}$ অংশ মাত্র। সূর্যের তুলনায় চাঁদ খুবই ছোট, কিন্তু ছোট হ'লেও এ পৃথিবীর খুব কাছে আছে ব'লে আপাতদৃষ্টিতে একে প্রায় সূর্যের মতোই বড় মনে হয়। চাঁদ খুব ছোট ব'লে তার আকর্ষণ-শক্তিও অনেক কম; পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির ছয়ভাগের একভাগ মাত্র। এজন্য চাঁদে গেলে সব-কিছুর ওজনই ছ'ভাগের একভাগ ব'লে মনে হবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে যা খুব ভারি, চাঁদে গিয়ে তাও অত্যন্ত হালকা ব'লে মনে হবে।

চাঁদের ওজন এত কম যে তার পক্ষে কোন আবহমণ্ডল ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। চাঁদে জল নেই, কাজেই মেঘও নেই। চাঁদে যে আবহমণ্ডল নেই তা বোঝা গেল কি ক'রে? আকাশে চলতে চলতে চাঁদ যখন কোন তারার সামনে আসে তখন তারাটি অদৃশ্য হ'য়ে যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,



চিত্র ৬৯। অষ্টমীর চাঁদ

তারাটি চন্দ্র-পৃষ্ঠের ধার পর্যন্ত এলেও তার ঔজ্জ্বল্য একটুও কমে না, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই তারাটি অদৃশ্য হ'য়ে যায়। চাঁদে আবহমণ্ডল থাকলে তারাটি ক্রমশ ম্লান হ'য়ে আসত এবং তারপর একেবারে অদৃশ্য হ'ত। আবহমণ্ডল না থাকায় চাঁদে কোন জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বায়ুই শব্দের বাহক, কাজেই ওখানে কোন শব্দও শোনা সম্ভবপর নয়।

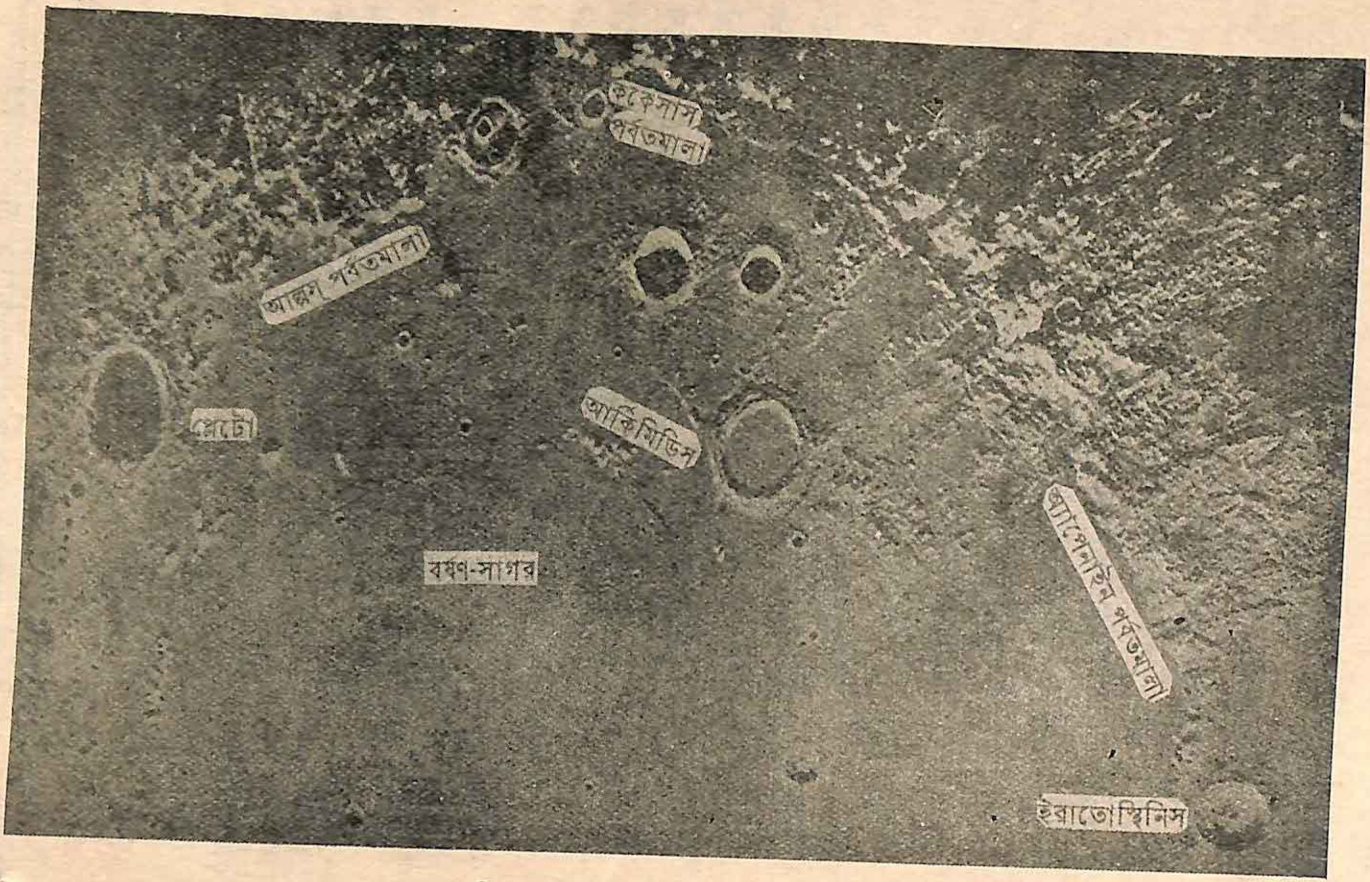
খালি চোখেই চাঁদের গায়ে অনেক কালো কালো দাগ দেখা যায়। এই দেখে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কল্পনা করেছিলেন যে চরকা-বুড়ি একটা গাছের তলায় বসে সুতো কাটছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সকল দেশেই চাঁদের এসব দাগ সম্বন্ধে নানারূপ কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে গ্যালিলিও সর্বপ্রথম তাঁর নিজহাতে তৈরি ছোট্ট দূরবীণ দিয়ে চাঁদকে দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। মর্ত্যবাসী তার কাছ থেকেই প্রথম শুনলো যে চাঁদের গা-টা মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু অনেক বড় বড় পাহাড়-পর্বত আর গর্তে ভর্তি। পাহাড়-পর্বতের মাঝে যেসব বড় বড় গর্ত আছে তাতে সূর্যের আলো যেতে পারে না ব'লে ঐ রকম কালো দেখায়। এরই নাম **চাঁদের কলঙ্ক**। এইভাবে চাঁদের যথার্থ রূপ যখন প্রথম উদ্ঘাটিত হ'ল তখন তা মানুষের মনে কম বিস্ময় জাগায়নি।

চাঁদ আমাদের কাছে রয়েছে ব'লে বিজ্ঞানীদের পক্ষে চন্দ্র-পৃষ্ঠের অনেক বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখলে চন্দ্র-পৃষ্ঠে বিশাল পর্বতশ্রেণী, গভীর উপত্যকা, বিরাট গহ্বর প্রভৃতি সব স্পষ্ট বোঝা যায়। চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ২৫,০০০ ফুট (পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এভারেস্টের উচ্চতা প্রায় ২৯,০০০ ফুট)। আর সবচেয়ে গভীর যে গর্ত তার গভীরতা প্রায় ২৪,০০০ ফুট (পৃথিবীর সমুদ্র যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানকার গভীরতা প্রায় ৩৫,০০০ ফুট)। এসব ছাড়াও চাঁদের মাঝে কতকগুলি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কালো দাগ দেখা যায়। গ্যালিলিও এগুলিকেই সাগর ব'লে ভুল করেছিলেন এবং এদের সেরকম সব নাম দিয়েছিলেন, যেমন—Mare nectaris

(অমৃত-সাগর), Mare tranquilitatis (শান্তি-সাগর), Mare serenitatis (স্নিগ্ধ-সাগর), Mare imbrium (বর্ষণ-সাগর) ইত্যাদি। ল্যাটিন Mare শব্দের অর্থ হ'ল সাগর।

গ্যালিলিওর দূরবীণের শক্তি ছিল নিতান্ত পরিমিত। এর সাহায্যে চাঁদের বাস্তব রূপ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিল ঠিক কিন্তু তা' ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এখন দূরবীণের সেই দুর্দিন আর নেই। প্রায় ১০০ মাইল দূরে থাকলে যেমন দেখাত, প্যালোমার মানমন্দিরের দূরবীণ দিয়ে চাঁদকে প্রায় ততটা স্পষ্ট দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কলকাতা শহরের সবচেয়ে বড় যে বাড়ি সেরকম একটা বাড়ি যদি চাঁদে থাকত তাহ'লে তাকেও আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম এই দূরবীণের সাহায্যে। দূরবীণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল এসব সাগরের কোনটিতে একফোঁটা জল নেই, এগুলি সবই নিম্ন-সমতলভূমি মাত্র। অতীতে কোন এক সময়ে হয়তো এদের ভিতর দিয়ে কালো গলিত ধাতু-স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তাই এখন চন্দ্র-পৃষ্ঠের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমে কঠিন হ'য়ে রয়েছে। পৃথিবী থেকে এগুলিকে কালো দাগের মতো দেখায়, আর চাঁদের কলঙ্ক বলতে প্রধানত এদেরই বোঝায়। এগুলি যদি সাগর হ'ত তবে কোন-না-কোন সময় এদের মাঝে সূর্যের প্রতিবিম্ব নিশ্চয়ই দেখা যেত।

শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্য নিয়ে চাঁদের দিকে তাকালে সব আগে নজরে পড়ে চাঁদের গায়ে অবস্থিত অসংখ্য গহ্বরগুলি। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছিলেন Crater বা আগ্নেয়গিরির মুখ। এসব গর্তের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, গর্তের মাঝখানটা প্রায় বাটির মতো আর তার চারদিক পাহাড়ের উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় গর্তের মাঝে আবার দু'একটি ছোট গর্তও দেখা যায়, মনে হয় ছোট গর্তগুলির সৃষ্টি হয়েছে পরে। কোন কোন অংশে উপর্যুপরি এত বেশি গর্ত অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে সেসব অংশ বসন্তরোগীর মুখের মতো ক্ষতবিক্ষত মনে হয়। আজ পর্যন্ত চাঁদের গায়ে ঐ রকম দু'লক্ষের চেয়েও বেশি গহ্বরের সন্ধান



চিত্র ৭০। মারে ইমব্রিয়াম বা বর্ষণ-সাগর

বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, এদের সবার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয়ও নেওয়া হ'য়ে গেছে। চাঁদের গর্তগুলি সব অতীতের অসংখ্য আগ্নেয়গিরির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যেসব গলিত পদার্থ উপরদিকে ছিট্‌কে উঠেছিল, তাই ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বেঁধে চক্রাকার পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে, সেজন্য গর্তগুলির এমন চেহারা। এদের চেহারা মোটামুটি একরকম হ'লেও এদের আয়তন এবং তলদেশের গভীরতায় বেশ পার্থক্য দেখা যায়। অন্তত ১৫০টি গহ্বরের মুখ বেশ বড়, তাদের ব্যাস-রেখার বিস্তৃতি ৫০ মাইলেরও বেশি। পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্ ও বিজ্ঞানীদের নামানুসারে এদের এক একটি নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন—ক্লভিয়াস্, টাইকো, কোপারনিকাস্, কেপ্‌লার ইত্যাদি। এদের মধ্যে ক্লভিয়াস্ নামক গহ্বরটিই সবচেয়ে বড়, এর ব্যাস প্রায় ১৪৬ মাইল এবং তলদেশের গভীরতা প্রায় তিন মাইল। এ ছাড়া বর্ষণ-সাগরের পাশে তিনটি বিশাল পর্বতমালা খুব সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমটির নাম অ্যাপেনাইন, দ্বিতীয়টির নাম ককেসাস এবং তৃতীয়টির নাম আল্প্‌স পর্বতমালা। সমতল ক্ষেত্র থেকে এদের উচ্চতা প্রায় ১৮০০০ ফুট।

চন্দ্র-পৃষ্ঠের বিস্ময়কর দৃশ্যসমূহের মধ্যে মারে ইম্‌ব্রিয়াম বা বর্ষণ-সাগরই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলের আগে। এর সীমারেখা প্রায় গোলাকার, আর এই বৃত্তের ব্যাস প্রায় ৭০০ মাইল। অনেকের ধারণা, সুদূর অতীতে মহাশূন্যের কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশ থেকে হয়তো একটা বিরাট উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে চন্দ্র-পৃষ্ঠে আঘাত ক'রে এর সৃষ্টি করেছিল। কারো কারো মতে এটা ছিল একটা গ্রহকণিকা (Asteroid), এবং তার ব্যাস ছিল অন্ততপক্ষে ১২০ মাইল।

চাঁদে বায়ু নেই, সুতরাং উপরোক্ত উল্কাপিণ্ড বা গ্রহকণিকার পতন-কালে বায়ুর ঘর্ষণে আগুন জ্বলতে পারেনি, কাজেই তখন তার কোন ক্ষয়ও হয়নি। আর বায়ুই শব্দের বাহক, কাজেই এই ভয়ংকর সংঘর্ষ হওয়া সত্ত্বেও কোন শব্দ হয়নি। কিন্তু এর ফল হ'ল অতি ভয়াবহ। মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে যেন প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। এই ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলে চাঁদের

একটা বিরাট অংশ চাঁদের উর্ধ্বপ্রদেশে বহুদূর পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হ'ল। চাঁদের আকর্ষণ-শক্তি এত কম যে তার পক্ষে আর এসব পদার্থ ধরে রাখা সম্ভব হ'ল না, তাই তার প্রায় সবটাই চিরদিনের মতো চন্দ্র-পৃষ্ঠ ত্যাগ ক'রে মহাশূন্যে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। উৎক্ষিপ্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলাখণ্ড বা ধাতব পদার্থের কিছু অংশ বিস্ফোরণ-স্থলের চারদিকে সঞ্চিত হ'য়ে অ্যাপেনাইন, ককেসাস প্রভৃতি পর্বতমালার সৃষ্টি করল। কতগুলি শিলাখণ্ড বিস্ফোরণ-স্থলের চারদিকে প্রচণ্ড গতিতে চলবার সময় মাটি-পাহাড়-পর্বত খুঁড়ে সৃষ্টি করল অসংখ্য উপত্যকা। আর বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপে চারদিক থেকে গলিত ধাতুর ধারা নেমে এল এই বিশাল গহ্বরের মধ্যে। ক্রমে তাই জমাট বেঁধে সৃষ্টি করল মারে ইম্‌ব্রিয়াম বা বর্ষণ-সাগর। চাঁদে যে শুধু একটিমাত্র বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা নয়। এরূপ উল্কাপাতের ঘটনা আরও ঘটেছিল, আর তাদের আঘাতে চাঁদের গা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গিয়েছিল। সে থেকেই চাঁদের গায়ে অসংখ্য সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে, তাই চাঁদের এমন চেহারা।

অবিশ্বাসী কেউ কেউ হয়তো বলবেন, উল্কার আঘাতে পৃথিবীতে বড় বড় অনেক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এর তো কোন প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে উল্কাপাতের ঘটনা বিরল নয় ঠিক, কিন্তু তার ফলে পৃথিবীর তো বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না। এর কারণ কি? বিজ্ঞানীরা এর দু'টি কারণ বের করেছেন। পৃথিবীতে পৌঁছাবার সময় উল্কাপিণ্ডকে কয়েক শ' মাইল বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসতে হয়। সেসময় বায়ুর ঘর্ষণে তার প্রায় সবটাই জ্বলে পুড়ে শেষ হ'য়ে যায়। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠে বড় রকমের গর্ত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর একটা কথা, পৃথিবীতে জল এবং বায়ু থাকায় তাদের ক্রিয়ায় সব সময়ই ভূ-ত্বকের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই উল্কার আঘাতে পৃথিবীতে দৈবাৎ ছোটখাটো কোন গর্ত সৃষ্টি হ'লেও জলবায়ুর ক্ষয়কারী ক্রিয়ায় তা অল্প সময়ের মধ্যেই ধুয়ে মুছে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উল্কা যদি খুব বড় হয় এবং সেই উল্কাপাতের ঘটনা যদি বেশিদিনের না হ'য়ে থাকে তবে তার চিহ্ন নিশ্চয়ই থাকবে। বাস্তবিক উল্কাপাতের

ফলেই যে অ্যারিজোনা অঞ্চলে এরূপ একটি বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এই গর্তটির ব্যাস প্রায় এক মাইল এবং গভীরতা প্রায় ৫০০ ফুট। গর্তটির চারপাশে উল্কার ছোটখাটো টুকরো অনেক পাওয়া গেছে কিন্তু সেরকম বড় টুকরো একটিও পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বায়ুর ঘর্ষণে ক্ষয় পাওয়া সত্ত্বেও উল্কার একটি বিরাট অংশ প্রচণ্ড গতিতে এসে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে পৌঁচেছিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উল্কাটির গতি গেল রুদ্ধ হ'য়ে, কিন্তু তাতে তার শক্তি নষ্ট হ'ল না। তাই প্রচণ্ড তাপে রূপান্তরিত হ'য়ে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটালো এবং তারই প্রভাবে উল্কাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল, সেখানে রেখে গেল একটা বিরাট ধ্বংসের চিহ্ন। একটা ছোটখাটো বোমার বিস্ফোরণের ফলে কিরূপ বিরাট ধ্বংসকার্য ঘটানো যেতে পারে তা আমরা জানি, কাজেই এরূপ একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলে যে আরও বহুগুণ ধ্বংসক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

চাঁদে জল-বায়ু কিছুই নেই। কাজেই উল্কার আঘাতে চাঁদে যেসব গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, জলবায়ুর ক্রিয়ায় তাদের কোন পরিবর্তন হবারও সম্ভাবনা নেই। আজ থেকে প্রায় তিনশ' কোটি বছর আগে চাঁদ যখন প্রথম কঠিন রূপ পেয়েছিল তখন তার রূপ যেমন ছিল আজও তাই রয়েছে।

ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে আর একটা মজার জিনিস দেখা যায়। মনে হয়, কোন কোন গর্তের চারপাশে কতগুলি সাদা রেখা গিরি-উপত্যকার উপর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এদের কোন ছায়া পড়ে না, কাজেই এগুলি অনুচ্চ গিরিশ্রেণী কিংবা ফাটল হ'তে পারে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা, উল্কার আঘাতে চন্দ্র-পৃষ্ঠ থেকে শিলাচূর্ণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এসব রেখার সৃষ্টি করেছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বল খুবই কম, কাজেই এসব শিলাচূর্ণ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। টেবিলের ওপর খানিকটা পাউডার রেখে তার ওপর একটা মারবেল ফেলে দিলে দেখা যাবে, মাঝে একটা গর্ত হয়েছে আর তার চারদিকে অনেকগুলো রেখার

আকারে পাউডার ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই সুদূর অতীতে চাঁদেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ব'লে অনায়াসে কল্পনা করা যেতে পারে।

আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে চাঁদের গর্তগুলির জন্য অগ্ন্যুৎপাত এবং উল্কাপাত সমভাবে দায়ী। সুদূর অতীতে চাঁদ ঠাণ্ডা হ'য়ে যখন প্রথম তার কঠিন রূপ পাচ্ছিল তখন অগ্ন্যুৎপাতের প্রাবল্য ছিল অত্যন্ত বেশি। কাজেই পুরানো গর্তগুলির বেশির ভাগই হয়তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। আর চাঁদ মোটামুটি কঠিন রূপ পাবার পর যেসব অপেক্ষাকৃত নূতন গর্তের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির জন্য উল্কাপাতই প্রধানত দায়ী ব'লে মনে করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো উল্কার আঘাতে চাঁদের পাতলা ত্বক্ ভেঙে একটা ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরে সেখান দিয়ে প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হয়তো গর্তের পরিমাপ আরও অনেক বড় হ'য়ে গিয়েছে।

পৃথিবী ও চাঁদের সম্পর্ক

চাঁদের উৎপত্তি

কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, পৃথিবীর শৈশবকালে সূর্যের আকর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে খানিকটা ছিট্‌কে বেরিয়ে যায় এবং তা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। এভাবে চাঁদের উৎপত্তি হয়েছে, আর এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যে বিরাট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তাই এখন আমরা প্রশান্ত-মহাসাগররূপে দেখতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মতবাদের স্বপক্ষে আজ অবধি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা এই মতবাদে বিশ্বাসী নন। তাঁরা মনে করেন, সুদূর অতীতে মহাশূন্যে সঞ্চরমান জড়পদার্থসমূহ পৃথক্‌ভাবে ঘনীভূত ও একত্রিত হ'য়ে পৃথিবী ও চন্দ্রের সৃষ্টি করেছে।

চাঁদের ভবিষ্যৎ

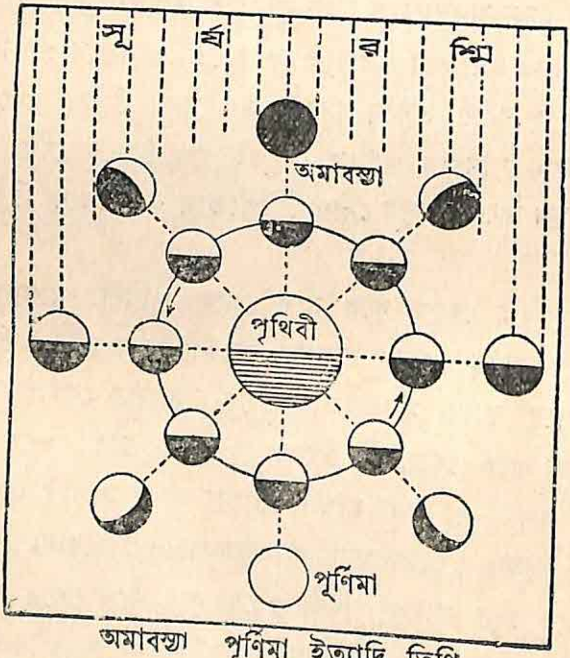
জেফ্রেস্ (Jeffreys), হমবার্গ (Holmberg) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা গণনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবী ক্রমশ সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরবার বেগও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর ফলে দিনও ক্রমশ একটু একটু ক'রে বড় হচ্ছে। আবার পৃথিবী ক্রমশ সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ব'লে চাঁদের উপর সূর্যের আকর্ষণ ক্রমশ আরও প্রবল হচ্ছে। এর ফলে চাঁদ ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমে এমন অবস্থা হবে যখন পৃথিবীর একদিন এখনকার ৪৭ দিনের সমান হবে এবং চান্দ্রমাসও বড় হ'তে হ'তে এখনকার ৪৭ দিনের সমান হবে। তখন পৃথিবীর একটা দিকই সব সময় চাঁদের দিকে ফেরানো থাকবে। তখন পৃথিবীর অর্ধাংশ থেকেই শুধু চাঁদকে দেখা যাবে, বাকি অর্ধাংশের মানুষ চাঁদের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হবে।

চাঁদ পৃথিবী থেকে দূরে সরে গেলে পৃথিবীর মানুষ আর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ হারাবে চিরকালের জন্য। বর্তমানে চাঁদের দূরত্ব যা আছে তাতে মাঝে মাঝে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার সুযোগ হয়। এসময় সূর্যের জ্বলন্ত গোলকটি চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে তাই সূর্যের ছটামণ্ডলের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। চাঁদের দূরত্ব সামান্য একটু বাড়লেই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার সুযোগ আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

এভাবে চাঁদ ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে শেষে এমন একদিন আসবে যখন সূর্যের আকর্ষণজনিত বল পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলের চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠবে। এ অবস্থায় চাঁদের পক্ষে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণ করা আর সম্ভব হবে না। সূর্যের বিপুল আকর্ষণে সে চিরকালের জন্য কক্ষচ্যুত হ'য়ে যাবে এবং নূতন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করবে, অর্থাৎ পরাধীন চাঁদ সেদিন একটি স্বাধীন গ্রহের মর্যাদা লাভ করবে। তবে এজন্য এখনই চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন নেই, তার কারণ এরূপ ঘটনা ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে।

চাঁদের কলা-পরিবর্তন

পূর্ণিমার চাঁদ গোলাকার, কিন্তু তারপর রোজ চাঁদ কিছুটা ক'রে ছোট হ'তে হ'তে কাস্তের মতো সরু হ'য়ে যায় এবং অমাবস্যার রাতে তাকে একেবারেই দেখা যায় না। আবার যত দিন যায় তত বড় হ'তে থাকে এবং প্রায় এক মাস পরে আর এক পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদকে আবার গোলাকার দেখা যায়। এর কারণ কি? সূর্যের আলোয় চাঁদের যে অংশ আলোকিত হয় তার সবটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে না। প্রতিমাসে

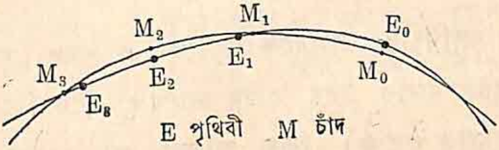


অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথি

চিত্র ৭১

পূর্ণিমার রাতেই শুধু পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশ সবটা দেখা যায়। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে তেমনি চাঁদ আবার পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম থেকে পুবে ঘোরে। আমরা জানি পৃথিবী সব জিনিসকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে তাই আপেল মাটিতে পড়ে। চাঁদও তেমনি পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়ে বৃত্তাকার পথে

তার চারদিকে ঘুরছে। কাজেই তার অবস্থান অনুসারে এই আলোকিত অংশ কখনও কম আবার কখনও বেশি দেখা যায়। আর একটা কথা, সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে চাঁদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ক'রে বোঝা যায়, চাঁদের এভাবে একবার ঘুরতে লাগে ২৭⅓ দিন। কিন্তু এসময়ের মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে একটু এগিয়ে যায়, কাজেই এক পূর্ণিমা থেকে আর



চিত্র ৭২। মহাশূন্যে পৃথিবী ও চাঁদের গতিপথ

এক পূর্ণিমার সময়ের ব্যবধান হয় প্রায় ২৯½ দিন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সূর্যের চারদিকেও ঘুরছে। চাঁদের লব্ধগতি প্রকৃতপক্ষে ঢেউ-খেলানো, ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ প্রতিমাসেই একবার ক'রে পৃথিবীর কক্ষের ভেতরে আসে এবং আবার বাইরে চলে যায়। মঙ্গলগ্রহের কোন জীব যদি দেখে তবে তার কাছে মনে হবে যে, পৃথিবী ও চাঁদ উভয়েই একটি কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরছে।

এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানকে **চান্দ্রমাস** বলা হয়। আর চান্দ্রমাসের হিসেবে যে বৎসর গণনা করা হয়, তার নাম **চান্দ্রবৎসর**। ২৯½ × ১২ = ৩৫৪ দিনে চান্দ্রবৎসর পূর্ণ হয়, কাজেই সৌরবৎসরের তুলনায় চান্দ্রবৎসর ১১ দিন কম হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজা-পার্বণের বা উৎসবের তারিখ চান্দ্রমাস হিসেবে ঠিক করা হয়। এজন্য দেখা যায় যে, মুসলমানদের পরব প্রতিবছরই এগার দিন ক'রে এগিয়ে আসে। কিন্তু হিন্দুরা প্রতিটি উৎসব নির্দিষ্ট ঋতুতে পালন করার পক্ষপাতী। হিসেব অনুসারে ৩২ সৌরমাস ৩৩ চান্দ্রমাসের সমান। এই ব্যবধান দূর করার জন্য হিন্দুদের পঞ্জিকায় অতিরিক্ত চান্দ্রমাসটিকে 'মলমাস' নামে গণনার বহির্ভূত ধরা হয়। দুই অমাবস্যা-যুক্ত রবিসংক্রান্তি-বর্জিত মাসের নাম **মলমাস**। এই মাসে

হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ। এর ফলে হিন্দুদের পূজা-পার্বণের তারিখ মুসলমানদের মতো ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারে না। আর এইজন্যই হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা বা দশরা বরাবরই আশ্বিন ও কার্তিক মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

চাঁদের আবর্তন-গতি

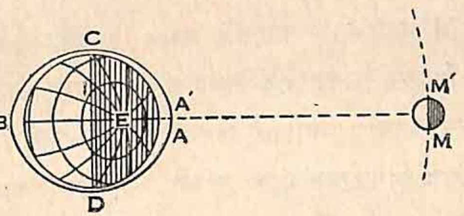
চাঁদ যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এ খবর তো সবাই জানে, কিন্তু আর একটা মজার খবর কজন রাখে? চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বরাবর চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই, এর কারণ কি? বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও একবার পাক খায় অর্থাৎ এক চান্দ্রমাস চাঁদের একদিনের সমান, অর্থাৎ চাঁদের কোন একটি জায়গায় সূর্যের আলো পাওয়া যায় প্রায় ১৫ দিন ধরে, আর প্রায় ১৫ দিন ধরে সেখানে থাকে রাত্রির অন্ধকার। তাই চাঁদের একটা দিকই সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। চাঁদের আর একটা পিঠে কি আছে তা আজও আমরা দেখতে পাইনি। আর একটা কথা, চাঁদের দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশি, তাই চাঁদের মধ্যাহ্নে তাপমাত্রা ২১৪° ফারেনহাইটে ওঠে (জলের স্ফুটনাঙ্ক ২১২° ফাঃ), আবার মধ্যরাত্রিতে তাপমাত্রা −২৪৩° ফারেনহাইটে নেমে যায় (৩২° ফারেনহাইটের নীচেই জল জমে বরফে পরিণত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা সবচেয়ে কম হয় দক্ষিণ-মেরুতে, সেখানকার সর্বনিম্ন উষ্ণতা −১২০° ফাঃ)।

জোয়ার-ভাঁটা

সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের প্রভাবে স্থান-বিশেষে সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে, এর নাম জোয়ার (high tide)। আবার অন্যস্থানে সমুদ্রের জল নেমে যায়, এর নাম ভাঁটা

(low tide)। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক, কাজেই তার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, সূর্য বহুদূরে আছে ব'লে তার আকর্ষণ তত প্রবল নয়।

ধরা যাক, পৃথিবীর (E) উপরিভাগ সর্বত্র সমান জলরাশি দিয়ে ঢাকা। পৃথিবী-পৃষ্ঠের যেস্থান চাঁদের সবচেয়ে কাছে আছে সেখানেই চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি হবে। জল তরল পদার্থ ব'লে তা সহজেই আকৃষ্ট হয়, এর ফলে C ও D-স্থান থেকে জল এসে A-স্থানে জমা হয় এবং চাঁদের আকর্ষণে ফুলে ওঠে। কাজেই A-স্থানে তখন জোয়ার দেখা যায়,



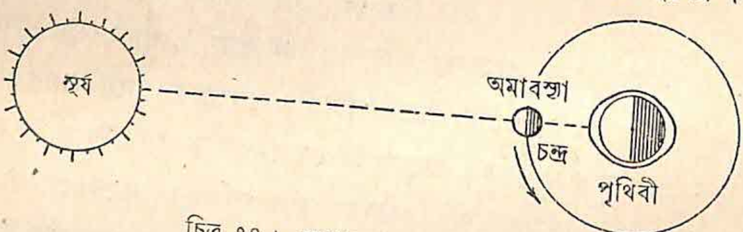
চিত্র ৭৩

এর নাম নিকটবর্তী বা প্রত্যক্ষ জোয়ার। আবার A-স্থানের উলটোদিকে অবস্থিত B-স্থানের জল চাঁদ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের চেয়ে আরও চার হাজার মাইল দূরে রয়েছে। কাজেই এস্থানের জলের উপর চাঁদের যে আকর্ষণ তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ হবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু B-স্থানের সমুদ্রতলস্থ কঠিন ভূভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। কাজেই চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল চাঁদের দিকে সরে গেলে সেই সঙ্গে পৃথিবীর কঠিন অংশ সবটাই চাঁদের দিকে সরে যাবে, অথচ B-স্থানের জলের উপর চাঁদের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তা অতটা সরে আসবে না। এর ফলে সেখানেও জোয়ারের সৃষ্টি হবে, এর নাম দূরবর্তী বা পরোক্ষ জোয়ার। এই দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে, অর্থাৎ C ও D স্থান থেকে, জল সরে যাচ্ছে ব'লে তখন ঐ দুই জায়গায় ভাঁটা হবে।

পৃথিবী ও চাঁদ ক্রমাগত ঘুরছে, এভাবে ঘুরবার সময় পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশ এবং তার ঠিক বিপরীত অংশে তখন

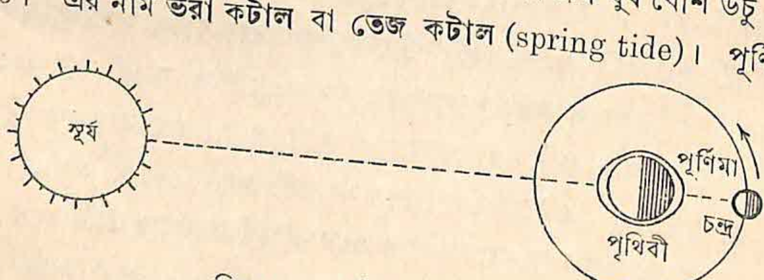
জোয়ার হয় এবং তাদের মধ্যবর্তী অংশে তখন ভাঁটা হয়, কাজেই যে-কোন-স্থানে প্রতিদিন দু'বার জোয়ার এবং দু'বার ভাঁটা হয়। সাধারণত জোয়ার বা ভাঁটার স্থিতিকাল প্রায় ছ' ঘণ্টা। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য একই স্থানে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর পর জোয়ার আরম্ভ হওয়ার কথা; কিন্তু চাঁদও প্রতিদিন তার কক্ষ-পথে একটু ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই কোনস্থানে আজ যে সময়ে জোয়ার হ'ল, কাল সেস্থানে ঠিক ঐ সময়ে জোয়ার না হ'য়ে তার প্রায় ৫২ মিনিট পরে জোয়ার হবে। অর্থাৎ, চিত্রের M-স্থানে চাঁদ থাকায় আজ যদি A-স্থানে জোয়ার হয়, তাহ'লে ২৪ ঘণ্টা পরে চাঁদের অবস্থান হবে M'-স্থানে। কাজেই তখন A-স্থানে জোয়ার হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে ব'লে আরও ৫২ মিনিট পরে A-স্থান A'-স্থানে আসবে, কাজেই তখন সেখানে জোয়ার হবে।

সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের মতো প্রবল নয়, কিন্তু অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই পৃথিবীর একই দিকে থাকে ব'লে তখন চন্দ্র ও সূর্যের মিলিত



চিত্র ৭৪। অমাবস্যায় ভরা কটাল

আকর্ষণ খুবই প্রবল হয়। কাজেই তখন জোয়ারের জল খুব বেশি উঁচু হ'য়ে ওঠে। এর নাম **ভরা কটাল** বা **তেজ কটাল** (spring tide)। পূর্ণিমায়

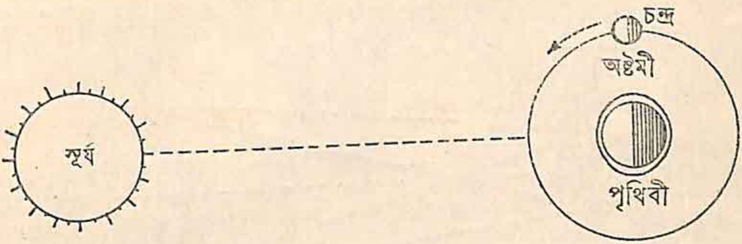


চিত্র ৭৫। পূর্ণিমায় ভরা কটাল

পৃথিবীর একদিকে চন্দ্র এবং অন্যদিকে সূর্য থাকে ব'লে চন্দ্রের আকর্ষণে

যে যে স্থানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণেও ঠিক সেই সেই স্থানে জোয়ার হয়, কাজেই পূর্ণিমাতেও ভরা কটাল হয়।

অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি ক'রে থাকে। কাজেই চন্দ্রের আকর্ষণে যে যে স্থানে জোয়ার হবার কথা, সূর্যের আকর্ষণে



চিত্র ৭৬। অষ্টমীতে মরা কটাল

তখন সেই সেই স্থানে ভাঁটা হওয়া উচিত। এজন্য সেসব জায়গায় জোয়ারের জল বেশি ফুলে উঠতে পারে না। এর নাম **মরা কটাল** (neap tide)।

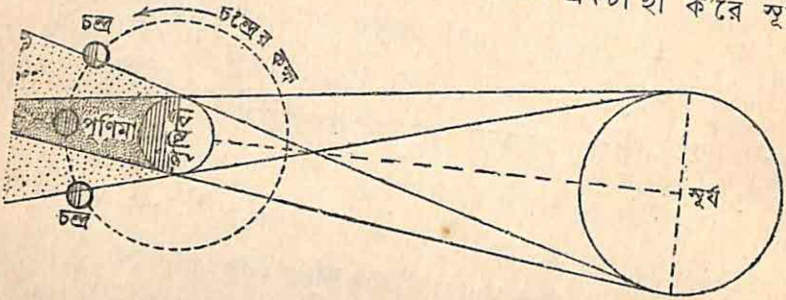
জোয়ার সব জায়গায় এবং সব সময় ঠিক হিসেবমতো বেগে অগ্রসর হয় না। বায়ুর বেগ, সমুদ্রের গভীরতা, তলদেশের ঘর্ষণ প্রভৃতির উপর নির্ভর ক'রে এর বেশি বা কম হয়। গভীর সমুদ্রে জোয়ারের জল সাধারণত ৩।৪ ফুটের বেশি উঁচু হয় না, কিন্তু উপকূলের কাছে তা ১০।১২ ফুট থেকে ৩০।৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে পারে। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পুবদিকে আবর্তিত হয়, কাজেই জোয়ারের স্রোত পুব থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। জোয়ারের জল নদীমুখে প্রবেশ করবার সময় সাধারণত খুব উঁচু হ'য়ে প্রবলবেগে এগিয়ে যেতে থাকে, একেই বান (tidal bore) বলা হয়। নদীর খরপ্রবাহ, নদীমুখের বালুচর ও ফানেলের আকারের নদীমুখ এই তিনটি কারণে বান দেখা দেয়।

জোয়ারের সময় নদীমুখে জল বেশি থাকে ব'লে তখন বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা অথবা নদী থেকে বেরিয়ে

যাওয়া সম্ভব হয়। জোয়ার-ভাঁটার জন্য নদীমুখ পরিষ্কার থাকে এবং নদীখাত গভীর থাকে ব'লে নদীপথে যাতায়াত করা সহজ হয়।

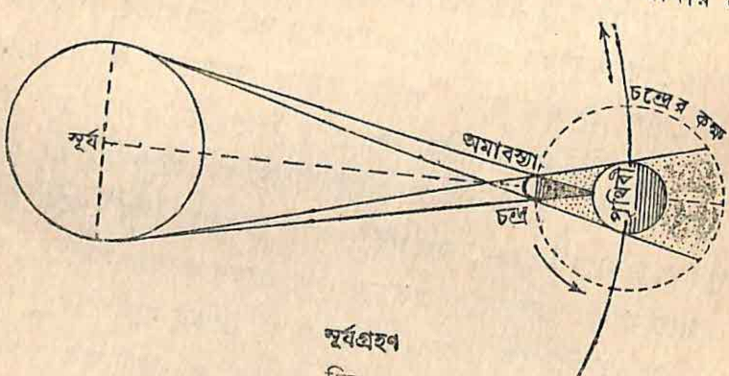
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ

আগে গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের দেশে বেশ একটা মজার গল্প প্রচলিত ছিল। রাহু হ'ল একটা দৈত্য, সে বিরাট একটা হাঁ ক'রে সূর্য বা



চন্দ্রগ্রহণ
চিত্র ৭৭

চন্দ্রকে গ্রাস ক'রে ফেলে, তাই হঠাৎ চারদিক আঁধার হ'য়ে যায়। কিন্তু দৈত্যটার গলা কাটা, সেজন্য গ্রাস করলেও সূর্য বা চন্দ্র আবার গ্রাসমুক্ত

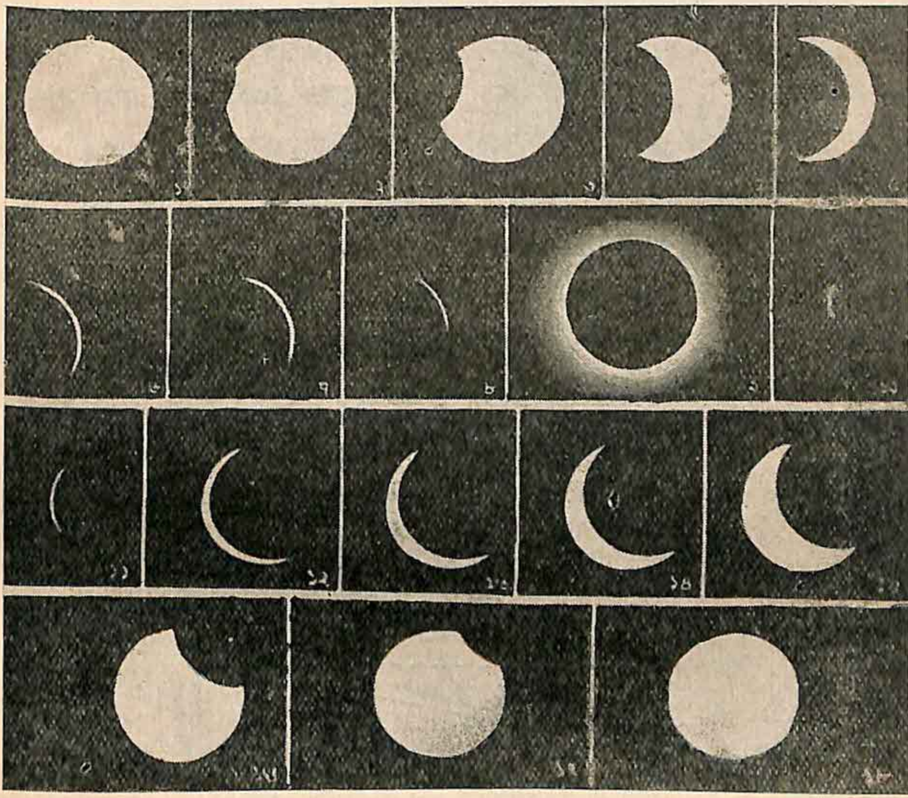


সূর্যগ্রহণ
চিত্র ৭৮

হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে। আর এই কারণে আমাদের দেশে গ্রহণকে আত্মীয়-বিয়োগের সমতুল্য ধরে নিয়ে কতগুলি লোকাচার পালন করা হয়।

এ তো গেল পুরাণের গল্প। জ্যোতির্বিদ্‌রা অনুসন্ধান ক'রে বুঝতে

পেরেছেন, পৃথিবী ও চন্দ্রের আলোছায়ার খেলাতে এরকম গ্রহণ দেখা যায়। আঁধার ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে, আর তার আলো সোজাসুজি চোখে এসে পড়ছে। এখন যদি একটা টিনের চাক্‌তি চোখের সামনে রাখা যায়, তাহ'লে তার ছায়া এসে চোখের উপর পড়বে, কাজেই তখন প্রদীপটা আর দেখা

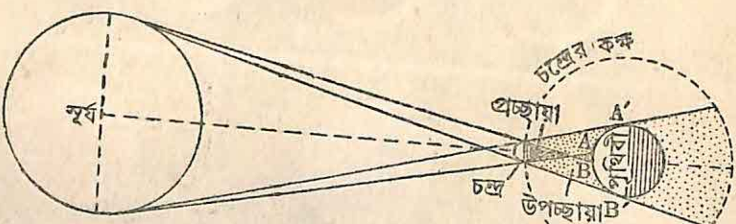


চিত্র ৭৯। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় এই দৃশ্য দেখা যায়। ৯নং চিত্রে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হয়েছে, এই সময় ছটামণ্ডল দেখা যায়। (গ্রহণারম্ভ থেকে মোক্ষ পর্যন্ত পর পর গৃহীত কয়েকটি আলোকচিত্র অনুসারে অঙ্কিত)

যাবে না। সূর্য একটা সুবিশাল দীপের মতো জ্বলছে আর পৃথিবী ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কোন এক পূর্ণিমায় হয়তো সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ সমসূত্রে এসে পড়ল। পূর্ণিমার রাতে পৃথিবীর

একদিকে থাকে সূর্য এবং তার বিপরীত দিকে থাকে চাঁদ, কাজেই তখন চাঁদ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার মধ্যে এসে পড়বে। এর ফলে কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর ছায়ায় চাঁদ ঢাকা পড়ে যাবে, এরই নাম **চন্দ্রগ্রহণ** (lunar eclipse), চাঁদ আংশিকভাবে প্রচ্ছায়ার মধ্যে থাকলে তাকে আংশিক গ্রহণ, আর সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছায়ার মধ্যে থাকলে তাকে পূর্ণগ্রহণ বলে। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে তাই কিছুক্ষণ পরেই চাঁদ আবার প্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে আসবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার, চাঁদ যতক্ষণ পৃথিবীর উপচ্ছায়া অংশে থাকে ততক্ষণ গ্রহণ হয় না। তবে এই অংশে সূর্যের আলো সবটা পৌঁছাতে পারে না ব'লে তখন চাঁদের জ্যোৎস্না অনেক ম্লান হ'য়ে যায়।

অমাবস্যার দিনে চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকে। কোন এক অমাবস্যায় যদি সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই রেখায় এসে পড়ে তাহ'লে তখন কিছুক্ষণের জন্য চাঁদের ছায়া পড়বে পৃথিবীর উপর, এর ফলে দেখা যাবে **সূর্যগ্রহণ** (solar eclipse)। চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর আকার অনেক বড়, কাজেই পৃথিবী কোন সময়ই সম্পূর্ণরূপে চাঁদের ছায়ার মধ্যে থাকতে

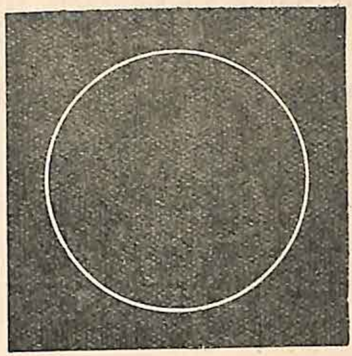


বলয় গ্রহণের সময় সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থান

চিত্র ৮০

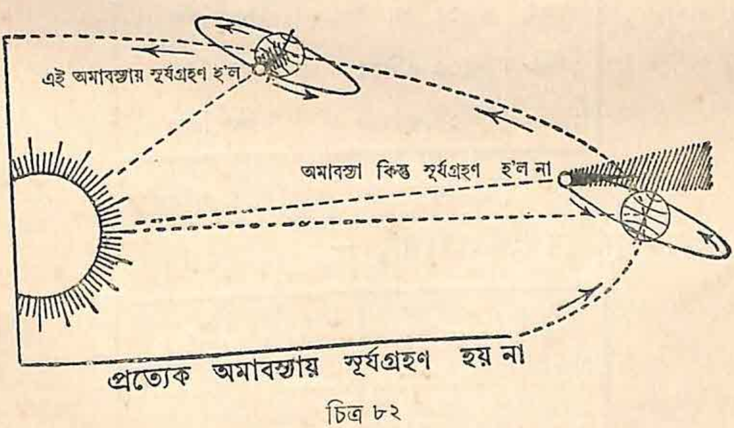
পারে না। সুতরাং পৃথিবীর যেসব অংশ চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে থাকে শুধু সেসব জায়গা থেকেই সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখা সম্ভব। আর যেসব অংশ চাঁদের উপচ্ছায়ার মধ্যে থাকে সেখান থেকে সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখা যায়। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এদের পরস্পরের দূরত্ব সব সময় এক থাকে না,

সামান্য তারতম্য হয়। কাজেই মাঝে মাঝে সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী চাঁদের প্রচ্ছায়ার সীমা ছাড়িয়ে থাকে। এই অবস্থায় পৃথিবীর AB অংশের যে-কোনস্থান থেকে কালো গোলাকার চাঁদের চারদিকে সূর্যকে অতি উজ্জ্বল একটা বলয়ের মতো দেখা যাবে, এর নাম **বলয় গ্রহণ** (annular eclipse)। চন্দ্রগ্রহণের বেলায় কিন্তু এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এই সময় পৃথিবীর A′B′-এর মাঝের অংশ সবটাই উপচ্ছায়ার মধ্যে থাকে, কাজেই এর যে-কোনস্থান থেকেই আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে। এসময় পৃথিবীর কোনস্থান থেকেই পূর্ণগ্রহণ দেখা সম্ভব হবে না।



চিত্র ৮১। সূর্যের বলয় গ্রহণ

প্রত্যেক অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন? প্রত্যেক অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ ঠিক **সমসূত্রে** থাকে না ব'লেই



চিত্র ৮২

এরকম হয়। এর কারণ, চাঁদের কক্ষতল ও পৃথিবীর কক্ষতল এক সমতলে নেই; প্রথমটি দ্বিতীয়টির ওপর ৫ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে সামান্য হেলে আছে এবং পরস্পর দু'টি পাতে (node) ছেদ করেছে। চাঁদ যদি ঘুরতে

ঘুরতে কোন অমাবস্যা তিথিতে একটি পাতে এসে উপস্থিত হয় তাহ'লে তা সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে এক সমসূত্রে থাকবে এবং তখন সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। আর অমাবস্যায় চাঁদ যদি ঠিক পাতে না থাকে, অর্থাৎ পাতের কিছু উপরে বা নীচে থাকে, তাহ'লে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়বে না, কাজেই তখন গ্রহণও দেখা যাবে না। ঠিক একই কারণে প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হ'তে পারে না।

১নং তালিকা। আগামী কয়েক বছরে কোন্ কোন্ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে—

সন	তারিখ	গ্রহণের প্রকৃতি
১৯৬১	২৬ আগস্ট	পূর্ণ
১৯৬৩	৬ জুলাই	আংশিক
১৯৬৪	২৫ জুন	পূর্ণ
১৯৬৪	১৯ ডিসেম্বর	পূর্ণ
১৯৬৫	১৪ জুন	আংশিক
১৯৬৮	১৩ এপ্রিল	আংশিক
১৯৭০	১৭ আগস্ট	আংশিক

২নং তালিকা। নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে পৃথিবীর কোন-না-কোন জায়গা থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে—

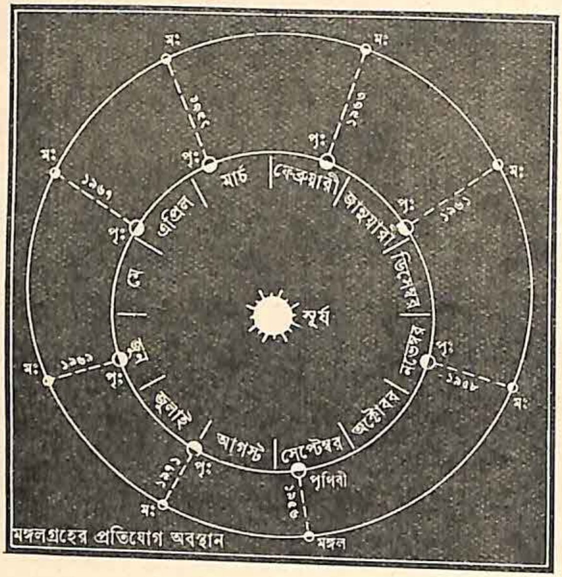
সন	তারিখ	সন	তারিখ
১৯৬১	১৫ ফেব্রুয়ারী	১৯৬৬	২০ মে
১৯৬২	৫ ফেব্রুয়ারী	১৯৬৮	২২ সেপ্টেম্বর
১৯৬৩	২০ জুলাই	১৯৭০	৭ মার্চ

মঙ্গলগ্রহ

সৌরজগতে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলগ্রহের স্থান। এই গ্রহটির রং লাল। রক্তের রঙও লাল। তাই রোমানদের যুদ্ধ-দেবতার নামানুসারে ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া হয়েছে Mars। কিছুদিন আগেও কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে মঙ্গলগ্রহে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উন্নত ধরনের জীব নিশ্চয়ই আছে। এ নিয়ে অবশ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়েছিল। উভয় পক্ষে বহু বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী যোগ দেওয়ায় জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল। সে বাগ্‌যুদ্ধ এখন একরূপ থেমে গেছে, জনসাধারণের মধ্যে কৌতূহলও এখন অনেক স্তিমিত হ'য়ে এসেছে, কিন্তু কোন দল নিশ্চিত জয় লাভ করেছে কিনা সে সম্পর্কে আজও কিছুই জানা যায়নি।

মঙ্গল একটি বহির্গ্রহ, অর্থাৎ এর কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাইরে অবস্থিত। আর এজন্য মঙ্গলের যে অর্ধাংশে সূর্যালোক পড়ে তার প্রায় সবটাই পৃথিবী থেকে দেখা যায়। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে প্রায় চৌদ্দ কোটি মাইল। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে আসতে এর লাগে প্রায় ৬৮৭ দিন, অর্থাৎ মঙ্গলের এক বছর পৃথিবীর প্রায় দু'বছরের সমান। কাজেই প্রায় প্রতি দু'বছর দেড়মাস অন্তর মঙ্গল পৃথিবীর কাছে আসে, আর তখনই একে ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়। এর নাম প্রতিযোগ অবস্থান (opposition)। পৃথিবীর কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার কিন্তু সে তুলনায় মঙ্গলের কক্ষ একটু লম্বাটে (উপবৃত্তাকার)। কাজেই গ্রহ দু'টি কাছাকাছি এলেও তাদের দূরত্ব সব সময় এক থাকে না, কখনও কম আবার কখনও বেশি হয়। এই দূরত্ব যখন সবচেয়ে বেশি হয় তখন তার পরিমাপ হয় ছ'কোটি দশ লক্ষ মাইল, কিন্তু মঙ্গল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি মাইল। সাধারণত ১৫ কি ১৭ বছর পর পর এরূপ ঘটনা ঘটে। তখনই একে পর্যবেক্ষণ করার

সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ১৯৫৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল। তখন এই গ্রহ দু'টির মাঝেকার দূরত্ব ছিল ৩,৫১,২০,০০০ মাইল।



মঙ্গলগ্রহের প্রতিযোগ অবস্থান

চিত্র ৮৩

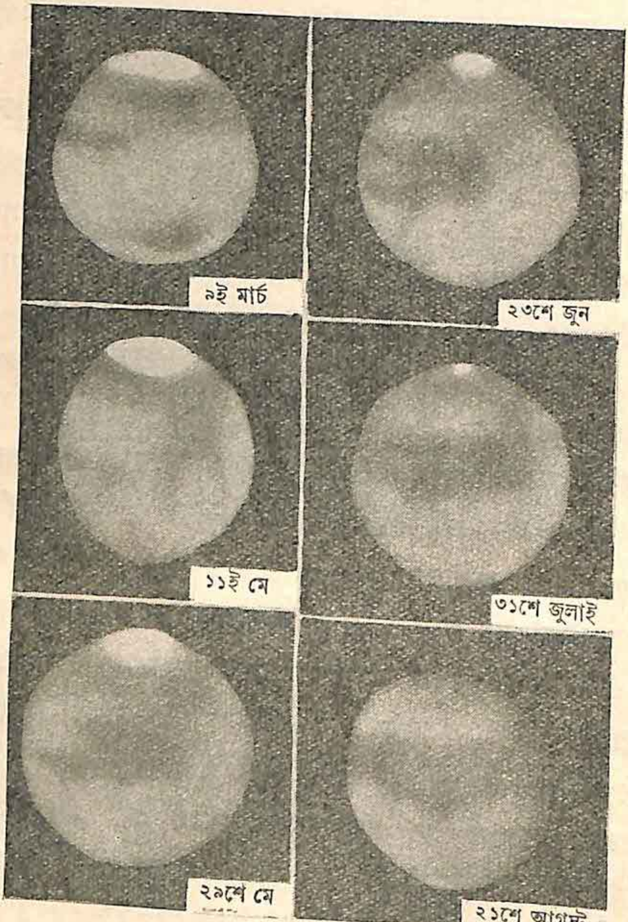
মঙ্গলের ব্যাস প্রায় ৪,২০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। এর ওজন পৃথিবীর প্রায় $\frac{১}{১০}$ অংশের সমান, কাজেই পৃথিবীর তুলনায় এর মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বলও অনেক কম। একজন লোক পৃথিবীতে যদি এক মণ ওজনের জিনিস তুলতে পারে তাহ'লে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে সে অনায়াসে তিন মণ ওজনের জিনিস তুলবে। মঙ্গল তার চারদিকে খানিকটা বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পেরেছে, তাই সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় গোধূলির আলো দেখা যায়। কিন্তু এই বায়ুস্তর অত্যন্ত পাতলা। মনে হয় উপরদিকে মাত্র ৬০ মাইল অবধি এর বিস্তৃতি। এজন্য সেখানে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম। ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুর যে চাপ তার দশভাগের একভাগ মাত্র। পৃথিবীতে এভারেস্টের চূড়ায় বায়ুর যে চাপ তার চেয়েও কম। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এখানে জীবন-

ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জল এবং বায়ু দুই-ই আছে, কিন্তু তাদের পরিমাণ এত কম যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। মঙ্গলের আবর্তনকাল ২৪½ ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রায় পৃথিবীর একদিনের সমান। কিন্তু এখানকার বায়ুস্তর অত্যন্ত পাতলা ব'লে এখানে দিবা-রাত্রির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় অনেক বেশি পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ, সূর্যের প্রচণ্ড তাপ প্রতিরোধ করবার মতো যথেষ্ট বায়ু এখানে নেই। বিজ্ঞানীদের অনুমান মঙ্গলের সবুজ অংশে দুপুর বেলায় তাপমাত্রা ৮৬° ফারেনহাইটে ওঠে এবং গোধূলি বেলায়ই ১০°-র কাছাকাছি নেমে যায়। দুপুর রাতে এখানকার তাপমাত্রা খুব সম্ভব −১১২°-র কাছাকাছি নেমে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে তাপমাত্রার এতখানি পার্থক্য সহ্য করা পৃথিবীর কোন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে মস্ (Moss) বা সবুজ শেওলা, লাইকেন (Lichen) ইত্যাদি জাতীয় কতগুলি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে তা সম্ভব হ'লে হ'তেও পারে।

পৃথিবীর মতো মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্তও তার কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় ২৫° কোণ উৎপন্ন ক'রে রয়েছে। সেজন্য পৃথিবীর ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে মঙ্গলের ঋতু-পরিবর্তনের খুব সাদৃশ্য আছে। দু'বছর পর পর পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে দেখার যখন খুব সুযোগ হয় তখন তার দক্ষিণ মেরুর দিকটাই ভালো দেখা যায়, উত্তর মেরুর দিকটা তখন আড়ালে থাকে। উত্তর মেরুর দিকটা যখন দেখার সুযোগ আসে তখন কক্ষপথে মঙ্গল ও পৃথিবী বিপরীত দিকে থাকে, কাজেই তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি।

বিজ্ঞানী হার্শেলই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, মঙ্গলগ্রহেও ঋতু-পরিবর্তন হয় এবং প্রতিবছরই নিয়মিতভাবে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে। পরে পিকারিং, সিয়াপারেলি, লাওয়েল, আন্তনিয়াদি, স্লিফার প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌রাও তাঁর এই উক্তি সমর্থন করেন। দূরবীণের সাহায্যে দক্ষিণ মেরুর খানিকটা জায়গা জুড়ে সাদা বরফের টুপি দেখা যায়। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বরফের টুপি ক্রমশ ছোট হ'তে থাকে এবং শেষে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। শীত-সমাগমে এর আকার আবার বড়

হ'তে থাকে এবং শেষে নিরক্ষরেখার দিকে মাঝ পথ অবধি এগিয়ে যায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, মেরু অঞ্চলের সাদা টুপিটি যখন অদৃশ্য হ'য়ে যায় তখন সেখানকার তাপমাত্রা বরফের গলনাঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। কাজেই এ যে বরফের স্তূপ তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। আগেই বলা হয়েছে



চিত্র ৮৪। মঙ্গলগ্রহে ঋতু-পরিবর্তন। মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশ বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়, তাই শুধু সেইসব অঞ্চলই তৃণাচ্ছাদিত হ'য়ে ওঠে, অন্যত্র ঊষর মরুভূমি বিদ্যমান। নীল বা নীলাভ-সবুজ অংশগুলোই ছবিতে কালো দেখায়। (দূরবীণের সাহায্যে তোলা ছবি উল্‌টো দেখায়)

যে, মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। কাজেই সেখানে বরফ কিংবা জল থাকলেও তার পরিমাণ খুবই কম হওয়া উচিত। সেই হিসেবে বরফের স্তর বেশি পুরু হওয়া সম্ভব নয়। অনেকের মতে এই স্তর মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর।

বিজ্ঞানী পিকারিং মঙ্গল-পৃষ্ঠ খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেন, এর স্থানে স্থানে কতগুলি অংশ ঈষৎ লাল, আর তাদের মাঝে মাঝে আছে নীলাভ-ধূসর, নীল অথবা নীলাভ-সবুজ অঞ্চল। নীল বা নীলাভ-সবুজ অংশগুলি পৃথিবীর তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন অঞ্চলের সবুজ রং ক্রমশ বাদামী বা হলদে হয় এবং তারপর ক্রমে আরও বিবর্ণ হ'য়ে যায়। আর একটা মজার কথা এই যে, মেরুপ্রদেশের বরফের টুপি যখন গলে যায় তখন সেই অঞ্চলের একটা বিস্তীর্ণ জায়গার রং ক্রমশ আবার সবুজ হ'য়ে ওঠে। এসব দেখে বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয়ই উদ্ভিদ্ আছে। শীতকালে এসব গাছের পাতা শুকিয়ে বাদামী হয়, আর যখন এসব পাতা ঝরে যায় তখন তাদের ধূসর ও বিবর্ণ দেখা যায়। আবার গ্রীষ্ম-সমাগমে যখন মেরুপ্রদেশের বরফ-গলা জল এসব নিম্নভূমিতে এসে পৌঁছায়, তখন সেখানকার গাছপালা নূতন পত্র-পল্লবে শোভিত হ'য়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছরই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সিয়াপারেলি এবং লাওয়েলও এই উক্তি সমর্থন করেছেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানী আন্তনিয়াদি মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ ক'রে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"কেবল সবুজ স্থলগুলোই নয়, ধূসরাভ বা নীল অংশগুলোও আস্তে আস্তে বাদামী, লালচে বাদামী ও তারপর গাঢ় লাল হ'য়ে উঠলো; অবশ্য অন্যান্য সবুজ বা নীলাভ অংশগুলো অপরিবর্তিতই রইলো। আমাদের দেশের গ্রীষ্ম বা শরৎকালের ঝরাপাতার রঙের মতোই এই রংগুলো।" সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে ছবি নিয়েও মঙ্গল-পৃষ্ঠে প্রায় একই রকম কালো কালো দাগ দেখা গেছে। নীলাভ-ধূসর, নীল বা নীলাভ-সবুজ অংশগুলোই ফটোতে কালো দেখায়।

কাজেই এগুলো মেঘের চিহ্ন হওয়া সম্ভব নয়। তবে মনে হয়, মঙ্গলের স্বল্পপরিমাণ জলের সরবরাহ কতগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে, তাই শুধু সেসব অঞ্চলই তৃণাচ্ছাদিত হ'য়ে সবুজ বা নীলাভ-সবুজ হ'তে পারে, বাকি অঞ্চলগুলিতে সব সময়ই উষর মরুভূমি বিদ্যমান।

পর্যবেক্ষণ স্থায়ী করার একমাত্র উপায় আলোকচিত্র-গ্রহণ। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলোকচিত্র-গ্রহণ-পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। একাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে আবহাওয়ার ঝাপসা ভাব দূর করার জন্য অথবা আকাশ, মেঘ কিংবা অন্য কোন বহির্দৃশ্যের ছবি স্পষ্টতর করার জন্য আজকাল নানারঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। মঙ্গলের ফটো তোলার সময়ও এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। নীল, হলদে, সবুজ, লাল প্রভৃতি রঙের ফিল্টার ব্যবহার ক'রে মঙ্গল সম্পর্কে আরও অনেক নূতন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালের পর্যবেক্ষণের ফলে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, গ্রহটির আটভাগের প্রায় পাঁচভাগই মরুভূমি। পৃথিবীতে যেমন সাহারা ও গোবি মরুভূমি আছে মঙ্গলের উত্তরদিকেও তেমনি বহুদূরবিস্তৃত একটি লাল মরু অঞ্চল দেখা গেছে। জলের সরবরাহ অত্যন্ত কম এবং তাও কতগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চল দিয়েই সীমাবদ্ধ। মঙ্গলগ্রহের দু'টো মেরুপ্রদেশই বরফে ঢাকা থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। তাই দেখা যায় যে, মেরুপ্রদেশের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে সবুজ উদ্ভিদের দল নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই জীবনযুদ্ধে তারা যেন ক্রমশ হার মানছে, আর তাইতে মরুভূমিও যেন ক্রমশ আরও প্রসার লাভ করছে।

নীল ফিল্টারের সাহায্যে তোলা ছবিতে মঙ্গলে আবহমণ্ডলের অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরা পড়লো। ইতিপূর্বে বৃহস্পতি ও শনির ফটোতেই শুধু এরূপ আবহমণ্ডলের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। মঙ্গলের বায়ুস্তর অত্যন্ত পাতলা, তাই মঙ্গলের ফটোতে যে বায়ুস্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়বে একথা বিজ্ঞানীরা আগে কখনও ভাবেন নি। তাই তাঁরা প্রথমে খুবই অবাক হ'য়ে যান। কিন্তু

পর পর অনেকগুলি ফটোতেই আবহমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তাই এ সম্পর্কে আর সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নেই। আরও দেখা গেল, পৃথিবীর মতো মঙ্গলের বায়ুবলয়গুলিও তার নিরক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিত। এ ছাড়া মঙ্গলের উত্তর মেরু অঞ্চলে একপ্রকার ঘন মেঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। শরৎ ঋতুতে যে সাদা ও নীল মেঘের আবির্ভাব হয় এবং তা যে ইতস্তত-সঞ্চরণশীল তাও স্পষ্ট বোঝা গেছে। এই মেঘ নিয়ত-পরিবর্তনশীল, তাই তাদের ক্রিয়ায় গ্রহটির বহির্ভাগে নিত্য নূতন রূপ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া হলদে ফিল্‌টারের সাহায্যে হলদে রঙের আর একপ্রকার মেঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মেঘ দ্রুত-গতিশীল। অনেকের মতে, এ হ'ল একরকম ধুলোর ঝড়।

মঙ্গলের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা বলা হ'ল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, কিন্তু গোল বাধলো খাল সম্পর্কিত মতবাদ নিয়ে। ইটালীয় বিজ্ঞানী সিয়াপারেলি সর্বপ্রথম প্রচার করলেন যে, দূরবীণ দিয়ে মঙ্গল-পৃষ্ঠে তিনি অনেকগুলো সরু লম্বা দাগ দেখতে পেয়েছেন। ইটালীয় ভাষায় তিনি এদের নাম দিলেন canali, ইংরাজীতে এদের নাম হ'ল canals, অর্থাৎ কৃত্রিম খাল। আমেরিকার বিজ্ঞানী পিকারিং আবার এসব খালের আশেপাশে অনেক সবুজ অঞ্চল দেখতে পেলেন, তাই তাঁর ধারণা হ'ল যে, এসব খাল নিশ্চয়ই জলপূর্ণ এবং তাদের আশেপাশের সরস ভূমিতে প্রচুর গাছপালা রয়েছে, তাই তাদের এমন সবুজ দেখায়। এসব খবর যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি চিত্তাকর্ষক। কাজেই মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে খাঁটি খবর জানবার আগ্রহ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অত্যন্ত বেড়ে গেল। ১৮৯৪ সালে আমেরিকার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক লাওয়েল এজন্য অ্যারিজোনা প্রদেশে বিখ্যাত ফ্ল্যাগস্টাফ্ মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং নিজের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মঙ্গলগ্রহের রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। বহু বছর ধরে তিনি মঙ্গলগ্রহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং মঙ্গল-পৃষ্ঠের অনেকগুলি সুন্দর মানচিত্র তৈরি করলেন। তাঁর মতে এসব খালের

অনেকগুলি মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তা ছাড়া এদের অনেকগুলি একসঙ্গে মিলে এক একটা জ্যামিতিক চিত্র গঠন করেছে ব'লে মনে হয়। তার উপর এগুলি এমন সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো যে, স্বাভাবিকভাবে গঠিত খালের পক্ষে সেরূপ হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই এসব খাল কৃত্রিম না হ'য়েই পারে না।

কোন কোন জায়গায় একটা সবুজ অংশে চারদিক থেকে অনেকগুলো খাল এসে মিলিত হয়েছে। লাওয়েল এর নাম দিলেন Oasis বা মরূদ্যান। লাওয়েলের মতে মঙ্গলে জলের অত্যন্ত অভাব, কাজেই কৃষিকাজের সহায়তার জন্য এসব খাল কাটা হয়েছে, যাতে মেরুপ্রদেশের বরফ-গলা জল এসব খাল দিয়ে বয়ে গিয়ে মঙ্গলের উষর অঞ্চলে পৌঁছাতে পারে। এর ফলেই হয়তো মঙ্গলের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হয়েছে। বাকি যেসব অংশে জল-সেচের কোন ব্যবস্থা করা যায়নি সেসব অঞ্চলে কোন উদ্ভিদ্‌ও জন্মাতে পারেনি, তাই তাদের এমন মরুভূমির মতো চেহারা। আর ঋতু-পরিবর্তন হ'লেও সে চেহারার কোন পরিবর্তন হ'তে দেখা যায় না। পৃথিবীর যেসব অঞ্চল দারুণ জলাভাবের জন্য এককালে মরুভূমির মতো তৃণহীন ছিল তাদের অনেক জায়গায়ই কৃত্রিম খালের সাহায্যে জল-সেচের ব্যবস্থা ক'রে তাদের শস্য-শ্যামলা ও সমৃদ্ধিশালী করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই লাওয়েলের এই মতবাদ খুবই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয়। আর এটা যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া হয়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, মঙ্গলগ্রহে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উন্নতধরনের জীব নিশ্চয়ই আছে। না হ'লে এসব খাল কাটলো কে?

এসব চমকপ্রদ কাহিনী শুনবার পর এককালে জনসাধারণের মধ্যে খুবই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এবং মঙ্গলগ্রহের মানুষ সম্পর্কে নানারূপ কাল্পনিক কাহিনীও প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু বহু খ্যাতিমান জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী মঙ্গলগ্রহের ফটোতে এসব খালের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না, তাই তাঁরা এসব খালের অস্তিত্বের কথাই স্বীকার করলেন না। তাঁরা বললেন, আগেকার বিজ্ঞানীরা সব দৃষ্টিবিভ্রমের জন্য এরূপ খাল আছে ব'লে

কল্পনা করেছিলেন। বিরোধী দলের মতবাদ খণ্ডন করার জন্য তাই বিজ্ঞানী লাওয়েল আবার উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তিনি এসব খালের চিহ্নসহ মঙ্গলের একটা মানচিত্র আঁকলেন এবং তা অনেক দূরে রেখে দূরবীণের সাহায্যে তার ফটো তুললেন, যেমন গ্রহ-উপগ্রহের বেলায় করা হয়। এভাবে যে ফটো পাওয়া গেল, মঙ্গলের ফটোর সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল আছে দেখা গেল। এক্ষেত্রেও খালগুলির স্পষ্টরূপ প্রকাশ পেল না। দেখা গেল, সব মিলিয়ে যেন কতগুলি ঝাপসা কালো দাগ সৃষ্টি হয়েছে, মঙ্গলগ্রহের ফটোতে যেমন দেখা যায়। এজন্য তিনি বললেন, মঙ্গলগ্রহে অনেকগুলি বহুদূরবিস্তৃত খাল থাকলেও যে ফটোতে তাদের অস্তিত্ব ঠিকমতো ধরা পড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষেই তাঁর সুশিক্ষিত ও সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বহুদিন ধরে মঙ্গল-পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করার পর মঙ্গলের বাস্তব রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব, আর কারও পক্ষে নয়।

সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেভিদফ দীর্ঘকাল গবেষণার পর এই খালগুলি সম্পর্কে একটি নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। ১৯৬০ সালের ৬ই মার্চ তারিখের কম্‌সোমোল্‌স্কাইয়া প্রভদা নামক পত্রিকায় তাঁর এই মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে, মঙ্গলগ্রহে তরল জলের পরিমাণ পৃথিবীর তরল জলের সমান বা তার চেয়ে সামান্য বেশি। মঙ্গলগ্রহ সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে দূরে রয়েছে। তাই মঙ্গলগ্রহের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা সারা বছরে ১° থেকে ২০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠা-নামা করে। যে কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই কারণেই মঙ্গলগ্রহের অভ্যন্তরেও তাপের সৃষ্টি হয়। আর যত গভীরে যাওয়া যায় উষ্ণতা তত বৃদ্ধি পায়—আন্দাজ করা হয়েছে, উপরিতল থেকে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অগ্রসর হ'লে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেন্টিগ্রেড হিসেবে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। এই হিসেব অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহের উপরিতল থেকে আধ কিলোমিটার গভীরে যেরূপ তাপ ও চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা বরফ গলাবার পক্ষে যথেষ্ট।

দেভিদফের মতে উপরিতল থেকে নীচের দিকে আধ কিলোমিটার

ব্যবধানেই তাপ ও চাপের যেরূপ পার্থক্য ঘটে তার ফলে এই তুষারাবৃত জায়গাগুলিতে ভূমিকম্প ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়, আর সেজন্য গভীর ও সুদীর্ঘ ফাটলের সৃষ্টি হয়। তুষারস্তূপের ফাটলগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার কারণ্স্বরূপ তিনি বলেছেন, যেখানে ফাটল সৃষ্টি হয়, সেখানে অভ্যন্তর ভাগের তাপ ও চাপের এমন পুনর্বিন্যাস ঘটে, যাতে সেখানে দীর্ঘকালের মধ্যে নতুন কোন ভৌত পরিবর্তন ঘটে না। এজন্যেই পৃথিবী থেকে মঙ্গল-পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে দু-একটি নতুন খাল দেখা গেলেও, পুরাতন খালগুলির বিলুপ্তি বা পরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

তা ছাড়া মঙ্গল-পৃষ্ঠের বর্তমান ভৌত পরিবেশে এসব তুষারস্তরের ফাটলগুলির প্রান্তদেশ দিয়ে উদ্ভিদ্ জন্মানো খুবই সম্ভব। আর উদ্ভিদে ঢাকা এই অংশগুলিই হয়তো বরফের ফাটলের সঙ্গে মিশে কতকগুলি নিরবচ্ছিন্ন রেখার মতো দেখায়।

সুদীর্ঘকালের অনেক পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ফলে এখন প্রায় সকলেই মঙ্গল-পৃষ্ঠে কতগুলি দীর্ঘ কালো দাগের অস্তিত্বের কথা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু এর কারণ সম্বন্ধে আজও সকলে একমত হ'তে পারেননি। এগুলি স্বাভাবিক খাল না কৃত্রিম খাল কিংবা আদৌ খাল কিনা, এ সম্পর্কে জোর ক'রে কিছু বলা আজও সম্ভব হয়নি। তাই এ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনারও বিরাম নেই।

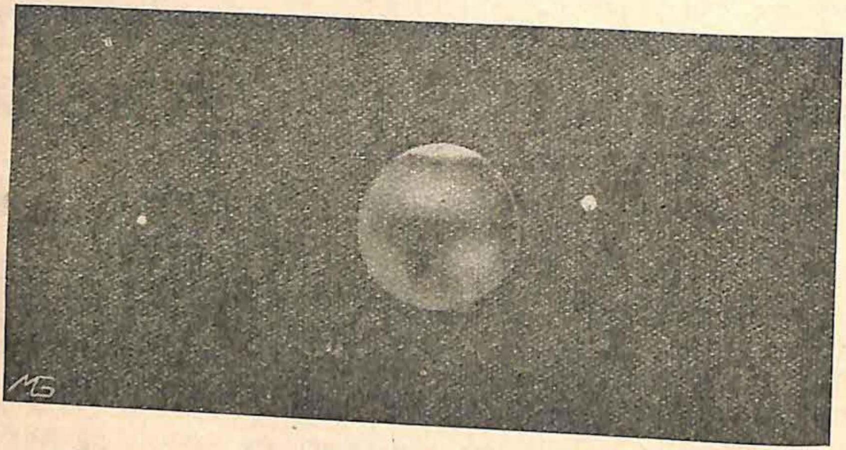
বর্তমানে মঙ্গলে জীব থাকার একটা প্রধান অন্তরায় এই যে, সেখানে অক্সিজেন একরূপ নেই বললেই চলে। মঙ্গল-পৃষ্ঠের অধিকাংশ জায়গাই অনেকটা পোড়া ইঁটের মতো লাল। কাজেই বিজ্ঞানীদের ধারণা, মঙ্গলের আবহমণ্ডলে এককালে যথেষ্ট অক্সিজেন ছিল, কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে ঐ অক্সিজেন ক্রমশ শিলায় প্রবেশ ক'রে তাদের নানারূপ অক্সাইডে পরিণত করেছে, যেমন অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে থাকলে লোহা লাল মরিচায় পরিণত হয়, অর্থাৎ লোহা অক্সাইডে পরিণত হয়। আর একটা কথা, ইঁট পোড়ালে যে লাল হয় তা আমরা জানি। এক্ষেত্রেও উত্তাপের প্রভাবে কাঁচা ইঁটের উপাদানগুলি নানারূপ অক্সাইডে পরিণত হয়। এসব

দেখে মনে হয়, মঙ্গল-পৃষ্ঠের শিলা সেখানকার আবহমণ্ডল থেকে অক্সিজেন প্রায় সবটাই শুষে নিয়েছে। কাজেই এখন মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর মতো কোন জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা চলে না। তবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মঙ্গল তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, কাজেই ক্রম-বিকাশের নিয়ম অনুসারে সেখানে এই দুঃসহ পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকবার মতো নূতন ধরনের জীবের আবির্ভাব হওয়া আশ্চর্য নয়। আর তা যদি সম্ভব না হ'য়ে থাকে তবে সেখান থেকে নিম্নস্তরের কতগুলি উদ্ভিদ্ ছাড়া বাকি সব রকম জীবই হয়তো চিরতরে লোপ পেয়ে গেছে।

মঙ্গল সম্বন্ধে এ-যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে আরও অনেক দূরে থাকায় গ্রহদের ক্রম-বিকাশের ধারায় পৃথিবীর চেয়ে মঙ্গল অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। আজ থেকে বহুযুগ আগেই মঙ্গল ঠাণ্ডা হ'য়ে জীবের বাসের উপযোগী হয়েছিল। সেসময় হয়তো পৃথিবীর মতো মঙ্গলগ্রহেও জীবের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তারা কালক্রমে সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছিল। জল-সেচের পরিকল্পনা এবং বহুদূরবিস্তৃত অসংখ্য খাল কাটা হয়তো এদেরই কীর্তি। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে মঙ্গল-গ্রহের জীবনধারা এগিয়ে চললো স্বাভাবিক নিয়মে। তারপর আরও অনেক হাজার বছর পরে সেখানে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কালো যবনিকা নেমে আসতে লাগলো। কালক্রমে উন্নততর জীব হয়তো সবই লোপ পেল, কিন্তু তাদের সভ্যতার নিদর্শন হয়তো সবই রয়ে গেল মঙ্গল-পৃষ্ঠে। মৃত্যুর করাল স্পর্শ এড়িয়ে আজও যারা বেঁচে আছে তাদেরই জীবন-বিকাশ হয়তো দেখা যাচ্ছে ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অতীতের সমৃদ্ধিশালী মঙ্গল হয়তো এভাবে বিগত সভ্যতার চিহ্ন বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে একটি মৃতজগতে পরিণত হ'তে চলেছে। আর মঙ্গলের জীবন-মৃত্যুর এই বিচিত্র কাহিনী হয়তো পৃথিবীর শেষ পরিণতি সম্পর্কেই নিষ্ঠুর ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

মঙ্গলের দু'টি চাঁদ আছে। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের এক রাতে বিজ্ঞানী আসফ হল ওয়াশিংটন মানমন্দির থেকে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, দু'টি আলোকবিন্দু যেন মঙ্গলের চারদিকে ঘুরছে।

নানারূপ পরীক্ষার ফলে শীগ্‌গিরই বোঝা গেল যে, এরা মঙ্গলের উপগ্রহ। রোমানদের যুদ্ধ-দেবতার নামানুসারে এই গ্রহটির ইংরাজী নাম দেওয়া হয়েছিল Mars। এই দেবতার দু'জন অনুচর ছিল—একটির নাম ফোবস্ (Phobos) অর্থাৎ ভয়, আর একটির নাম ডাইমস্ (Diemos) অর্থাৎ বিপ্লব।



চিত্র ৮৫। মঙ্গল ও তার দু'টি চাঁদ। কাছের অপেক্ষাকৃত বড় চাঁদটির নাম ফোবস্, আর দূরের ছোট চাঁদটির নাম ডাইমস্।

সেজন্য মঙ্গলের উপগ্রহ দু'টির নামও ফোবস্ ও ডাইমস্ রাখা হ'ল। উপগ্রহ দু'টোই খুব ছোট। ফোবসের ব্যাস প্রায় পনর মাইল, আর ডাইমসের ব্যাস তারও অর্ধেক। ফোবস্ মঙ্গল থেকে প্রায় ৪,০০০ মাইল দূরে থেকে তার চারদিকে প্রায় ৭½ ঘণ্টা সময়ে একবার ক'রে ঘুরে আসছে। ডাইমস্ রয়েছে প্রায় ১৩,০০০ মাইল দূরে। মঙ্গলের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে প্রায় ৩০ ঘণ্টা। ফোবস্ মঙ্গলের চারদিকে এত তাড়াতাড়ি ঘোরে যে, মঙ্গলের একদিন পূর্ণ হ'তে যে সময় লাগে তার মধ্যে এই চাঁদটি তিনবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলের একটা রাত শেষ হ'তে প্রায় ১২¼ ঘণ্টা সময় লাগে, অথচ মাত্র ৭½ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ফোবস্ একবার মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে। কাজেই মঙ্গলে গেলে দেখা যাবে, আকাশের তারাগুলি সব পুবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে, যেমন পৃথিবী থেকে

দেখা যায়, কিন্তু ফোবস্ পশ্চিমদিকে উঠে পুবদিকে অস্ত যাচ্ছে ব'লে মনে হবে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! আর একটা মজার কথা এই যে, মঙ্গল থেকে প্রতিরাতেই ফোবসের অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রভৃতি কলা-পরিবর্তন দেখা যাবে। সৌরজগতের আর কোন গ্রহে গেলেও এরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখা যাবে না।

মঙ্গলের চাঁদগুলি সম্পর্কে আরও একটা খবর উল্লেখ করার মতো। আগেই বলেছি যে, ১৮৭৭ সালে এই উপগ্রহ দু'টি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর প্রায় একশ' বছর আগেই সাহিত্যিক জোনাথন্ সুইফ্‌ট তাঁর 'গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স্' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহ সম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—লাপুতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের খুব ভালো দূরবীণ ছিল এবং তারা অপেক্ষাকৃত ছোট দু'টো তারা আবিষ্কার করলো, বরং উপগ্রহ বলাই ভালো, এরা মঙ্গলকে বেষ্টন ক'রে ঘুরছে। মূল গ্রহের কেন্দ্র থেকে কাছেরটির দূরত্ব তার ব্যাসের তিনগুণ, আর দূরেরটির পাঁচগুণ। প্রথমটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে দশ ঘণ্টায়, আর দ্বিতীয়টি সাড়ে একুশ ঘণ্টায়।"*

একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব ঘটনার এরকম অত্যাশ্চর্য মিল যে কি ক'রে হ'ল তা ভেবে অবাক হ'তে হয়!

গ্রহাণুপুঞ্জ

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল—এই গ্রহকয়টি পর পর সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রয়েছে। দু'টো গ্রহের মাঝেকার দূরত্ব কখনো পাঁচ কোটি মাইলের বেশি নয়। কিন্তু মঙ্গলের পরে আছে একটা বিস্তীর্ণতর শূন্যাঞ্চলের যতি। প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মাইলের ব্যবধানে রয়েছে বৃহস্পতি।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কেপ্‌লার। গ্রহদের কক্ষপথ সংক্রান্ত নিয়মকানুন তাঁরই আবিষ্কার। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে ঐ

* Gulliver's Travels—P. 176

বিরাট যতিটা কেপ্‌লারকে ভাবিয়ে তুললো। এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগলো। তাঁর সন্দেহ হ'ল, ঐ শূন্যতার মাঝে হয়তো আছে অজানা কোন গ্রহের যাত্রাপথ। হ'তে পারে গ্রহটি এত ছোট যে তাকে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর একজন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান এলার্ট বোডে (১৭৪৭-১৮২৬) দৃঢ়তর প্রত্যয়ের সঙ্গে সেই কথাই আবার ঘোষণা করলেন।

সাধারণভাবে দেখা যায়, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব যত বাড়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানও তত বেশি হয়। বোডে তখনকার জানা গ্রহগুলির দূরত্ব বের করবার একটা চমৎকার সংকেত আবিষ্কার করেন। এর নাম বোডের সূত্র (Bode's Law)। বোডের সূত্র কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তা নীচের তালিকা দেখলে সহজেই বোঝা যাবে।

৩নং তালিকা। **গ্রহসমূহের দূরত্ব**

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	?	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনস
	৪ ০	৪ ৩	৪ ৬	৪ ১২	৪ ২৪	৪ ৪৮	৪ ৯৬	৪ ১৯২
যোগফল	৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬
বোডের দূরত্ব	০·৪	০·৭	১·০	১·৬	২·৮	৫·২	১০·০	১৯·৬
প্রকৃত দূরত্ব (পৃথিবীর দূরত্বের কতগুণ)	০·৩৯	০·৭২	১·০	১·৫২	—	৫·২০	৯·৫৪	১৯·১৯

এক্ষেত্রে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১ ধরে সেই অনুপাতে অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। বোডের সূত্র অনুসারে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে একটি শূন্যস্থান রেখে, পর পর গ্রহগুলির নাম লেখা হ'ল, তারপর প্রত্যেক গ্রহের নীচে, শূন্যস্থান সহ, ৪ সংখ্যাটি লেখা হ'ল। এবার বুধের নীচে ০ এবং শুক্রের নীচে ৩ সংখ্যা লেখা হ'ল। এরপর ক্রমে বাঁদিকের

সংখ্যাটিকে দ্বিগুণ ক'রে বসানো হ'ল, যেমন, ৩×২=৬, ৬×২=১২, ইত্যাদি। এখন প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে অবস্থিত সংখ্যা দু'টি যোগ ক'রে তারপর দশ দিয়ে ভাগ করলেই বোডের দূরত্ব পাওয়া যায়।

উপরের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বোডের দূরত্বের সঙ্গে প্রকৃত দূরত্বের আশ্চর্য রকমের মিল আছে। বোডের সূত্রের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবুও উপরোক্ত সূত্রটি পর্যালোচনা ক'রে বোডের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে অজানা কোন গ্রহ নিশ্চয়ই আছে। নানাদেশের বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন, অনুসন্ধান সুরু হ'ল।



চিত্র ৮৬। বোডে

জার্মানীর ছোট্ট শহর লিনিয়েনথেল। ছ'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিলিত হলেন, পলাতক এই আসামীকে খুঁজে বের করার মহৎ সংকল্প নিয়ে। রসিক লোকেরা এই বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর নাম দিলেন 'আকাশ-পুলিস'। আসামী পলাতক আকাশের বহু কোটি মাইল দূরে, আর পুলিসের গতিবিধি সীমাবদ্ধ পৃথিবীর মাটিতে। অবস্থা বুঝে তাঁরা অস্ত্র হিসেবে বেছে নিলেন একটি শক্তিশালী দূরবীণ।

কথায় বলে, 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'। আকাশ-পুলিসদের বেলায়ও তাই হ'ল। জল্পনা-কল্পনা এবং তোড়জোড় করতেই অনেক সময় চলে গেল। ইউনিফর্ম এঁটে দল বেঁধে তাঁরা রওনা হলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা অকুস্থলে পৌঁছাবার আগেই আসামী ধরা পড়ে গেল একজন সাধারণ পথচারীর কাছে।

সিসিলির পালেরমো মানমন্দিরের পরিচালক পিয়াজি কিছুদিন ধরে

দূরবীণের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। উদ্দেশ্য আকাশের একটি নক্‌শা প্রস্তুত করা। ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি একটি নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পেলেন। কয়েকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ ক'রে বুঝলেন এর গতিবিধি মোটেই তারার মতো নয়। আজ এখানে, কালই সরে গেছে অনেক দূরে। অর্থাৎ, জ্যোতিষ্কটি এগিয়ে চলেছে সুস্পষ্ট দ্রুতগতিতে। কোন তারার স্বভাব তো এমন হ'তে পারে না! তাহ'লে ওটা কি কোন স্খলিত-পুচ্ছ ধূমকেতু? ভালো ক'রে কিছু বুঝবার আগেই জ্যোতিষ্কটি আবার হারিয়ে গেল মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে। কিন্তু পিয়াজি হাল ছাড়লেন না। দূরবীণ ছেড়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন হিসেব কষতে। বুঝলেন, ওটি আসলে একটি গ্রহ। প্রথম সাক্ষাতের ঠিক এক বছর পরে আবার এর দেখা পাওয়া গেল। তখন পরিচয়ের পরিধি আরও বাড়লো। হিসেব ক'রে দেখা গেল, আয়তনে এ অবিশ্বাস্য রকমের ছোট। এর ব্যাস মাত্র পাঁচশ' মাইল। অবস্থান মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে। সিসিলির দেবতার নামে এর নাম রাখা হ'ল 'সেরেজ'।

পিয়াজির এই আকস্মিক আবিষ্কারের ফলে আকাশ-পুলিসরা খুবই হতাশ হলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতটা তোড়জোড় যখন করা হয়েছে তখন হাল ছাড়লে চলবে কেন? প্রধান আসামীকে গ্রেপ্তার করার বাহাদুরী পাওয়া গেল না ঠিক, কিন্তু তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও তো মুখরক্ষা হয়। তাই তাঁরা আবার নূতন উদ্যমে অনুসন্ধান সুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের শ্রম সার্থক হ'ল। ১৮০২ সালের মার্চ মাসে তাঁদেরই একজন এইচ. ওল্‌বার্স আর একটি আসামীকে খুঁজে পেলেন। এরও অবস্থান মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষ-সীমানার মাঝে। ব্যাস আরও কম, তিনশ' মাইল। এর নাম দেওয়া হ'ল 'প্যালাস'।

প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে আকাশ-পুলিসরা আরও অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। এর ফলে ১৮০৪ সালে ধরা পড়লো জুনো, এর ব্যাস ১২০ মাইল। আর ১৮০৭ সালে ধরা পড়লো ভেস্তা, এর ব্যাস ২৪০ মাইল। এরপর সমস্ত আকাশটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও আকাশ-

পুলিসরা আর কোন আসামীর দেখা পেলেন না। ১৮১৫ সাল পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে হয়রান হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা দূরবীণ তুলে রাখলেন।

সেরেজ, প্যালাস, জুনো আর ভেস্তা, চারটি ক্ষুদে গ্রহ, বিজ্ঞানী নাম দিয়েছেন গ্রহাণু (Asteroid)। দল বেঁধে আছে তাই এদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ।

এরপর অনেকদিন সব চুপচাপ। নূতন কিছুই ঘটলো না। অবশেষে ১৮৩০ সালে প্রুসিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেংকে আর একটি গ্রহাণুর দেখা পেলেন। নাম দিলেন অ্যাস্ট্রিয়া। ব্যাস মাত্র ষাট মাইল।

এই আবিষ্কারের ফলে গ্রহাণুদের সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তাঁদের চেষ্টায় নিত্য নূতন গ্রহাণু আবিষ্কৃত হ'তে লাগলো। এর ফলে ১৮৯০ সালের মধ্যেই গ্রহাণুর মোট সংখ্যা দাঁড়ালো তিনশ'। এরপর আলোকচিত্রের সাহায্যে গ্রহাণু আবিষ্কারের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হ'ল। তাতে গ্রহাণুর সংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগলো। এভাবে ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার গ্রহাণুর কক্ষপথ সুনির্দিষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখনও প্রতিবছরই একটি দু'টি ক'রে নূতন গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। অনেকের অনুমান, গ্রহাণুর মোট সংখ্যা হবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, আগে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে ছিল একটিমাত্র বড় গ্রহ। কিন্তু প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ বা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে। আর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সেই অংশগুলিই ছড়িয়ে রয়েছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, অতীতের জ্বলন্ত বাষ্পরাশি থেকে এক-একটি বড় গ্রহের সৃষ্টি হ'লেও গ্রহাণুদের বেলায় হয়তো তা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ঘনীভূত হ'য়ে একটিমাত্র বড় গ্রহে পরিণত না হ'য়ে প্রাকৃতিক কোন কারণে হয়তো গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেছে, আর তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে ছোটবড় অসংখ্য গ্রহাণুর। এরাই এখন ছড়িয়ে রয়েছে মহাশূন্যের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি

সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির অবস্থান সূর্য থেকে প্রায় ৫০ কোটি মাইল দূরে। সৌরজগতের অন্য সবগুলি গ্রহ একত্রিত করলে যে আয়তন হয় বৃহস্পতির আয়তন তার দ্বিগুণেরও বেশি। পৃথিবীর সমান প্রায় ১,৩০০টি গ্রহ স্থান পেতে পারে বৃহস্পতির মধ্যে। তাইতো বাংলায় একে 'গ্রহরাজ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। রোমক দেবতাদের রাজা Jupiter, তারই নামানুসারে ইংরাজীতে এই গ্রহটির নামকরণ হয়েছে।

সূর্য থেকে বহুদূরে থাকলেও বৃহস্পতির অতি উজ্জ্বল রূপ সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিক শুক্র ও মঙ্গল ছাড়া অন্য যে-কোন গ্রহের চেয়েই একে অনেক বেশি জ্যোতিষ্মান্ দেখায়। এ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন একে সন্ধ্যাবেলা পুব আকাশে দেখা যায়, আর তখনই একে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা একে পশ্চিম আকাশে দেখা গেলে একে তত উজ্জ্বল ব'লে মনে হয় না। তার কারণ এ তখন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকে। বৃহস্পতির কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাইরে, কাজেই বৃহস্পতির উজ্জ্বলতম অবস্থায় তার এবং সূর্যের মাঝে থাকে পৃথিবী। তাই তখন বৃহস্পতি এবং সূর্যকে আকাশের বিপরীত দিকে দেখা যায়। পৃথিবীর উপর যে পরিমাণ সূর্যালোক পড়ে তার সাতাশ ভাগের একভাগ মাত্র আলো বৃহস্পতির উপর পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃহস্পতি এত উজ্জ্বল কেন? বিজ্ঞানীদের অনুমান, গ্রহটি মেঘের আবরণে ঢাকা, তাই এর উপর যতটা সূর্যের আলো পড়ে তার প্রায় সবটাই প্রতিফলিত হ'য়ে আসে। সেজন্য বৃহস্পতি এত উজ্জ্বল।

সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে ৪৮,৩২,০০,০০০ মাইল। এর পরিক্রমণ-কাল ১১ বছর ৩১৫ দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতির এক বছর পৃথিবীর প্রায় বারো বছরের সমান। কিন্তু এই গ্রহটি নিজের অক্ষের উপর অত্যন্ত দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে। একবার ঘুরতে এর লাগে মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট, অর্থাৎ

আমাদের একদিনে বৃহস্পতির প্রায় আড়াই দিন পূর্ণ হয়। এর ব্যাস



১৯১৩, ২৪শে জুলাই



১৯১৪, ২৩শে আগষ্ট



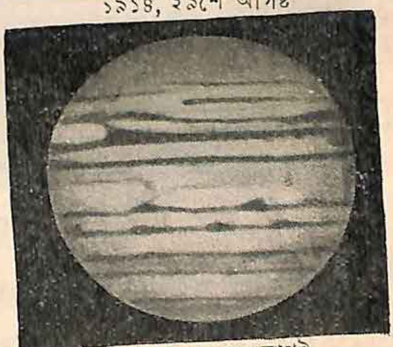
১৯১৩, ২৮শে আগষ্ট



১৯১৪, ২৯শে আগষ্ট



১৯১৩, ১২ই সেপ্টেম্বর

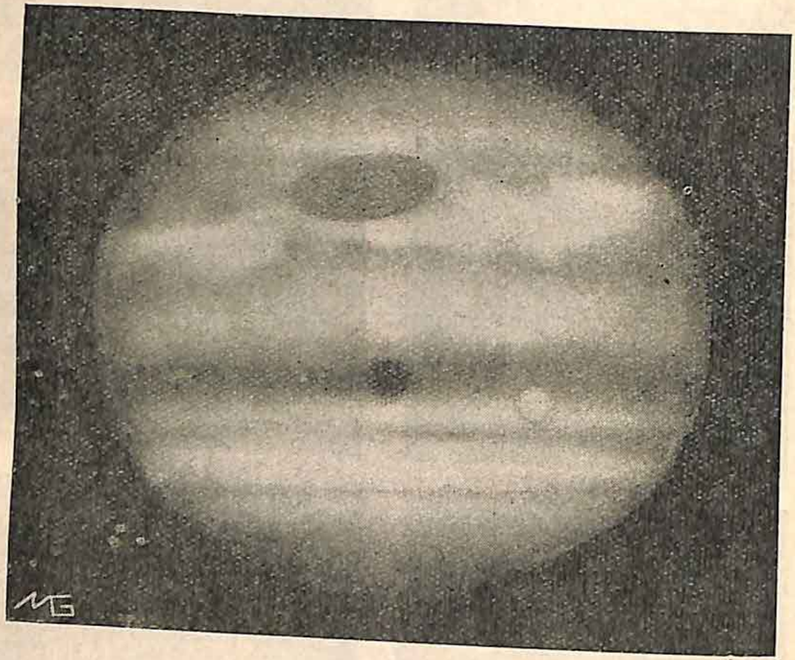


১৯১৪, ৩১শে আগষ্ট

চিত্র ৮৭। গ্রহরাজ বৃহস্পতির কয়েকটি আলোকচিত্র। বিভিন্ন চিত্রে মেঘের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এগারগুণ, কিন্তু খুব দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে ব'লে

পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতি উত্তর-দক্ষিণে আরও বেশি চাপা। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, পূর্ব-পশ্চিমের ব্যাস উত্তর-দক্ষিণের ব্যাসের চেয়ে আরও প্রায় $\frac{১}{১৫}$ ভাগ বড়। বৃহস্পতির নিরক্ষবৃত্ত তার কক্ষ-সমতলের সঙ্গে মাত্র তিন ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে অর্থাৎ বৃহস্পতি প্রায় তার কক্ষ-সমতলেই আবর্তিত হচ্ছে ব'লে মনে হয়, আর এই সমতল পৃথিবীর কক্ষ-সমতলের সঙ্গে মিশে গেছে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ১,৩০০ গুণ,



চিত্র ৮৮। বৃহস্পতি—১৯২৫

কিন্তু ওজন সেই অনুপাতে খুবই কম—পৃথিবীর ওজনের ৩১৭ গুণ মাত্র। এই হিসেবে বৃহস্পতির গড় ঘনত্ব জলের চেয়ে সামান্য বেশি হয়, জলের ঘনত্ব এক হ'লে এর ঘনত্ব দাঁড়ায় ১·৩।

দূরবীণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে যখন তখন বৃহস্পতির গায়ে অনেক কলঙ্ক-চিহ্ন দেখা যায়। মনে হয়, এর গায়ে যেন অনেকগুলি মেঘের পেটি (belt) সমান্তরালভাবে জড়ানো রয়েছে, আর তার মাঝে মাঝে রয়েছে

অনেক কালো কালো দাগ। প্রতিবছরই এসব পেটির সংখ্যা ও পরিসর বাড়ে বা কমে। যেভাবে এদের আকার ও স্থান পরিবর্তন হয় তাতে মনে হয় এগুলি মেঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব মেঘের মধ্যে নানারূপ বর্ণবৈচিত্র্যও দেখা যায়। এ ছাড়া একটি বিশাল ডিম্বাকৃতি লাল দাগ (The great red spot) চোখে পড়ে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এটি সর্বপ্রথম দেখা যায়, ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে। তারপর এর রং কখনো গাঢ় হয়,

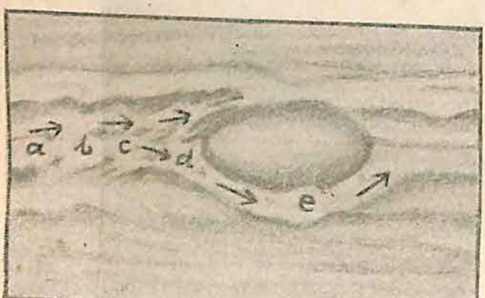


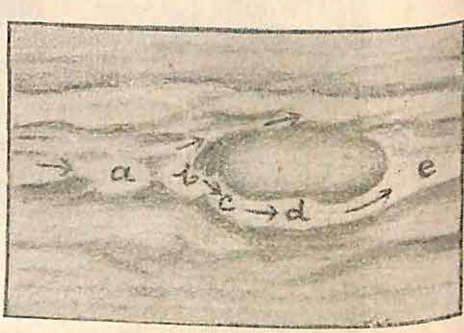
চিত্র ৮৯। বৃহস্পতি—১৯২৮

আবার কখনো ম্লান হয়, আবার কখনো হয়তো এটি একেবারে মিলিয়ে যায়। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দেই সর্বপ্রথম এর রং গাঢ় লাল ব'লে বর্ণিত হয়। তখন এই দাগটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০,০০০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৭,০০০ মাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এর আতঙ্কজনক লাল রং বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। লাল থেকে প্রথমে পাটলবর্ণ হয় এবং ১৮৯০ খৃস্টাব্দ থেকেই লাল রং অনেকখানি ম্লান হ'য়ে গেছে। ১৯৩৬ সালে আবার এর রং হঠাৎ

খুব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল অল্পদিনের জন্য। প্রায় দেড়শ' বছর ধরে এই কলঙ্ক-চিহ্নটি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আজও এর আকার বিশেষ বদলায়নি।

দূরবীণ দিয়ে বৃহস্পতি-পৃষ্ঠের দাগগুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে বোঝা গেছে যে, সূর্যের মতো বৃহস্পতিরও বিভিন্ন অংশের দাগগুলির ঘুরবার বেগ সমান নয়। মেরুপ্রদেশের দাগগুলির তুলনায় নিরক্ষরেখার নিকটে অবস্থিত দাগগুলি অনেক তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো একটা প্রবাহ ঘণ্টায় প্রায় ২৫০ মাইল বেগে নিরক্ষরেখার উপর দিয়ে অবিরত পুবদিকে ছুটে চলেছে। মেঘের এবং লাল দাগের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া বেশ লক্ষ্য করবার মতো। মেঘখণ্ড-গুলি দ্রুতবেগে লাল দাগটি অতিক্রম ক'রে যায়, আর সেসময় মেঘের





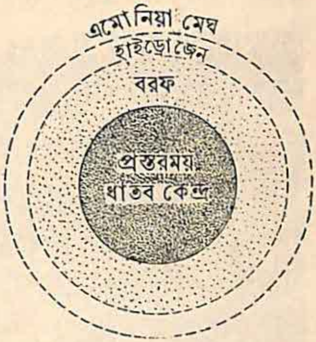
চিত্র ৯০। ১৯২৮ সালের ২রা এবং ৭ই নভেম্বর গৃহীত লাল দাগের সন্নিহিত অঞ্চলের দু'টি আলোকচিত্র অনুসারে অঙ্কিত। মেঘখণ্ডগুলি দ্রুতবেগে লাল দাগটি অতিক্রম ক'রে চলেছে।

প্রবাহ দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে লাল দাগের দু'পাশ দিয়ে চলে যায়। এজন্য অনেকেরই অনুমান যে, লাল দাগটি হয়তো কঠিন, নয়তো তরল কোন উপাদানে গঠিত, নতুবা মেঘখণ্ডগুলি এভাবে তাকে অতিক্রম ক'রে যেতে কখনই পারত না।

আয়তনের অনুপাতে বৃহস্পতির ওজন খুবই কম, তাই মনে হয় গ্রহটি প্রধানত খুব হালকা উপাদানে গঠিত। এতে খুব বেশি পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ এবং জল বা বরফ থাকলে এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। অনেকের

ধারণা, এর আবহমণ্ডল হয়তো কয়েক হাজার মাইল গভীর, কাজেই বাইরে থেকে এর আয়তন এত বড় দেখালেও ওজনটা সেই তুলনায় বেশি হয়নি।

বৃহস্পতির বর্ণালী পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেছে, এর আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়া (Ammonia) ও মিথেন (Methane) বা জলা-গ্যাস (Marsh gas) আছে। সূর্য থেকে বহুদূরে রয়েছে ব'লে এ খুব ঠাণ্ডা। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কখনো -২১৬° ফারেনহাইটের উপরে ওঠে না (৩২ ডিগ্রীর নীচেই জল জমে বরফ হয়, আর -১০৮ ডিগ্রীর নীচে অ্যামোনিয়া গ্যাস জমে বরফের মতো কঠিন হয়)। বৃহস্পতির গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ভিল্‌টের অনুমান এই যে, এর ব্যাসার্ধের শতকরা ১৮ ভাগ আবহমণ্ডল এবং তা প্রধানত হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাসের মিশ্রণ, আর সেই আবহমণ্ডলে সব সময় অ্যামোনিয়ার মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। এর নীচে ব্যাসার্ধের শতকরা ৩৯ ভাগে আছে কঠিন বরফ এবং তারও নীচে কেন্দ্র অবধি বাকি ৪৩ ভাগ সম্ভবত শিলাজাতীয় উপাদানে গঠিত। বৃহস্পতির আয়তন এবং ওজন এত বেশি ব'লে তার আকর্ষণী শক্তিও অত্যন্ত প্রবল। তাই মনে হয় এর সৃষ্টিকালে এর আবহমণ্ডলে যেসব গ্যাস ছিল তার কিছুই পালিয়ে যেতে পারেনি।



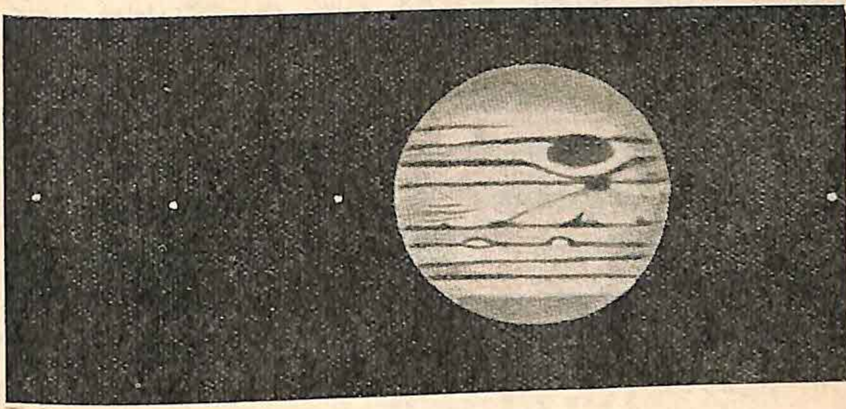
চিত্র ৯১। বৃহস্পতির গঠন

আমরা জানি, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে শৈত্যের প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণার সৃষ্টি হয় এবং বায়ুপ্রবাহে তা মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। বৃহস্পতির আবহমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরেও তেমনি অ্যামোনিয়া-মেঘের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেখানে তাপমাত্রা এত অস্বাভাবিক রকম কম যে, সেখানকার মেঘলোকে অ্যামেনিয়ার ছোট ছোট স্ফটিক বা কেলাস তৈরি হ'য়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর তার নিম্নস্তরের মেঘে রয়েছে বরফের কেলাস। বৃহস্পতি খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছে ব'লে সেখানে অবিরত প্রবল বায়ুপ্রবাহ দেখা দিচ্ছে,

সেজন্য উপরের মেঘগুলি কতগুলি পেটির আকার ধারণ করেছে এবং নীচের প্রবল বায়ুপ্রবাহে ক্রমাগত আলোড়িত হচ্ছে। মেঘগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন, সুদূর অতীতে হয়তো বৃহস্পতি-গর্ভ থেকে প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে গ্যাস বেরিয়ে এসেছিল তাই ঘনীভূত হ'য়ে এসব রঙিন মেঘের সৃষ্টি করেছে। এজাতীয় বিস্ফোরণের সময় গ্যাসের সঙ্গে কিছু কিছু ধাতব পদার্থ মিশে যাওয়া অসম্ভব নয়, আর তা যদি হ'য়ে থাকে তবে তারই ফলে মেঘগুলি নানা-প্রকার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হ'য়ে রয়েছে। নীচের আবহমণ্ডলের উপাদানের সঙ্গে এসব মেঘের উপাদানগত এবং অবস্থাগত পার্থক্য খুব বেশি ব'লেই সম্ভবত সুদীর্ঘকালের মধ্যেও এদের আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হ'তে পারেনি।

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সর্বপ্রথম দূরবীণ তৈরি করেন, ১৬১০ খৃস্টাব্দে। সেই বছর ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা তিনি নবনির্মিত এই দূরবীণ দিয়ে বৃহস্পতিকে দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। এতকাল যে গ্রহটিকে একটা উজ্জ্বলতারার মতো মনে হ'ত তাকেই এখন একটা আলোর চাক্‌তির মতো দেখা গেল। কিন্তু বৃহস্পতি তো একা নয়! তার কাছাকাছি নক্ষত্রের মতো আলোক-বিন্দু আরও চারটি দেখা গেল। কৌতূহলী বিজ্ঞানী এই দূরবীণ দিয়ে রাতের পর রাত জেগে বৃহস্পতি এবং তার সঙ্গীদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এরা সকলেই বৃহস্পতির চাঁদ এবং একটা নির্দিষ্ট নিয়মে এরা বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরছে। এই দেখে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর একটা নূতন ধারণা হ'ল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, সূর্যকে কেন্দ্র ক'রেই গ্রহগুলি সব ঘোরে। কোন গ্রহের চাঁদ থাকলে সেই চাঁদ আবার মূল গ্রহটির চারদিকে ঘোরে। এতকাল মানুষের ধারণা ছিল যে, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র সবই পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে তারই চারদিকে ঘুরছে। তাই গ্যালিলিও নানাদেশের পণ্ডিতদের ডেকে তাঁর এই দূরবীণ দিয়ে বৃহস্পতি ও তার চাঁদগুলি দেখালেন এবং সৌরজগৎ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা

করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন কেউই তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। অনেকেই তাঁকে পাগল ব'লে উপহাস করলো। কেউ কেউ বললো, তিনি যাদু জানেন এবং তাঁর এই বিচিত্র যন্ত্রটির সাহায্যে যাদুবিদ্যা দেখাচ্ছেন। এজন্য তাঁকে অনেক অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হ'ল। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।



চিত্র ৯২। বৃহস্পতি ও তার চারটি চাঁদ

এর কিছুকাল পরে বিজ্ঞানী সাইমন মারিয়াসও এই চাঁদগুলি লক্ষ্য করেন এবং এদের নাম দেন যথাক্রমে আইয়ো (Io), ইউরোপা (Europa), গ্যানিমেড (Ganymede) এবং ক্যালিস্টো (Callisto)—এখনও এরা সেসব নামেই পরিচিত।

উপগ্রহ চারটিকে বৃহস্পতির দু'পাশে একই রেখায় অবস্থিত দেখা যায়। ঘুরতে ঘুরতে একটি উপগ্রহ যখন বৃহস্পতির সামনে আসে (in transit) তখন তার ছোট্ট ছায়াটি পড়ে বৃহস্পতির উপর। আবার উপগ্রহটি যখন বৃহস্পতির ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে তখন পৃথিবী থেকে তার গ্রহণ (eclipse) হ'তে দেখা যায়, আবার উপগ্রহটি যখন বৃহস্পতির পেছনে চলে যায়, তখনও তাকে আর পৃথিবী থেকে দেখা যায় না (occulted)। এই উপগ্রহ কয়টির মধ্যে আইয়ো রয়েছে বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে। বৃহস্পতি থেকে এর দূরত্ব হ'ল ২,৬২,০০০ মাইল। এর

আয়তন চাঁদের চেয়ে একটু বেশি, কিন্তু বৃহস্পতির চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে মাত্র ১ দিন ১৮½ ঘণ্টা, অর্থাৎ মহাশূন্যে এই উপগ্রহটির গতিবেগ চাঁদের তুলনায় অনেক বেশি। দ্বিতীয় উপগ্রহ ইউরোপা আইয়োর চেয়ে ছোট কিন্তু সে তুলনায় বেশ উজ্জ্বল। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, ইউরোপার পৃষ্ঠে যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পড়ে তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই প্রতিফলিত হ'য়ে আসে। অনেকের ধারণা যে, ইউরোপার উপরিভাগে চকচকে কোন পদার্থের আবরণ আছে, তাই তাকে এত উজ্জ্বল দেখায়। তৃতীয় উপগ্রহ গ্যানিমেডের আয়তন প্রায় মঙ্গলগ্রহের সমান। এই উপগ্রহটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য এবং অত্যন্ত শীতল। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির মধ্যে ক্যালিস্টোই সবচেয়ে বড়। এর আয়তন গ্যানিমেডের চেয়েও একটু বড়, কিন্তু এর ওজন চাঁদেরও প্রায় অর্ধেক। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে ক্যালিস্টো একটি অতি মনোরম তুষার-গোলকবিশেষ। এর কেন্দ্রের কিছুটা অংশ হয়তো কঠিন শিলা দিয়ে গঠিত, কিন্তু তার চারদিকে রয়েছে আলতোভাবে সঞ্চিত নরম তুষারের আবরণ।

৪নং তালিকা। **বৃহস্পতির প্রধান চারটি উপগ্রহের বিবরণ**

উপগ্রহ	দূরত্ব (মাইল)	ব্যাস (মাইল)	পরিক্রমণ-কাল দিন	ঘণ্টা	মিনিট
আইয়ো	২,৬২,০০	২,৪৭০	১	১৮	২৮
ইউরোপা	৪,১৭,০০০	২,০৬০	৩	১৩	১৪
গ্যানিমেড	৬,৬৪,০০০	৩,৫৮০	৭	৩	৪৩
ক্যালিস্টো	১১,৬৯,০০০	৩,৩৬০	১৬	১৬	৩২

প্রায় ২৮২ বছর পরে, ১৮৯২ খৃস্টাব্দে, বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী বার্নার্ড। এই চাঁদটিই অবশ্য বৃহস্পতির সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত। ইহা ১,১৩,০০০ মাইল দূর দিয়ে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময়ে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। আজ পর্যন্ত বৃহস্পতির মোট

বারোটি চাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছে। সব শেষের চাঁদটি আবিষ্কৃত হয়েছে, ১৯৫১ খৃস্টাব্দে। পূর্বোক্ত চারটি উপগ্রহ বাদে অন্যগুলি খুব ছোট, তাদের ব্যাস ১৫ মাইল থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে। অষ্টম, নবম এবং একাদশ উপগ্রহের বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য উপগ্রহের গতি যেখানে বামাবর্তী (anti-clock-wise) সেখানে এদের গতি হ'ল দক্ষিণাবর্তী (clock-wise)। কেউ কেউ মনে করেন যে, এরা আগে গ্রহাণুপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত এক-একটি গ্রহাণু ছিল। ঘুরতে ঘুরতে দৈবাৎ এরা গ্রহরাজ বৃহস্পতির আকর্ষণের গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে বৃহস্পতি তাদের আপনার রাজ্যের অধিকারভুক্ত ক'রে নেয়। সেই থেকে এরা বৃহস্পতির আকর্ষণে বাঁধা পড়ে এক-একটি উপগ্রহরূপে তারই চারদিকে ঘুরছে। তাই অন্যান্য উপগ্রহের গতির সঙ্গে এদের গতির কোন সামঞ্জস্য নেই।

বলয়ধারী শনি

আকাশে যা-কিছু দীপ্তিমান আমাদের দেশে তাই দেবতাজ্ঞানে পূজিত হয়। আর সেজন্যই বোধহয় আমাদের দেশে দেবতার সংখ্যাও তেত্রিশ কোটি। এক-একটি জ্যোতিষ্ক হ'ল এক-একটি দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে শনির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পূজা করার বিধি প্রচলিত হয়েছে। পুরাণের নানা গল্প থেকে জানা যায় যে, শনি দেবতার তেজ অতি ভয়ংকর। তাঁর দৃষ্টি যার উপর পড়ে তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ঋষিগণ মনে করতেন, তিনি প্রসন্ন থাকলে কোন ভয় থাকে না। এজন্য তাঁর স্তুতি হ'ত এবং তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ হ'ত। কিন্তু আধুনিক কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, শনি বেচারীর বৃথাই এই অপবাদ, তাই একে ভয় ক'রে চলবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। শনি একটি গ্রহমাত্র, অন্যান্য গ্রহের মতো নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে সে অবিরত সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খালি চোখে শনিকে একটা উজ্জ্বল তারার মতো দেখায়, কিন্তু দূরবীণ দিয়ে দেখলে উজ্জ্বল নীলাভ বলয়মণ্ডিত শনির উজ্জ্বল সোনালী রূপ উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়বিমুগ্ধ হ'তে হয়। মনে হয়, কোন শিল্পী যেন তুলি দিয়ে আকাশের পটে শনির অপূর্ব সৌন্দর্য এঁকে রেখেছেন। আকাশে আজ পর্যন্ত যতগুলি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে শনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক'রে আছে। বাস্তবিক শনির অপূর্ব সৌন্দর্যের সঙ্গে একমাত্র নীহারিকা ছাড়া আর কোন জ্যোতিষ্কেরই তুলনা হয় না।

আয়তন ও ওজন অনুসারে বৃহস্পতির পরই শনির স্থান। এর



চিত্র ৯৩। শনি ও তার বলয়
শনির দু'টি আলোকচিত্র। শনিপৃষ্ঠে বড় সাদা দাগ লক্ষণীয়।

আয়তন পৃথিবীর ৭৩৪ গুণ, কিন্তু ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র। পৃথিবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব যেখানে ৫·৫ সেখানে শনির আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ০·৭, অর্থাৎ জলের চেয়েও কম। শনিকে যদি কোন বিশাল সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যেত তাহ'লে সে ডুবে না গিয়ে ভেসে থাকত। গ্রহদের মধ্যে শনিই সবচেয়ে হালকা।

সূর্য থেকে শনির দূরত্ব প্রায় ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে প্রায় ২৯½ বছর। এজন্য একবছর পরে শনিকে আকাশে প্রায় ১২° পুবদিকে সরে যেতে দেখা যায়। আমাদের প্রায় ১০¼ ঘণ্টা সময়েই শনির একদিন পূর্ণ হয়। নিজের মেরুদণ্ডের উপর এত তাড়াতাড়ি ঘুরছে ব'লে শনির উত্তর-দক্ষিণ বেশ চাপা। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, এর পুব-পশ্চিমের ব্যাস ৭৪,১০০ মাইল, কিন্তু

উত্তর-দক্ষিণের ব্যাস ৬৬,৩০০ মাইল। শনিদেহের সকল অংশ কিন্তু সমান বেগে ঘোরে না, মাঝের অংশ মেরুঅঞ্চলের স্থানগুলির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘোরে। সূর্য এবং বৃহস্পতির বেলায়ও এই বিশেষত্বটুকু চোখে পড়ে। এই দেখে মনে হয়, শনির আবহমণ্ডলও খুব গভীর। শনিও মেঘের আবরণে ঢাকা, আর শনি খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছে তাই বৃহস্পতির মতো শনি-পৃষ্ঠেও এসব মেঘ কতগুলি পেটির আকার ধারণ করেছে। শনির গায়ে মাঝে মাঝে সাদা দাগ দেখা যায়। ১৯৩৩ সালে এরকম একটা বড় দাগ খুব স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, কিন্তু একবছর পরেই সেটা মিলিয়ে যায় এবং তার বদলে একটা উজ্জ্বল সাদা পেটির সৃষ্টি হয়। শনি-পৃষ্ঠে এরূপ যেসব পরিবর্তন দেখা যায় তার সঙ্গে বৃহস্পতির অনুরূপ পরিবর্তনের খুব সাদৃশ্য আছে।

বৃহস্পতির চেয়ে শনি আরও বেশি ঠাণ্ডা। শনি-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কখনই -২৪৩° ফারেনহাইটের উপরে ওঠে না। শনির আবহমণ্ডলেও মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে বৃহস্পতির তুলনায় এখানে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কিছু কম। এর কারণস্বরূপ বিজ্ঞানীরা বলেন, শনি বেশি ঠাণ্ডা ব'লে তার আবহমণ্ডল থেকে আরও বেশি অ্যামোনিয়া ঘনীভূত হ'য়ে মেঘের সৃষ্টি করেছে অথবা জমে বরফের মতো কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে, তাই সেখানকার আবহমণ্ডল থেকে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ আরও কমে গেছে। আর তাপমাত্রা খুব কম ব'লে সেখানকার আবহমণ্ডলে ঝড়-তুফান বা ঐরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাবল্য অনেক কম। তাই বৃহস্পতির তুলনায় শনির দাগগুলির বৈচিত্র্যও অনেক কম, আর এসব দাগের আকৃতি বদলাতে সময়ও লাগে অনেক বেশি। বিজ্ঞানী ভিল্‌টের মতে শনির আবহমণ্ডল প্রায় ১৬,০০০ মাইল গভীর আর তার নীচে শনির সবটা জল জমে বরফ হ'য়ে প্রায় ৬,০০০ মাইল পুরু একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রের ধাতব পদার্থ দিয়ে গঠিত কঠিন পিণ্ডটির ওজন শনির মোট ওজনের দশভাগের একভাগ মাত্র হওয়া সম্ভব। কাজেই মনে হয়, পিণ্ডটির ব্যাসার্ধ ১৪,০০০ মাইলের চেয়ে বেশি নয়। ভিল্‌টের

মতে, বৃহস্পতি ও শনির গঠনে সাদৃশ্য খুবই বেশি, যদিও বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণে কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে।

বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস ও নেপ্‌চুন এই চারটি গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় অনেক বড় ও ভারি। বিজ্ঞানীদের মতে এদের মধ্যে গঠনমূলক সাদৃশ্য খুবই বেশি। পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সঙ্গে শনির অথবা অন্যান্য বৃহৎ গ্রহগুলির আবহমণ্ডলের এত পার্থক্য হ'ল কি ক'রে? সৃষ্টির পরে বৃহৎ গ্রহগুলি যখন তাদের প্রাথমিক তাপ হারিয়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'তে লাগলো তখন তাদের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন হ'ল তা এখন নিশ্চয় ক'রে বলা খুবই কঠিন। কিন্তু অনুমান করতে দোষ কি? বৃহৎ গ্রহের অভিকর্ষ অত্যন্ত প্রবল। তাদের মধ্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ছিল তার সবটাই তারা আজও ধরে রাখতে পেরেছে, কিন্তু উত্তপ্ত পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে হাইড্রোজেন ছিল তার প্রায় সবটাই কালক্রমে মুক্তি লাভ ক'রে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে।



চিত্র ৯৪। শনির গঠন

উত্তপ্ত গ্রহটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'য়ে এমন অবস্থায় পৌঁছালো যখন কোন কোন উপাদানের তরলীভবন সম্ভব হ'ল। গ্রহ যত ঠাণ্ডা হ'তে লাগলো তত নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটতে লাগলো। যেমন অক্সিজেন-যুক্ত লৌহ (আয়রণ অক্সাইড) উচ্চতাপে হাইড্রোজেনের সংস্পর্শে আসার ফলে অক্সিজেন-মুক্ত হ'য়ে ধাতব লৌহে পরিণত হ'ল। এভাবে যেসব ধাতব পদার্থের সৃষ্টি হ'ল সেগুলি তরল পদার্থরূপে অন্তস্তলে বিরাজ করতে লাগলো। অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সৃষ্টি করলো বাষ্প। আবার বাষ্পের সঙ্গে উত্তপ্ত কার্বনের (অঙ্গার) বিক্রিয়া ঘটায় সৃষ্টি হ'ল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও হাইড্রোজেন। তাপ আরও কমলে অনুকূল অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় মিথেন বা জলা-গ্যাস। তাপ আরও হ্রাস পেলে আবহমণ্ডলের

নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অ্যামোনিয়া গাস সৃষ্টি করে। এভাবে গ্রহে হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা কৈফিয়ত দেওয়া যায়।

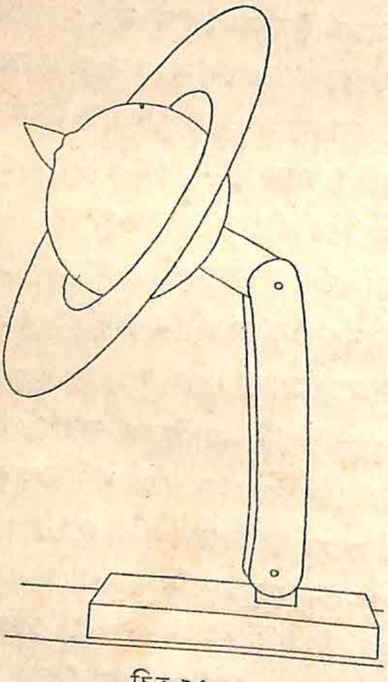
গ্রহটি আরও ঠাণ্ডা হ'লে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে সুগভীর মহাসাগরে পরিণত হ'ল, আর এই মহাসাগর অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রায় সবটাই শুষে নিল। এর ফলে আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ অনেক হ্রাস পেল। তাপমাত্রা আরও কমে গেলে মহাসাগরের জল ও অ্যামোনিয়া জমাট বেঁধে বরফ ও অ্যামোনিয়ার একটি সুগভীর আবরণ সৃষ্টি করলো।

শনিগ্রহে জীবের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন হয়তো অনেকেরই মনে জাগবে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, সৌরজগতের এই সুদূর এবং ভয়াবহরূপ হিমশীতল জগতে জীবনের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। তা ছাড়া ১৬,০০০ মাইল উঁচু আবহমণ্ডলের প্রচণ্ড চাপও জীবের অস্তিত্বের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। শুধু যে এসব কারণেই জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব তা নয়, সেখানে হিমশীতল কঠিন অ্যামোনিয়া ও বরফের স্তরের উপরে যে আবহমণ্ডল আছে তাতে না আছে অক্সিজেন, না আছে জলীয় বাষ্প, আছে শুধু বিষাক্ত মিথেন গ্যাস এবং হাইড্রোজেন। এর উপর যতদিন যাচ্ছে শনি তত বেশি ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়ছে। কাজেই সব মিলিয়ে গ্রহটিতে জীবের বাসের পক্ষে এমন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানে বর্তমানে কোন জীব আছে ব'লে তো মনে করা যায়ই না, উপরন্তু সেখানে নূতন ক'রে জীবন অঙ্কুরিত হ'তে পারে এমন কথাও কখনই সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না।

১৬১০ খৃস্টাব্দে, বৃহস্পতির উপগ্রহ চারটি আবিষ্কার করার পর, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও শনির দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং শনির অদ্ভুত আকৃতি দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। তাঁর দূরবীণটি ছিল খুবই ছোট, তাই তার শক্তিও ছিল খুবই পরিমিত। তাঁর মনে হ'ল, শনির হু'পাশে যেন ছোট হু'টো আলোর চাক্তি দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন পরেই কিন্তু এই চাক্তি হু'টো আর দেখা গেল না। গ্যালিলিও অবাক হ'য়ে ভাবলেন "তবে কি পৌরাণিক কাহিনীই সত্য হ'ল—শনি কি সত্য সত্যই তার সন্তান হু'টিকে

গ্রাস করে ফেললো ?" কিন্তু এর কিছুদিন পরে যখন চাক্‌তি ছ'টো আবার দেখা দিল, তখন তিনি এর কোন কারণ বুঝতে পারলেন না। দূরবীণের আরও উন্নতি হ'তে ক্রমে বোঝা গেল, শনির চারদিকে রয়েছে একটি বলয়। দূরবীণের যত উন্নতি হ'তে লাগলো শনির বলয়ের রূপও তত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে লাগলো। শেষে বিজ্ঞানী হাইগেন্‌স্‌ই সর্বপ্রথম বলয়ের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারলেন এবং কক্ষপথে শনির বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে বলয়ের আকৃতিতে যে পরিবর্তন হয় তাও পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।

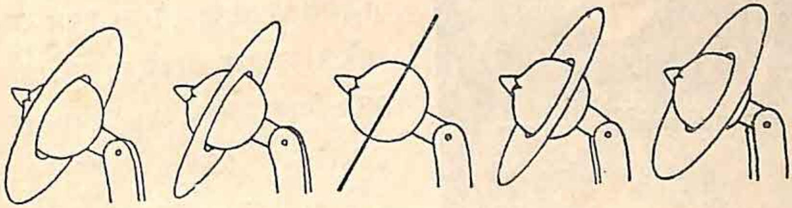
শনির বলয় তার কক্ষপথের সঙ্গে এক সমতলে নেই, ২৮° কোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে। কাজেই শনি যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন কক্ষপথের বিভিন্ন স্থানে শনির অবস্থান অনুসারে পৃথিবী থেকে বলয়ের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। এই বলয় এত পাতলা যে, এর কোন বেধ নেই বললেই চলে। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে শনির লাগে ২৯½ বছর, এই সময়ের মধ্যে ছ'বার (যেমন ১৯৫০ এবং ১৯৬৬ সালে) এই বলয় একপাশ থেকে দেখার সুযোগ হয়। তখন একে এত সরু একটি রেখার মতো দেখায় যে, কয়েক দিনের জন্য বলয়টি একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। এর মাঝামাঝি সময়ে (যেমন ১৯৫৮ সালে) একে সবচেয়ে প্রসারিত অবস্থায় দেখা যায়।



চিত্র ৯৫

শনির বলয়গুলির আকৃতি কেন বদলে যায় তা একটা সহজ পরীক্ষার সাহায্যে অনায়াসে বোঝা যাবে। ইঁটের আকারের খানিকটা মাটির তাল টেবিলের উপর রাখা হ'ল। ছ'টি ফলা আছে এমন একটি ছুরি নেওয়া হ'ল, আর তার একটা ফলার

উপরে একটা কমলালেবু এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। এবার ছুরির অন্য ফলাটি মাটির উপর চেপে বসিয়ে দিতে হবে যাতে কমলালেবুসহ ছুরিটি একটু হেলানোভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন একটা গোলাকার পিচ্‌বোর্ডের মাঝখান থেকে খানিকটা গোল অংশ কেটে বের ক'রে নিয়ে তাকে লেবুটির উপর চেপে বসিয়ে দিতে হবে, যাতে পিচ্‌বোর্ডের টুকরোটি আংটির মতো লেবুর সঙ্গে আটকে থাকে। টেবিল এবং মাটির তালের উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যে টেবিলের সামনে দাঁড়ালে কমলালেবুর

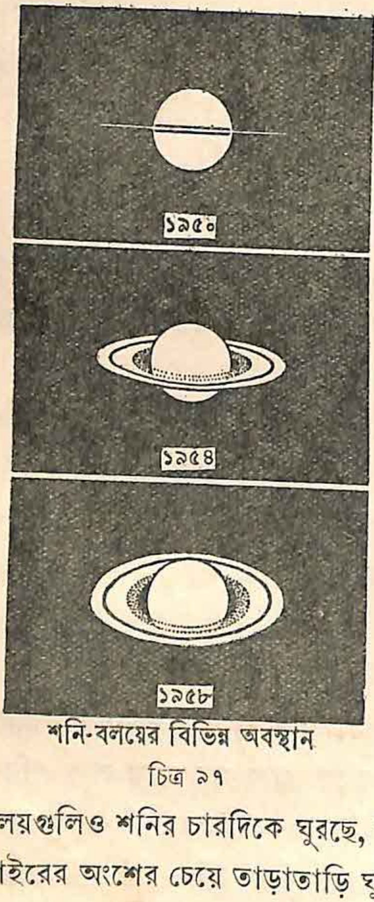


চিত্র ৯৬

মাঝখানটা ঠিক চোখের সামনে থাকে। এবার টেবিলের চারপাশে ঘুরতে থাকলে বিভিন্ন অবস্থানে চাক্‌তিটির বিভিন্ন রূপ সহজেই বোঝা যাবে। কখনো চাক্‌তির উপরদিক আর কখনো নীচের দিক দেখা যাবে। আবার গোল কমলালেবুর চারদিকে চাক্‌তিটি কখনো চাকার মতো, আবার কখনো রেখার মতো দেখা যাবে।

ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে শনিকে বেষ্টন ক'রে আছে পর পর তিনটি বলয়, একটি নয়। এদের মধ্যে মাঝেরটি খুব উজ্জ্বল, বেশি পরিমাণ সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় ব'লে একে সব সময় প্রায় শনির মতোই উজ্জ্বল দেখায়। বাইরের বলয়টিও বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু সবচেয়ে ভেতরের বলয়টি বেশ স্বচ্ছ, তাই তত উজ্জ্বল নয়। বাইরের বলয়টি প্রস্থে প্রায় ১০,০০০ মাইল, মাঝেরটি প্রস্থে প্রায় ১৬,০০০ মাইল ; আর এদের মধ্যে আছে প্রায় ১০০০ মাইল মুক্ত আকাশ। ভেতরের বলয়টি প্রস্থে প্রায় ১১,৫০০ মাইল, এর ভেতরের পরিধি-রেখা শনি-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭,০০০ মাইল দূরে রয়েছে। অন্তর্বলয় ও মধ্যবলয়ের মাঝেও খানিকটা

শূন্যস্থান আছে। শনিকে খুব স্পষ্টভাবে দেখার সুযোগ হ'লে বোঝা যায় যে, এই বলয়গুলিও অবিচ্ছিন্ন নয়। তাদের মধ্যেও আবার গোলাকার কালো দাগ দেখা যায়। তবে মধ্যবলয় এবং বহির্বলয়ের মাঝের শূন্যস্থানের তুলনায় এসব দাগের প্রস্থ খুবই কম। বলয়গুলি সবই কিন্তু খুব পাতলা, অর্থাৎ এদের বেধ দশ মাইলের বেশি নয়। কক্ষপথে গ্রহটির বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে পৃথিবী থেকে কখনো বলয়গুলির উপরিতল আর কখনো নিম্নতল দেখা যায়, কিন্তু যখন বলয়-গুলির সমতল আমাদের দৃষ্টিরেখার সঙ্গে মিলে যায় তখন তাদের একটি রেখার মতো দেখায়। দূরবীণ খুব শক্তিশালী না হ'লে এ অবস্থায় বলয়গুলি একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। তখন শনি-পৃষ্ঠে বলয়গুলির যে ছায়া পড়ে, তাই শুধু দেখা যায়। গ্যালিলিওর দূরবীণ খুব ছোট ছিল ব'লে তিনি এ অবস্থায় বলয়গুলিকে দেখতে পাননি। বলয়গুলির বেধ অত্যন্ত কম ব'লেই এটা সম্ভব হয়।



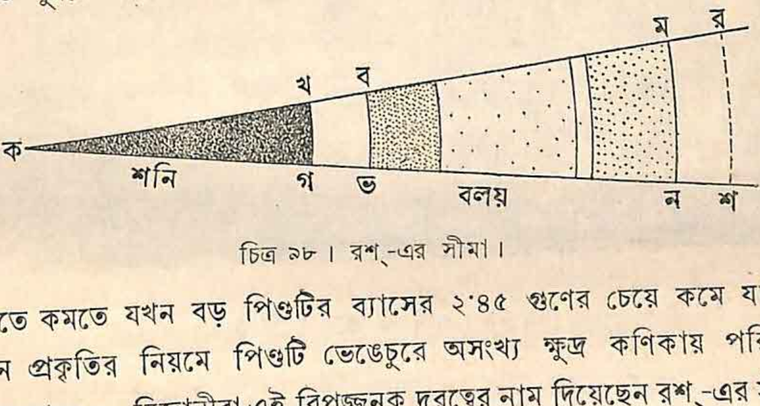
শনি-বলয়ের বিভিন্ন অবস্থান

চিত্র ৯৭

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে কীলার (Keeler) সাহেব লক্ষ্য করেন যে, বলয়গুলিও শনির চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু প্রত্যেকটি বলয়ের ভেতরের অংশ বাইরের অংশের চেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরছে। এতেই বোঝা যায় যে, এই বলয় ধাতব পাতের মতো পাতলা অবিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি হ'তে পারে না, কারণ তাহ'লে বলয়ের সকল অংশ একই সমান তালে ঘুরত। জড়-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে শনির অত কাছে অবিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের চাকতি ঐভাবে ঘোরার কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, ঐ অবস্থায় দূরবর্তী অংশের

চেয়ে নিকটবর্তী অংশের উপর এত বেশি বল প্রযুক্ত হবে যে, তার ফলে চাক্‌তিটি ভেঙে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হ'য়ে পড়বে। শনির বলয় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জড়কণা দ্বারা গঠিত তার আর একটা বড় প্রমাণ এই যে, অন্তর্বলয়ের ভেতর দিয়ে অনেক সময় শনি-পৃষ্ঠ আবছায়া ভাবে দেখা যায়, অথবা বলয়ের পেছনে উজ্জ্বল তারা থাকলে বলয়ের ভেতর দিয়েও তাকে দেখা যায়, যেমন পাতলা রেশমের কাপড়ের ভেতর দিয়ে পেছনের জিনিস দেখা সম্ভব হয়।

বলয়গুলির সৃষ্টি হ'ল কিভাবে? এর একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী রশ্ (Roche)। ধরা যাক, দু'টি জড়পিণ্ড আছে। তার একটি খুব বড় এবং অন্যটি ছোট, আর ছোটটি বড়টির চারদিকে ঘুরছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছোটটির কক্ষের ব্যাস ক্রমশ কমতে থাকবে, আর তা

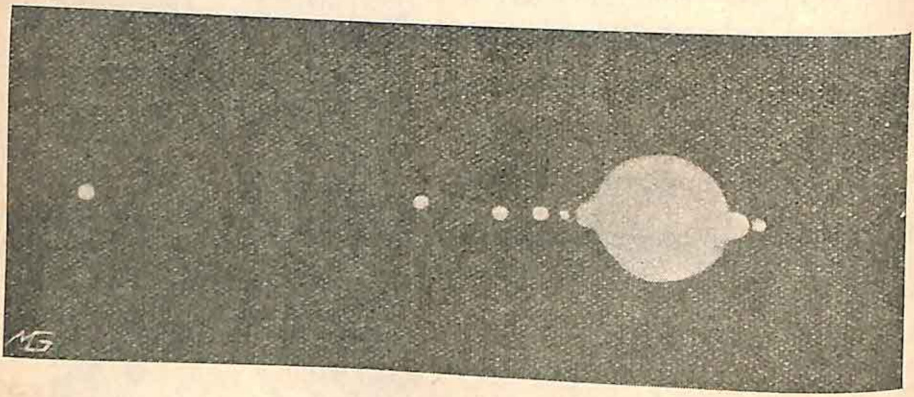


চিত্র ৯৮। রশ্-এর সীমা।

কমতে কমতে যখন বড় পিণ্ডটির ব্যাসের ২·৪৫ গুণের চেয়ে কমে যাবে, তখন প্রকৃতির নিয়মে পিণ্ডটি ভেঙেচুরে অসংখ্য ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হ'তে বাধ্য। বিজ্ঞানীরা এই বিপজ্জনক দূরত্বের নাম দিয়েছেন রশ্-এর সীমা (Roche's limit)। হিসেব ক'রে দেখা গেল, শনির সবচেয়ে বড় বলয়টির বাইরের ব্যাস শনির ব্যাসের মাত্র ২·৩ গুণ। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা শনির নিকটতম চাঁদটি হয়তো সুদূর অতীতে রশ্-এর সীমা অতিক্রম ক'রে আরও কাছে এসে পড়েছিল, তাই তা ভেঙেচুরে বলয়ের আকার ধারণ করেছে। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে পৃথক তিনটি চাঁদ থেকে শনির তিনটি বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে বোঝা গেছে যে, একটিমাত্র চাঁদ থেকেই তিনটি বলয়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। প্রথমে বলয় হয়তো

একটিই ছিল, কিন্তু শনির নিকটতম উপগ্রহগুলির প্রভাবে ক্রমে বলয়গুলির মাঝে মাঝে ঐসব শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, তাই তাদের এখন তিনটি পৃথক বলয়রূপে দেখা যাচ্ছে।

বলয় তিনটি ছাড়া শনির আরও নয়টি চাঁদ আছে। এদের মধ্যে মাইমস্ শনির সবচেয়ে কাছে রয়েছে। এর কক্ষের ব্যাস শনির ব্যাসের প্রায় ৩·১ গুণ, অর্থাৎ এ এখনও রশ্-এর সীমা অতিক্রম করেনি। জ্যাপিটাস নামক চাঁদটির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, চাঁদের মতো এরও একটা পিঠই সব সময় শনির দিকে ফেরানো থাকে। কাজেই বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী



চিত্র ৯৯। শনি ও তার ছয়টি চাঁদ।

থেকে এর বিভিন্ন দিক্ দেখা যায়, কিন্তু এর মধ্যে এই চাঁদটির ঔজ্জ্বল্য পাঁচগুণ বেড়ে যায় এবং তারপর কমে আবার আগের মতোই হয়। এর অর্থ এই যে, এর একপিঠ থেকে যতটা সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় অন্যপিঠ থেকে প্রতিফলিত হয় তার প্রায় পাঁচগুণ। কাজেই মনে হয়, এর একটা পিঠ হয়তো কোন দুর্ঘটনার ফলে বিবর্ণ বা বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছে, তাই সে-পিঠ থেকে বেশি সূর্যালোক প্রতিফলিত হ'তে পারে না।

শনির উপগ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে দূরে আছে ফীবি। ৮০,৩৪,০০০ মাইল দূরে থেকে এ ঘড়ির কাঁটার গতিতে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে।

কিছুদিন আগেও সৌরজগতে এটিই দক্ষিণাবর্তী গতির একমাত্র উদাহরণ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আরও কয়েকটি দক্ষিণাবর্তী উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে।

৫নং তালিকা। **শনির উপগ্রহগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি**

উপগ্রহের নাম	দূরত্ব (মাইল)	ব্যাস (মাইল)	পরিক্রমণ-কাল		
			দিন	ঘণ্টা	মিনিট
মাইমস্	১,১৩,০০০	৫০০	০	২২	৩৭
এনসেলাডস্	১,৪৮,০০০	৫০০	১	৮	৫৩
টেথিস	১,৮৩,০০০	৮০০	১	২১	১৯
ডাইওন	২,৩৪,০০০	৮০০	২	১৭	৪১
হুয়া	৩,২৭,০০০		৪	১২	২৫
টাইটান	৭,৫৯,০০০	৩,০০০	১৫	২২	৪১
হাইপারিয়ন	৯,২০,০০০		২১	৬	৩৮
জ্যাপিটাস	২২,১০,০০০		৭৯	৭	৫৬
ফীবি	৮০,৩৪,০০০		৫৫০	১০	৩৫

ইউরেনস

এতদিন পর্যন্ত সৌরজগতের ছয়টি গ্রহের কথা জানা ছিল। ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্শেল আর একটি গ্রহ আবিষ্কার করলেন। তখন তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত বাথ-এর একজন নামকরা গায়ক, অবসর সময়ে শখ ক'রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। অনেকদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম ক'রে নিজেই একটি বড় দূরবীণ বানালেন। এ দিয়ে তিনি এবং তাঁর বোন ক্যারোলিন নিয়মিতভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর একটা ভালো নক্শা তৈরি করবেন।

ঐ বছর ১৩ই মার্চ রাত্রে মিথুন রাশির নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করার সময় একটি জ্যোতিষ্ক হার্শেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একে আশেপাশের নক্ষত্রের চেয়ে একটু বড় এবং একটা চাক্‌তির মতো দেখালো। সাধারণ লোকে হয়তো একে একটি নক্ষত্র ব'লেই মনে করতো, কিন্তু হার্শেল ভুল করলেন না। কিছুদিন ধরে ক্রমাগত এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি নিশ্চিত বুঝলেন যে, এটি একটি নূতন গ্রহ। তাঁর এই আবিষ্কারে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। নানাদেশের বিজ্ঞানীরা ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে হার্শেলের মত সমর্থন করলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নামানুসারে হার্শেল এই গ্রহটির নামকরণ করলেন 'জর্জিয়াম সাইডাস' (Georgium Sidus)। একজন ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ প্রস্তাব করলেন যে, আবিষ্কর্তার নামানুসারে এর নাম দেওয়া হোক 'হার্শেল', কিন্তু একজন মানুষের নামে একটি জ্যোতিষ্কের নামকরণ হোক এ প্রস্তাব কারও মনঃপূত হ'ল না। শেষে বার্লিন মানমন্দিরের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বোডে অন্যান্য গ্রহের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে এর নাম দিলেন 'ইউরেনস'। গ্রীক পুরাণে ইউরেনস হ'লেন শনির পিতা। বলা বাহুল্য, এই নূতন নামটি জ্যোতির্বিদ্ মহলে সাদরে গৃহীত হ'ল।



চিত্র ১০০। হার্শেল

এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে দেখা গেল, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌রা ১৬৯০ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে সেই সময় পর্যন্ত আকাশের যেসব মানচিত্র

তৈরি করেছেন, তাদের মধ্যে অন্তত ১৭ বার এই জ্যোতিষ্কটির অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় সকলেই একে ভ্রমবশত নক্ষত্র ব'লে মনে করেছেন। তবে এই মানচিত্রগুলি পরীক্ষা ক'রে একটা লাভ হ'ল যে, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এই গ্রহটির কক্ষপথ, পরিক্রমণকাল প্রভৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হ'ল, যদিও সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৭৭ কোটি মাইল এবং সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে প্রায় ৮৪ বছর।

খালি চোখে একে একটি খুব ম্লান তারার মতো দেখায়। দূরবীণ দিয়ে দেখলে অবশ্য একে একটি আলোর চাক্‌তির মতো মনে হয়। বৃহস্পতি এবং শনির মতো এই গ্রহটিরও আয়তনের অনুপাতে ওজন খুব কম। এর ব্যাস ৩২,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ৪ গুণ। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৬৪ গুণ, আর ওজন পৃথিবীর প্রায় ১৫ গুণ মাত্র। সেই হিসেবে এর ঘনত্ব প্রায় বৃহস্পতির ঘনত্বের সমান দাঁড়ায়। আর বৃহস্পতির মতো এও নিজের অক্ষের উপর খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছে, এর আবর্তনকাল মাত্র ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছে ব'লে এরও উত্তর-দক্ষিণ বেশ চাপা।

পৃথিবীর নিরক্ষরেখা তার কক্ষ-সমতলের সঙ্গে প্রায় ২৩½ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে, কিন্তু ইউরেনসের নিরক্ষরেখা তার কক্ষ-সমতলের সঙ্গে প্রায় ৯৮° কোণ সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ দু'টি সমতল পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমকোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে। এজন্য গ্রহটির অবস্থান অনুসারে তার উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতেও সূর্যালোক লম্বভাবে পড়তে পারে। এর ফলে গ্রহটির সর্বত্রই ঋতু-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর একটা মজার কথা এই যে, পৃথিবীর পরিক্রমণ এবং আবর্তন গতি দু'টোই বামাবর্তী অর্থাৎ একমুখী, কিন্তু ইউরেনসের বেলায় এই দুই গতি বিপরীতমুখী, অর্থাৎ পরিক্রমণ-গতি বামাবর্তী হ'লেও তার আবর্তন-গতি দক্ষিণাবর্তী। আজও এর কারণ নির্দেশ করা যায়নি।

ইউরেনস-পৃষ্ঠে অনেক মেঘের পেটি এবং তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে কালো কালো দাগ দেখা যায়। এর আলোক প্রতিফলন করবার ক্ষমতা

খুব বেশি, তাই মনে হয় এরও আবহমণ্ডল খুব গভীর এবং তা সব সময় মেঘের আবরণে ঢাকা থাকে। এর আবহমণ্ডলে মিথেনের পরিমাণ খুব বেশি কিন্তু অ্যামোনিয়া অত্যন্ত কম। পৃথিবীর তুলনায় ইউরেনস সূর্য থেকে আরও অনেক দূরে আছে তাই পৃথিবী যতটা সূর্যকিরণ পায় তার $\frac{১}{৪০০}$ ভাগ মাত্র ইউরেনস পায়, তাই তার দেহ অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা। ইউরেনস-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা –৩০০° ফারেনহাইটের উপরে ওঠে না, এই তাপমাত্রায় পৃথিবীর বায়ুও ঘনীভূত হ'য়ে তরল বায়ুতে পরিণত হয়। কাজেই দারুণ শৈত্যের প্রভাবে ইউরেনসের আবহমণ্ডল থেকে যে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ আরও অনেক কমে গেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর ইউরেনস এত ঠাণ্ডা ব'লে সেখানকার মেঘমণ্ডলে বিশেষ কোন আলোড়ন বা পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

ইউরেনসের মোট চারটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে এগুলি সবই এত ম্লান যে খুব শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্য ছাড়া তাদের দেখা যায় না। গ্রহটি যেমন দক্ষিণাবর্তী-গতিতে আবর্তিত হচ্ছে উপগ্রহগুলিও তেমনি দক্ষিণাবর্তী-গতিতে তাকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের ব্যাস প্রায় ৪০০ থেকে ১০০০ মাইলের মধ্যে।

নেপচুন

সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কারের কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরেনস আবিষ্কৃত হবার পর বিজ্ঞানীরা তার কক্ষ এবং সেই পথে তার গতি প্রভৃতি অঙ্ক কষে বের ক'রে ফেললেন। কিন্তু গণিতের সাহায্যে যে গতি বেরুলো আকাশে দৃষ্ট ইউরেনসের গতির সঙ্গে তার কিছু কিছু গরমিল হ'তে লাগলো। ১৮৪৫ সালের মধ্যে এই পার্থক্যের পরিমাণ যা দাঁড়ালো তা অবশ্য খালি চোখে ধরা সম্ভব নয়, কিন্তু এই সামান্য গরমিলটুকুও বিজ্ঞানীদের কাছে

অসহ্য ব'লে মনে হ'ল। অনেকেরই ধারণা হ'ল যে, কোন অজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণেই হয়তো ইউরেনসের গতির এরূপ গরমিল হচ্ছে।

ইংরেজ বিজ্ঞানী অ্যাডাম্স এবং ফরাসী বিজ্ঞানী লেভেরিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হিসেব করতে বসলেন, অনাবিষ্কৃত গ্রহটির ওজন কিরূপ হওয়া উচিত এবং তা আকাশের কোথায় থাকলে ইউরেনসের গতিতে উপরোক্ত গরমিল হওয়া সম্ভব। লেভেরিয়ের গণনা শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগেই অ্যাডাম্স-এর গণনা শেষ হ'ল। তাঁর গণনার ফলাফল জানিয়ে তিনি ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী চ্যালিসকে এই অজ্ঞাত গ্রহটির সন্ধান করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। দুঃখের বিষয় তখন ইংলণ্ডে নক্ষত্রমণ্ডলের ভালো নক্‌শা ছিল না ব'লে অনুসন্ধানের কাজে দেরি হ'তে লাগলো। কাজেই চ্যালিস প্রথমে কেম্ব্রিজের মানমন্দিরে বসে আকাশের ঐ অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত নক্ষত্রের নক্‌শা প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল, কিছুদিন পর পর ঐ নক্ষত্রমণ্ডলের নক্‌শা লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, কোন জ্যোতিষ্ক স্থানচ্যুত হ'ল কিনা, অথবা নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হ'ল কিনা। তাহ'লে সেটিই অজ্ঞাত গ্রহটির সন্ধান দেবে। বলা বাহুল্য, তাঁর এই কষ্টসাধ্য কাজে খুবই বিলম্ব হ'তে লাগলো এবং খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তিনি এই কাজে বেশিদূর অগ্রসর হবার আগেই খবর পেলেন যে, ইতিমধ্যে বার্লিন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালে এই অজ্ঞাত গ্রহটি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন।



চিত্র ১০১। অ্যাডাম্স্

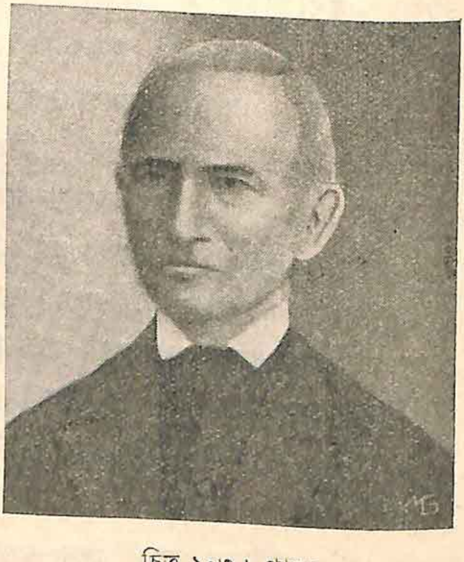
১৮৪৬ খৃস্টাব্দে গণনা শেষ হওয়া মাত্র লেভেরিয়ে এই অজ্ঞাত

গ্রহটির অবস্থান নির্দেশ ক'রে বিজ্ঞানী গালে-কে জানান এবং তা খুঁজে বের করার জন্য অনুরোধ জানান। খবর পেয়ে সেই রাতেই গালে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার্লিন মানমন্দিরে নক্ষত্র-মণ্ডলের খুব ভালো নক্‌শা ছিল, কাজেই গালে খুব সহজেই বুঝতে পারলেন যে, লেভেরিয়েরর নির্দেশিত নক্ষত্র-মণ্ডলে সত্য সত্যই একটি নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছে। দূরবীণের সাহায্যে একে নক্ষত্রের তুলনায় খানিকটা বড় একটা আলোর চাক্‌তির মতো দেখা গেল। কাজেই এটাই যে সেই অনাবিষ্কৃত গ্রহ তাতে আর গালের কোন সন্দেহ রইল না। গ্রহটি মহাকাশের গহিন আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই রোমক সমুদ্রদেবতার নামানুসারে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নেপচুন' (Neptune)।



চিত্র ১০২। লেভেরিয়ে

নেপচুন আবিষ্কৃত হবার পর চ্যালিস তাঁর নক্‌শাগুলি পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন যে, আরও একটু মনোযোগী এবং সতর্ক হ'লে অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করার চতুর্থ



চিত্র ১০৩। গালে

দিনেই তিনি এই অজ্ঞাত গ্রহটি আবিষ্কার করতে পারতেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই নির্মম পরিহাস যে, যশোলক্ষ্মী তাঁর ঘরের দুয়ারে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। এজন্য হয়তো তাঁকে সারা জীবন ধরে অনুতাপ করতে হয়েছে। আর চ্যালিস-এর অকৃতকার্যতার ফল অ্যাডাম্‌স-এর পক্ষে নিশ্চয়ই হৃদয়বিদারক হয়েছিল। একটা বিরাট আশা নিয়ে তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার শেষ পরিণতি যে এমন হতাশাব্যঞ্জক হবে তা তিনি কখনো কল্পনা করতে পারেননি। কতদিন আগে থেকেই যে তিনি এই আবিষ্কারের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ডায়েরী থেকে। ১৮৪১ সালের ৩রা জুলাই এতে লেখা হয়েছিল—"এই সপ্তাহের গোড়াতেই স্থির করলাম যে ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করবার পরই ইউরেনসের গতিবিধির ব্যতিক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যাব, কেননা আজ পর্যন্ত এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই হয়নি। এই ব্যতিক্রম ইউরেনস থেকে দূরে অবস্থিত অনাবিষ্কৃত অপর কোন গ্রহের প্রভাবেই হচ্ছে কিনা সেটা দেখাই হবে আমার উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে সম্ভব হ'লে সেই গ্রহটির গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি আমাকে নির্ণয় করতে হবে, আর সেই ফলাফল থেকেই হয়তো গ্রহটিকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।"

বিজ্ঞানী অ্যাডাম্‌স-এর জন্য সত্যই দুঃখ হয়, কারণ তাঁর কাজে তো কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। তবে ভরসার কথা এই যে, বিজ্ঞানজগতে আজও খানিকটা সততা আছে তাই নেপচুন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার কৃতিত্ব এখন অ্যাডাম্‌স এবং লেভেরিয়েকে সমভাবেই দেওয়া হয়। শুধু গণিতের হিসেবের উপর নির্ভর ক'রে একটি গ্রহ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এই বিশ্বজগৎ যে একটি শৃঙ্খলা বা নিয়মের বাঁধনে টিকে আছে সে বিশ্বাস এখন শতগুণ বেড়ে গেছে।

সূর্য থেকে নেপচুনের গড় দূরত্ব হ'ল প্রায় ২৭৮ কোটি মাইল এবং সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর প্রায় ১৬৪ বছর লাগে। এর ব্যাস প্রায় ৩১,০০০ মাইল, অর্থাৎ আয়তনে এ ইউরেনসের চেয়ে সামান্য ছোট।

এর ওজন পৃথিবীর প্রায় ১৭$\frac{১}{৪}$ গুণ, আয়তনের অনুপাতে এ ইউরেনসের চেয়ে একটু ভারি। নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরতে এর প্রায় ১৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট লাগে। দ্রুত ঘুরছে ব'লে এও উত্তর-দক্ষিণে বেশ চাপা।

ইউরেনস এবং নেপচুনের মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, বিজ্ঞানীরা অনেক সময় এদের যমজ সন্তান ব'লে উল্লেখ করেন, অবশ্য যমজ দৈত্য বলাই সঙ্গত। এ ইউরেনসের চেয়ে আরও দূরে রয়েছে, কাজেই পৃথিবীতে আমরা যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পাই তার প্রায় $\frac{১}{৯০০}$ অংশ মাত্র নেপচুনে পৌঁছায়। আর এজন্য নেপচুন আরও বেশি ঠাণ্ডা, এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কখনো -৩৩০° ফারেনহাইটের উপরে ওঠে না। নেপচুনের দেহও সম্ভবত সব সময় গভীর মেঘে ঢাকা থাকে। বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনসের মতো এর আবহমণ্ডলেও মিথেন ও অ্যামোনিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গ্রহটি আরও অনেক দূরে রয়েছে তাই এর আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়ার ভাগ আরও কম। বৃহস্পতি থেকে আরম্ভ ক'রে নেপচুন পর্যন্ত গ্রহগুলির দূরত্ব যেমন বেড়েছে তাদের আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণও তেমনি ক্রমশ কমে গেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস এবং নেপচুন এই অতিকায় চারটি গ্রহের মধ্যে সাদৃশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তাদের সবেরই আয়তন খুবই বেশি কিন্তু সেই তুলনায় ওজন খুবই কম। এর ফলে তাদের ঘনত্বও প্রায় একরকম, যেমন—বৃহস্পতির ঘনত্ব ১·৩৪, শনির ০·৭১, ইউরেনসের ১·২৭ এবং নেপচুনের ১·৫৮। এদের তুলনায় পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি খুবই ভারি। অতিকায় গ্রহগুলি সবই খুব দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে, তাদের দেহ গভীর আবহমণ্ডল ও মেঘে ঢাকা। তা ছাড়া এদের সবার আবহমণ্ডলেই মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তবে সূর্য থেকে এজাতীয় গ্রহের দূরত্ব যত বেড়েছে তার আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণ তত কমে গেছে। তার কারণ দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও কমে গেছে, আর শৈত্যের প্রভাবে গ্রহটির আবহ-

মণ্ডল থেকে বেশি পরিমাণ অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘনীভূত হ'য়ে অপসারিত হয়েছে। বাস্তবিক এসব অতিকায় গ্রহের আয়তন, ওজন এবং উপাদানের সঙ্গে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলির আয়তন, ওজন প্রভৃতির এত প্রভেদ যে, তারা সবাই যে একসঙ্গে সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত হ'ল কি ক'রে সে প্রশ্নের মীমাংসা করা আজও সম্ভব হয়নি।

আজ পর্যন্ত নেপচুনের একটিমাত্র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, এর নাম 'ট্রিটন'। এ আমাদের চাঁদের চেয়ে একটু বড়, কিন্তু বহুদূরে আছে ব'লে একে খুব নিষ্প্রভ দেখায়। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এর ব্যাস প্রায় ৩০০০ মাইল। নেপচুনের আবর্তন-গতি বামাবর্তী অথচ তার উপগ্রহটি দক্ষিণাবর্তী-গতিতে তাকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহ এবং তার উপগ্রহের গতিতে এমন গুরুতর অসামঞ্জস্য কি ক'রে হ'ল তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত বিজ্ঞানীরা আজও দিতে পারেননি।

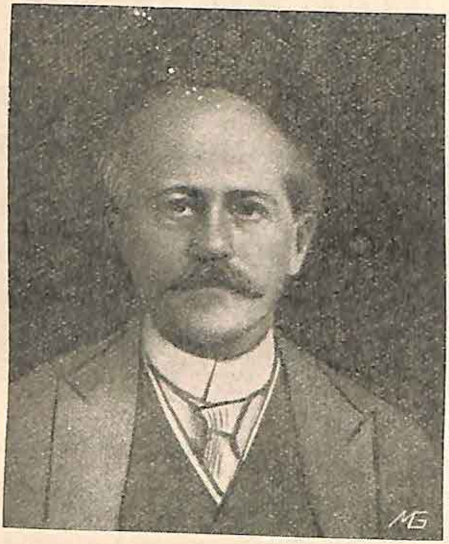
প্লুটো

গণিতের হিসেবের উপর নির্ভর ক'রে যেমন নেপচুন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, সৌরজগতের নবম ও শেষ গ্রহ প্লুটোও ঠিক সেই উপায়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার ফ্ল্যাগ্‌স্টাফ মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পার্সিভ্যাল লাওয়েল সর্বপ্রথম নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে আরও কোন গ্রহ থাকা সম্ভব কিনা তাই নির্ধারণ করতে উৎসাহী হলেন। তিনি হিসেব ক'রে দেখলেন যে, তখনকার জানা সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসেব ক'রেও ইউরেনসের গতির অসামঞ্জস্য ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যায় না। নেপচুনের বাইরে অন্য কোন গ্রহ থাকলে তবেই এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। তাঁর গণনার বিস্তৃত বিবরণ ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হ'ল, যদিও ১৯০৫ সাল থেকেই তিনি এই অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বিজ্ঞানী লাওয়েলই যে এই অজানা গ্রহটির কথা ভাবছিলেন তা নয়,

বিজ্ঞানী পিকারিংও ইউরেনসের গতি পর্যবেক্ষণ ক'রে ১৯০৯ সালে এরূপ একটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। এর পরে নেপচুনের গতি পর্যবেক্ষণ ক'রে ১৯১৯ সালে তিনি আর একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে তিনি অজানা গ্রহটির ওজন, ঔজ্জ্বল্য এবং দূরত্ব সম্বন্ধে আরও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

দুঃখের বিষয় পার্সিভ্যাল লাওয়েল যে অনুসন্ধানকার্য সুরু করেছিলেন তা সাফল্যমণ্ডিত হবার আগেই, ১৯১৬ সালে, তাঁর মৃত্যু হ'ল। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা এই দুরূহ অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই কাজের সুবিধার জন্য প্রায় চব্বিশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২৯ সালে, লাওয়েল মানমন্দিরে ১৩ ইঞ্চি ব্যাসের একটি নূতন দূরবীণ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তরুণ গবেষক টমবাউ-এর উপর আকাশের সম্ভাব্য অঞ্চলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পর্যবেক্ষণ করার ভার পড়লো। এক বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৩০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে, টমবাউ নেপচুনের চেয়ে দূরে অবস্থিত নূতন গ্রহটির সন্ধান পেলেন। তাঁর আবিষ্কারের কথা সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম ক'রে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই সবদেশের বিজ্ঞানীরা একে নবাবিষ্কৃত গ্রহ ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন।

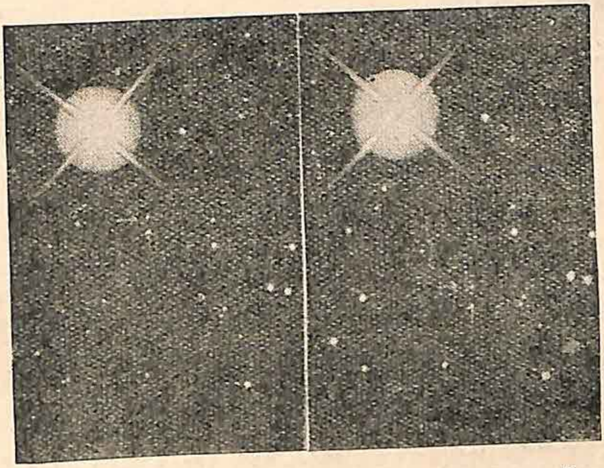


চিত্র ১০৪। পার্সিভ্যাল লাওয়েল

এই গ্রহটি সৌরজগতের শেষ সীমায় তমসাবৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অন্ধকার পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর নামানুসারে এর নামকরণ হ'ল। Pluto নামের প্রথম দু'টি অক্ষর P এবং L আর

যে বিজ্ঞানী (Percival Lowell) এই গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন তাঁরও নামের আগুক্ষর দু'টি হ'ল P এবং L, কাজেই সৌরজগতের এই নূতন গ্রহটির নামকরণ সবদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে বলা যায়।

সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব গড়ে প্রায় ৩৬৭ কোটি মাইল। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর প্রায় ২৪৮ বছর লাগে। এর কক্ষ উপবৃত্তাকার এবং বেশ লম্বাটে, আর এই কক্ষের যে অংশ সূর্যের নিকটবর্তী তা নেপচুনের কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অর্থাৎ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এ একবার ক'রে নেপচুনের চেয়েও কাছে এসে পড়ে এবং পরে আবার



চিত্র ১০৫। ১৯৩০ সালের ২রা এবং ৫ই মার্চ তারিখে গৃহীত ডেলটা জেমিনোরাম নক্ষত্রের নিকটবর্তী আকাশের দু'টি আলোকচিত্র। তীর-চিহ্নিত জ্যোতিষ্কটি যে এই তিনদিনেই স্থান পরিবর্তন করেছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতিষ্কটি একটি গ্রহ।

বহুদূরে চলে যায়। প্লুটো মাঝে মাঝে নেপচুনের কক্ষের ভেতর এসে পড়ে, তাহ'লে কি ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা আছে! ভয় নেই বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন যে সেরূপ কিছু হবার কোন আশঙ্কা নেই। এর কারণ, প্লুটোর কক্ষ-সমতল নেপচুন এবং অন্যান্য গ্রহের কক্ষ-

সমতলের সঙ্গে প্রায় ১৭ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে, এর ফলে প্লুটোর কক্ষপথ নেপচুনের কক্ষপথের সঙ্গে কোথাও মিলিত হয়নি। কাজেই কক্ষপথে পরিক্রমণকালে এই গ্রহদু'টি কখনো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে না।

প্লুটোর কক্ষের এরূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য ক'রে কোন কোন বিজ্ঞানী অনুমান করেছেন যে, প্লুটো হয়তো পূর্বে নেপচুনের একটি উপগ্রহ ছিল। দৈবাৎ তা কক্ষচ্যুত হ'য়ে নূতন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। মনে হয়, এজন্যই অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথের সঙ্গে প্লুটোর কক্ষপথের কোন সামঞ্জস্য নেই।

প্লুটো এত দূরে রয়েছে এবং তা এত কম সূর্যকিরণ ফিরিয়ে দেয় যে এতে কোন আবহমণ্ডল বা মেঘ আছে ব'লে মনে হয় না। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা সম্ভবত −৩৪৮° ফারেনহাইটের উপরে ওঠে না। এই তাপমাত্রায় আমাদের জানা সব গ্যাসই জমে বরফের মতো কঠিন হ'য়ে যেতে বাধ্য। এর গা থেকে সূর্যালোক এত কম প্রতিফলিত হয় যে, এখানে মিহি বালি-জাতীয় পদার্থ কিংবা কেলাসিত কোন পদার্থের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। চাঁদের মতো এর গাটাও সম্ভবত মসৃণ নয়, বড় বড় গাঢ় রঙের পাথরের নুড়ি দিয়ে ছাওয়া, তাই বোধহয় সেখান থেকে বেশি সূর্যালোক প্রতিফলিত হ'তে পারে না। এর ওজন প্রায় পৃথিবীর সমান। কিন্তু পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব এত বেশি যে, এর আয়তন সম্বন্ধে আজও নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিজ্ঞানীর অনুমান, পৃথিবীর মতো এই গ্রহটিও আয়তনের অনুপাতে খুব ভারি। আর তা যদি হয় তবে প্লুটো নিশ্চয়ই প্রধানত লোহা দিয়ে তৈরি। পৃথিবী, তার সমগোত্রীয় সব গ্রহে, সূর্যে এবং উল্কাতে লোহার পরিমাণ খুব বেশি, কাজেই এটা একেবারে অসম্ভব বলা যায় না। অতিকায় হালকা গ্রহগুলির পরে আবার পৃথিবীর মতো ভারি একটি গ্রহের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হ'ল, সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য বিজ্ঞানীরা আজও দিতে পারেননি। এজন্য কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে, প্লুটোর আয়তন হয়তো সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। একটি খুব চক্‌চকে

ইস্পাতের বল রোদে রাখলে দেখা যাবে, বলটির মোট আয়তনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি অংশ অনেক বেশি উজ্জ্বল। দূর থেকে এই আলোকবিন্দুর আয়তনকেই বলটির মোট আয়তন ব'লে ভ্রম হওয়া সম্ভব। কিন্তু সৌরজগতের শেষ সীমায় এরূপ চক্‌চকে গ্রহের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব হ'ল তা বলা কঠিন। মোট কথা, প্লুটোর উৎপত্তি এবং অবস্থান আজও গভীর রহস্যে ঘেরা রয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন, প্লুটোর চেয়ে দূরে আরও নূতন গ্রহ থাকা অসম্ভব নয়। এরূপ গ্রহ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে অনুসন্ধান স্থরু ক'রে দিয়েছেন। তবে প্লুটোর চেয়ে দূরে অবস্থিত গ্রহ আরও বেশি ম্লান হবে এবং তার গতিবেগ আরও অনেক কম হবে, কাজেই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যে আরও অনেক বেশি কষ্টসাধ্য হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যে আমরা আরও নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনী শুনবনা তা কে বলতে পারে!

ধূমকেতু

গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়া আকাশে মাঝে মাঝে আর একরকম জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়। এদের বলা হয় ধূমকেতু (Comet)। এদের ঝাঁটার মতো আকৃতি সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

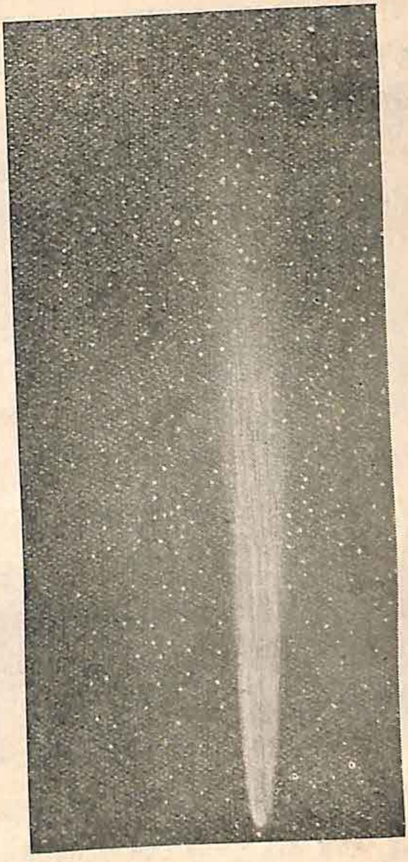
ধূমকেতু হঠাৎ এক সময় আকাশের কোণে দেখা দেয় এবং দিন দিন এর রূপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে থাকে। এভাবে কয়েক দিন থাকবার পর এ আবার ম্লান থেকে ম্লানতর হ'য়ে শেষে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। প্রথম আবির্ভাবের সময় ধূমকেতুকে একটি উজ্জ্বল আলোকপিণ্ডের মতো দেখায়, কিন্তু এ সূর্যের যত কাছে আসতে থাকে এর উজ্জ্বল ধোঁয়ার মতো পুচ্ছটি তত স্পষ্ট হ'তে থাকে।

ধূমকেতুর আবির্ভাব বিরল এবং আকস্মিক। তাই প্রাচীনকালে এর আবির্ভাব মানবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক ব'লে বিবেচিত হ'ত। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, ধূমকেতু দেখা দিলে রাজার মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলজনক ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালি সর্বপ্রথম গণনা ক'রে দেখান যে ধূমকেতুদের মধ্যে অনেকেই সৌরজগতের অধিবাসী এবং অন্যান্য গ্রহের মতো তারাও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। কাজেই এদের আবির্ভাবের সঙ্গে লোকসমাজের অমঙ্গলের কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, কাজেই ধূমকেতু দেখে অযথা আতঙ্কিত হওয়ারও কোন কারণ নেই।

ধূমকেতু সম্পর্কে অনেকেরই অভিমত এই যে, এরা সৌরজগতের বাইরের অধিবাসী। মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে এরা হয়তো দিক্‌ভ্রান্ত পরিব্রাজকের মতো দৈবাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করে। যেগুলির গতিবেগ কম থাকে সেগুলি আর সৌরজগতের আকর্ষণ এড়িয়ে মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারে না। অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্যের বিপুল আকর্ষণে বাঁধা পড়ে তারই চারদিকে উপবৃত্তাকার (Elliptic) পথে ঘুরতে থাকে। এদেরই নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হ'তে দেখা যায়। কিন্তু যে ধূমকেতুর গতিবেগ খুব বেশি থাকে সেটি দৈবাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করলেও অনায়াসে সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণ-জনিত বল এড়াতে পারে, তাই তা অল্পদিনের মধ্যেই অধিবৃত্তাকার (Parabolic) কিংবা পরাবৃত্তাকার (Hyperbolic) পথে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। বলা বাহুল্য, এরূপ ধূমকেতু একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যায় মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে।

বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত যতগুলি ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে অন্তত ত্রিশটির গতিপথ উপবৃত্তাকার ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। এদের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতুই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সূর্যের কাছে ফিরে আসতে এর মোটামুটি পঁচাত্তর বছর লাগে। ১৯১০ সালে একে দেখা গিয়েছিল, কাজেই ১৯৮৬ সাল অবধি বেঁচে থাকলে হয়তো একে আবার দেখা যাবে।

যেসব ধূমকেতুর গতিপথ উপবৃত্তাকার ব'লে প্রমাণিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকেই যে পুনরায় দেখা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার কারণ একাধিক। পর্যবেক্ষণের সামান্য ত্রুটির জন্য গণনায় ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রহদের আকর্ষণ-জনিত বলের প্রভাবে ধূমকেতুর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া খুবই সম্ভবপর, বিশেষত সৌরজগতের ভিতর দিয়ে চলবার সময় ধূমকেতুটি যদি দৈবাৎ কোন বড় গ্রহের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। আবার গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণ-জনিত বলের প্রভাবে ধূমকেতুটি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। এরূপ কয়েকটি ধূমকেতুর বিবরণ আমাদের জানা আছে।

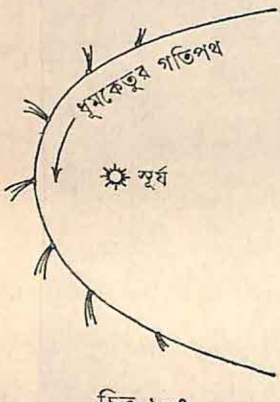


চিত্র ১০৬। হ্যালির ধূমকেতু—১৯১০

বিজ্ঞানী চাঁদলার গণনা ক'রে দেখান যে, একটি ধূমকেতুর পরিক্রমণকাল ছিল ২৭ বছর। ১৮৮৬ সালে সেই ধূমকেতুটি দৈবাৎ বৃহস্পতির খুব নিকট দিয়ে যায়। এর ফলে এর গতিপথ বদলে যায় এবং নূতন পথে এর পরিক্রমণকাল দাঁড়ায় মাত্র ৭ বছর। এই অবস্থায় একে নূতন ক'রে আবিষ্কার করা হয় ১৮৮৯ সালে, তখন এটি ব্রুক্সের ধূমকেতু ব'লে পরিচিত হয়। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার ফলে আরও বোঝা গেল যে, ঐ সময় ধূমকেতুটি দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে গেছে। এরপর থেকে দেখা গেল যে বিচ্ছিন্ন অংশ দু'টি পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

বায়েলারের ধূমকেতুটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮২৬ সালে, তখন এর পরিক্রমণকাল ছিল ৬'৬ বছর। ১৮৪৬ সালে এটি হঠাৎ দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে গেল। বিচ্ছিন্ন অংশ দু'টিকে পুনরায় ১৮৫২ সালে দেখা গেল, কিন্তু এবারে তাদের মধ্যে ব্যবধান আগের চেয়ে অনেক বেশি। এরপর আর এই অংশ দু'টির কোনটিকেই ফিরে আসতে দেখা গেল না। কিন্তু ১৮৭২ সালে যখন পৃথিবী পূর্বোক্ত ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করছিল তখন প্রচুর উল্কাপাত হ'তে দেখা গেল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, বায়েলারের ধূমকেতুটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে অসংখ্য উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

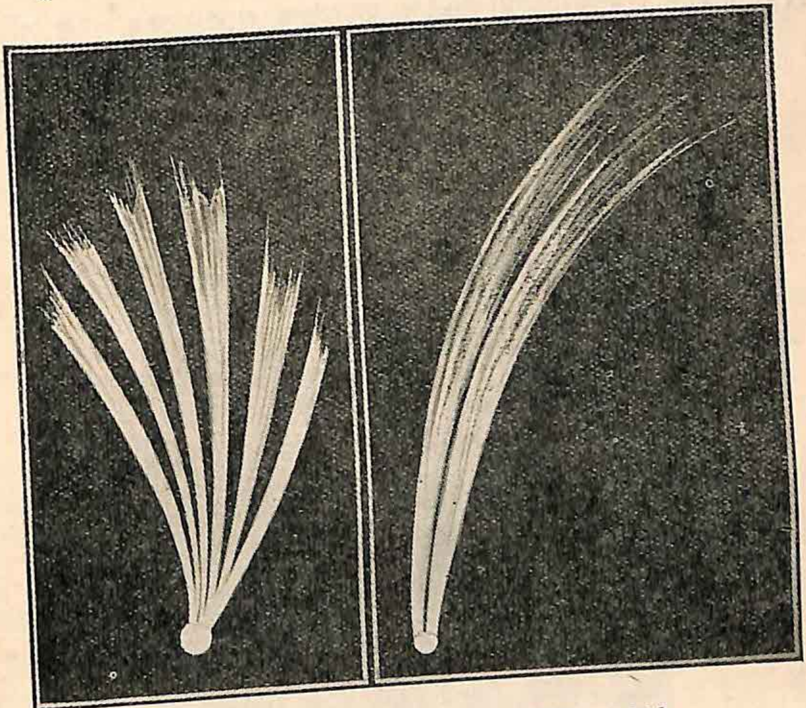
কয়েকটি ধূমকেতুকে খালি চোখেই দেখা যায়, আবার কতকগুলিকে দেখার জন্য দূরবীণের সাহায্য নিতে হয়। ধূমকেতুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। সূর্য থেকে যখন দূরে থাকে তখন এ একেবারে অদৃশ্য থাকে। সূর্যের কাছে এলে একে প্রথমে খানিকটা পুঞ্জীভূত মেঘের মতো দেখা যায়। আরও কাছে এলে ক্রমশ এর মস্তক ও পুচ্ছ স্পষ্ট দেখা যায়। মস্তকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল একটি 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) বা কেন্দ্রবিন্দু এবং তার চারদিকে স্বল্পোজ্জ্বল কুয়াশার আবরণের মতো 'কোমা' (Coma) বা কেশ দেখা যায়। মস্তক থেকে একটি দীর্ঘ উজ্জ্বল পুচ্ছ বেরিয়ে আসে। ধূমকেতু যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন তার পুচ্ছটি যেন সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে। এজন্য ধূমকেতু তার কক্ষপথে যখন সূর্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে তখন তার পুচ্ছটিই আগে আগে চলতে থাকে, পেছনে পড়ে থাকে না।



চিত্র ১০৭

ধূমকেতুর মস্তক আকারে একটি গ্রহের চেয়েও বড় হ'তে পারে, আর তার ঝাঁটার মতো পুচ্ছটি লম্বায় কয়েক কোটি মাইল হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু এর দেহ হালকা মেঘের মতো ; এর সবচেয়ে ঘনীভূত অংশ অর্থাৎ মস্তকের ভেতর দিয়েও পশ্চাতে অবস্থিত নক্ষত্র দেখা যায়।

আয়তনে এত বড় হওয়া সত্ত্বেও এর ওজন এত কম যে, এর পক্ষে গ্রহ তো দূরের কথা সামান্য একটা উপগ্রহের গতি পরিবর্তন করাও সম্ভব হয় না। অনেকের অনুমান, ধূমকেতুর মস্তকটি কতগুলি জড়কণা দিয়ে গঠিত, তবে এই জড়কণাগুলি পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে রয়েছে। ধূমকেতুর দেহে খানিকটা গ্যাসও থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই গ্যাস

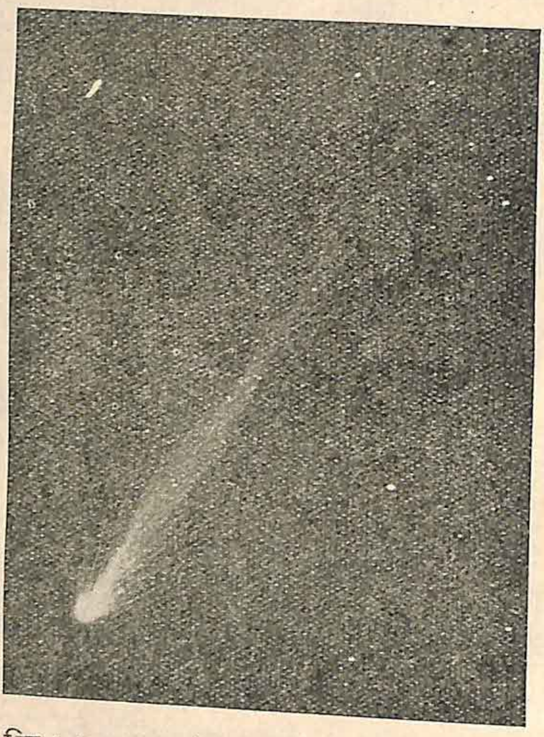


চিত্র ১০৮। (ক) Cheseaux-এর ধূমকেতু—১৭৪৪
(খ) ডোনাটির ধূমকেতু—১৮৫৮

জীবের পক্ষে বিষাক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে ধূমকেতুতে এই গ্যাসের পরিমাণ এত কম যে, দৈবাৎ যদি ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষও হয় তবুও আমরা কিছুই টের পাব না।

গ্রহদের মতো ধূমকেতুর মস্তক থেকেও সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় ব'লে তাকে উজ্জ্বল দেখায়। বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতুর দীপ্তিমান হওয়ার

আর একটা কারণ, সূর্য থেকে অবিরত যে ইলেক্‌ট্রন-স্রোত প্রবাহিত হয় তারই সংঘাতে হয়তো কম চাপের গ্যাসের আয়নীভবন (ionisation) প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং তারই ফলে একরূপ দীপ্তি দেখা যায়; যেমন বায়ুশূন্য নলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে ক্যাথোড-রশ্মি (Cathode rays) পাওয়া যায়। ধূমকেতুর পুচ্ছটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত। দেখে মনে হয়, ধোঁয়ার মতো সূক্ষ্ম খানিকটা জড়বস্তু যেন মস্তক থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত



চিত্র ১০৯। মোরহাউসের ধূমকেতু (১৯০৮ খৃস্টাব্দ)

হ'য়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ধূমকেতুর লেজের অংশটি এত সূক্ষ্ম জড়বস্তু দিয়ে গঠিত যে, তা সূর্য-কিরণের প্রবল স্রোতে বহুদূর পর্যন্ত ভেসে গেছে, তাই ধূমকেতুর এমন ঝাঁটার মতো আকৃতি আমরা দেখতে পাই। এসব জড়কণিকার আকার খুব ছোট, তাই তার উপর সূর্যের আকর্ষণ-জনিত বলের তুলনায় সূর্য-কিরণের চাপ আরও বেশি প্রবল হয়।

বিভিন্ন ধূমকেতুর পুচ্ছে আবার নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কারও পুচ্ছ থাকে একটি, আবার কারও দু'টি। কোন কোন ধূমকেতু আবার বহু পুচ্ছবিশিষ্ট। একাধিক পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুর আলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে, তাতে বিভিন্ন রকম গ্যাস আছে, তার কোনটি হয়তো ভারি আর কোনটি হালকা। বিভিন্ন গ্যাসের ওজন বিভিন্ন রূপ ব'লে তাদের বিক্ষিপ্ত হওয়ার মাত্রা বিভিন্ন রূপ, তাই ধূমকেতুর পুচ্ছের গঠনে এরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। হাইড্রোজেন হালকা ব'লে খাড়া উঠে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কার্বনের কোন যৌগ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকলে তা ওজনের ভারে ঈষৎ বেঁকে যায়, আর ধাতব গ্যাস থাকলে ওজনের ভারে তা আরও বেঁকে যায়। এভাবে পৃথক্ পৃথক্ পুচ্ছের সৃষ্টি হয়।

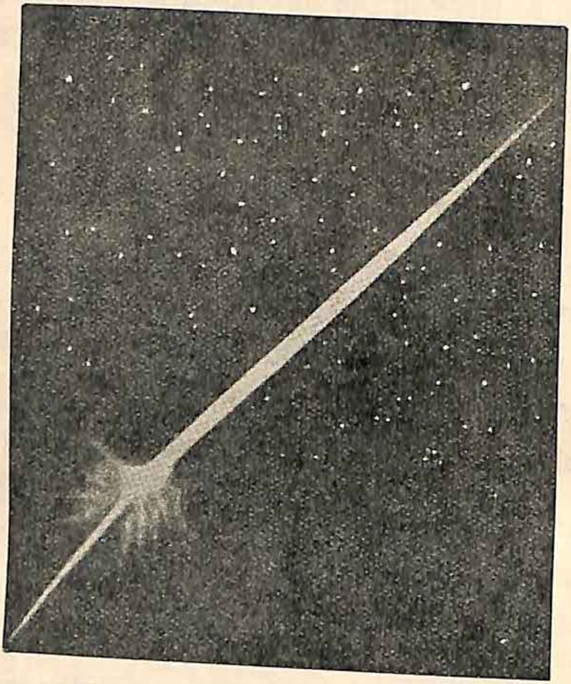
ধূমকেতু আকাশের একটি দর্শনীয় জ্যোতিষ্ক সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌরজগতে এর প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে। তার কারণ আয়তনে বিশাল হ'লেও এতে পদার্থ বিশেষ কিছু নেই। বস্তুত একটা ক্ষুদ্র গ্রহকণিকাতে যেটুকু পদার্থ আছে, এতে তাও নেই।

উল্কা

রাত্রিবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনেক সময় দেখা যায়, হঠাৎ একটা তারা যেন খসে পড়ল। এগুলি কিন্তু তারা নয়, এক একটি জ্বলন্ত জড়পিণ্ড। এরাই মর্ত্যলোকে বহন ক'রে নিয়ে আসছে মহাশূন্যের বিচিত্র বার্তা। গ্রহ-উপগ্রহের মতো এরাও মহাশূন্যে থেকে অবিরাম ঘুরে চলেছে সূর্যের চারদিকে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে মহাশূন্যের কোন জ্যোতিহীন জড়পিণ্ড দৈবাৎ যদি পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে তাহ'লে পৃথিবীর আকর্ষণে তা প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে, আর বাতাসের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে। এসব জড়পিণ্ডকে বলা হয় উল্কা (Meteor)।

অধিকাংশ উল্কাই আকারে ছোট, তাই পৃথিবীতে পৌঁছাবার আগেই

সেগুলি জ্বলে পুড়ে শেষ হ'য়ে যায়। যেগুলি আকারে খুব বড়, সেগুলিই শুধু সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হওয়ার আগেই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। বিজ্ঞানীরা উল্কার এরূপ ধ্বংসাবশেষ অনেক সংগ্রহ করেছেন। জাদুঘরে গেলে এরূপ নমুনা অনেক দেখা যায়। আজ অবধি সবচেয়ে বড়



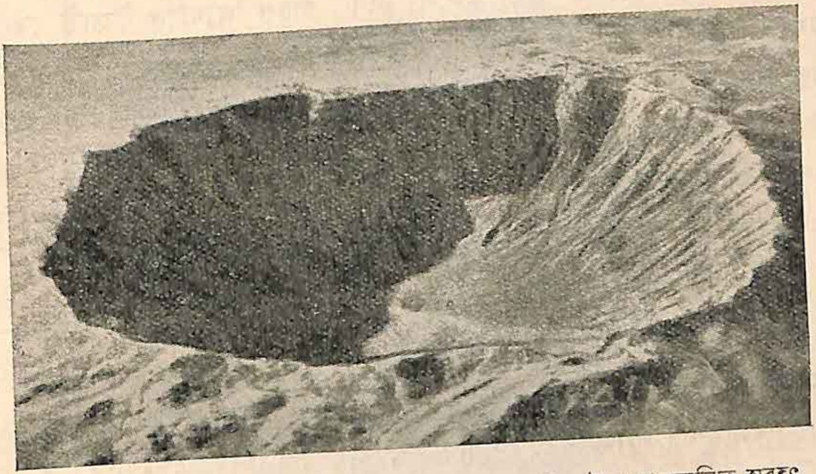
চিত্র ১১০। উল্কাপাত

যে উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে তা সংগ্রহ করেছিলেন বিখ্যাত মেরু-অভিযাত্রী পিয়ারী, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড থেকে। এর আয়তন ১১ ফুট × ৭ ফুট × ৫ ফুট; আর ওজন ৩৬½ টন।

উল্কাপাতজনিত এক বিরাট ক্ষতচিহ্ন আজও দেখা যায় উত্তর আমেরিকার অ্যারিজোনা অঞ্চলে, বায়ু-তাড়িত এক জনহীন প্রান্তরে। এর ব্যাস প্রায় এক মাইল আর গভীরতা প্রায় পাঁচশ' ফুট। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে একটি বিশাল উল্কা

প্রচণ্ডবেগে ছুটে এসে ভূ-পৃষ্ঠে আঘাত করে। এর ফলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় তাইতে ভূ-পৃষ্ঠের মাটি-পাথর ইত্যাদি ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, আশেপাশের গাছপালা ইত্যাদি সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, আর উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ প্রবলবেগে ভূগর্ভে প্রোথিত হ'য়ে যায়। বাস্তবিক ঐ গহ্বরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে প্রায় ১,৩০০ ফুট নীচে উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে উল্কাপাতের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা



চিত্র ১১১। উত্তর আমেরিকার অ্যারিজোনায় অবস্থিত উল্কাপাতজনিত সুবৃহৎ গর্ত। এর ব্যাস প্রায় এক মাইল, আর গভীরতা প্রায় পাঁচশ' ফুট।
(এরোপ্লেন থেকে গৃহীত আলোকচিত্র)

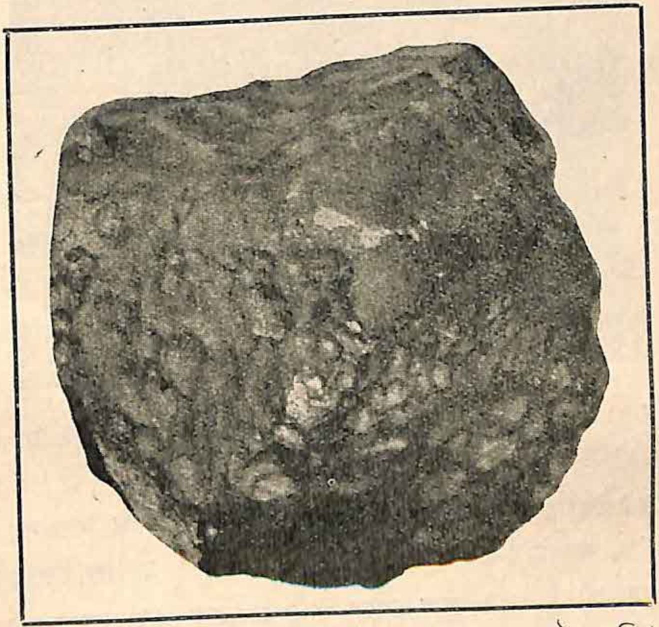
হ'ল দু'টি। প্রথমটি ঘটেছিল ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ৩০শে জুন। ভোর ৭টার সময় এক অগ্নিগোলক প্রচণ্ডবেগে ছুটে এসে আঘাত করে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস বনভূমির মাথার উপর। বিস্ফোরণের শব্দে দিগ্বিদিক্ বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। দিঙ্‌মণ্ডল রাঙা ক'রে প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা উপরদিকে ছড়িয়ে গেল প্রায় ২৫ মাইল অবধি। ৪০০ বর্গমাইলের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় গাছপালা, শত শত চাষী-পরিবার এবং অনুমান প্রায় ১,৫০০ বল্গা-হরিণের একটি দল ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত

ইর্খুটস্ক শহরের ভূ-কম্পন-লিখ যন্ত্রে ভূকম্পন ধরা পড়লো প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, অগ্নিপিণ্ডটির ওজন ছিল কয়েক হাজার টন।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখেও এরূপ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে তায়গা বনভূমির এক জায়গায় সূর্যের চেয়েও জ্যোতির্ময় একটি অগ্নিগোলক প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে ছুটে এল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। তা এসে পড়লো সুহোতে আলিন গিরিশ্রেণীর গায়ে। সেই তুষারাবৃত এলাকার আড়াই বর্গ কিলোমিটার জায়গার একটি গাছও খাড়া রইলো না। প্রচণ্ড আঘাতে উল্কাটি ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল, ছোটবড় খাদ সৃষ্টি হ'ল অনেকগুলো। সবচেয়ে বড় খাদটির ব্যাস হ'ল ২৮ মিটার এবং গভীরতা ৫ মিটার। এখান থেকে উল্কার সবচেয়ে বড় যে টুকরাটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার ওজন ১৭৪৫ কিলোগ্রাম (প্রায় ৪৩ মণ)। বিজ্ঞানীদের মতে মূল উল্কাপিণ্ডটির ওজন ছিল অন্তত ২,৫০০ মণ।

উপাদানের ভিত্তিতে উল্কাগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) পাষাণ-উল্কা, (২) লৌহ-উল্কা এবং (৩) পাষাণ-লৌহ-উল্কা। পাষাণ-উল্কার গঠন অনেকটা পার্থিব শিলার মতো। এর মধ্যে আছে লৌহ, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, কোবাল্ট, তামা, অক্সিজেন, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস, কার্বন প্রভৃতি। এজাতীয় উল্কার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ হচ্ছে বুটিদার। এরূপ কোন কোন উল্কার মধ্যে জলের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়ে এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লৌহ-উল্কার উপাদান প্রধানত লৌহ এবং তার সঙ্গে শতকরা ৫ থেকে ১৮ ভাগ পর্যন্ত নিকেল মিশ্রিত থাকে। বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, এই পৃথিবীতে প্রতি ১৬টি পাষাণ-উল্কার জায়গায় লৌহ-উল্কা পড়ে মাত্র একটি। পাষাণ-লৌহ-উল্কা আরও বিরল। এর উপাদান উপরোক্ত দু'জাতীয় উল্কার মাঝামাঝি। পাষাণ-উল্কার নমুনাগুলি পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে, এদের সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে, অর্থাৎ এরাও ভূমণ্ডলেরই সমসাময়িক।

সৌরজগতের ভ্রাম্যমাণ এসব উল্কা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ঘুরে বেড়াতে পারে না। প্রত্যেকেরই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। ছোট-বড় অসংখ্য উল্কা মিলে গঠন করে এক-একটি দল। আর এরূপ এক-একটি দল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে। সবাই পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে। একটির সঙ্গে অন্যটির ধাক্কা লাগার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভ্রাম্যমাণ উল্কাপুঞ্জগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।



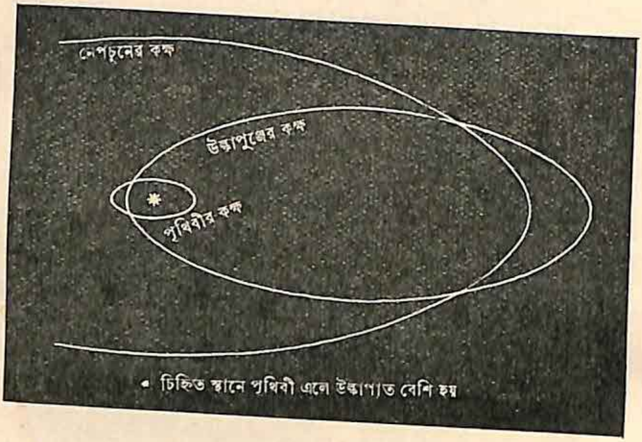
চিত্র ১১২। একটি উল্কাপিণ্ড—এর উপাদান প্রস্তর ও লৌহের মিশ্রণ।

প্রথম ভাগে যেসব উল্কাপুঞ্জ আছে সূর্য থেকে তাদের কক্ষপথের দূরতম বিন্দুটি বৃহস্পতির কক্ষপথ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় ভাগে যেগুলি আছে তাদের কক্ষপথের দূরতম বিন্দু বৃহস্পতির কক্ষের নিকটে অবস্থিত। আর তৃতীয় ভাগে যেগুলি আছে তাদের কক্ষপথ গেছে পৃথিবীর কক্ষপথের নিকট দিয়ে।

আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যখন কোন একটি উল্কাপুঞ্জের কক্ষপথ অতিক্রম করে তখন পৃথিবীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাবৃষ্টি হ'তে

থাকে। এজন্য দেখা যায়, বছরের কোন কোন সময় উল্কাপাত হয় অনেক বেশি, সে তুলনায় অন্য সময় উল্কাপাতের পরিমাণ হয় অনেক কম।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, খণ্ডগ্রহ এবং ধূমকেতু ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে বিভিন্ন উল্কাপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে। এখন প্রশ্ন, এসব খণ্ডগ্রহ এবং ধূমকেতুর সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে? কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, এদের সৃষ্টি হয়েছিল



চিত্র ১১৩। যে দু'টি বিন্দুতে পৃথিবীর কক্ষ উল্কাপুঞ্জের কক্ষকে ছেদ করেছে সেই দু'টি বিন্দুতে পৃথিবী এলে উল্কাপাত বেশি হয়।

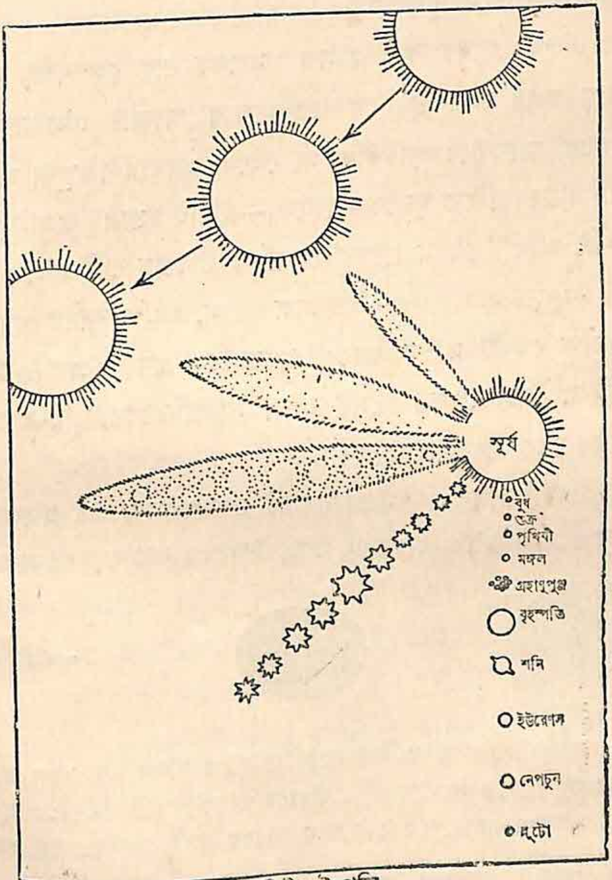
সৌরজগতের শৈশবে। সুদূর অতীতে বহুদূরবিস্তৃত জ্বলন্ত বাষ্পমণ্ডলী যখন ঘনীভূত হ'য়ে জমাট বেঁধে এক-একটি গ্রহ-উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই বাষ্পমণ্ডলীরই শেষ রেশ থেকে যায় খণ্ডগ্রহ এবং ধূমকেতুর মধ্যে। মহাজাগতিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং নানাবিধ সৌরক্রিয়ার ফলে সেগুলিই হয়তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ক্রমে এক-একটি উল্কাপুঞ্জে পরিণত হয়েছে।

গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি

গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। এতকাল জিন্‌স-এর জোয়ার মতবাদই (Tidal theory) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে করা হ'ত। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে লাপ্‌লাস-এর বলয় মতবাদই (Disc theory) আবার বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। ইউরে, সুয়েস্, হয়েল প্রভৃতি প্রখ্যাত বিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের সমর্থক। নীচে এই দু'টি মতবাদ সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

(১) জোয়ার মতবাদ—বিজ্ঞানী জিন্‌স-এর মতে, আজ থেকে



পৃথিবীর উৎপত্তি

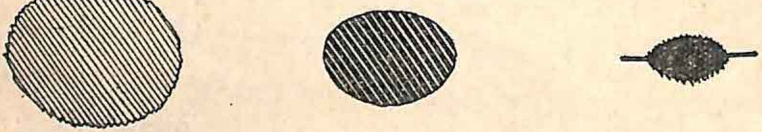
চিত্র ১১৪

প্রায় চারশ' কোটি বছর আগে সূর্য বহুবিস্তৃত একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড ছিল। সেই সময় হয়তো একটা আরও অনেক বড় নক্ষত্র হঠাৎ এর কাছ দিয়ে

যাচ্ছিল। তার আকর্ষণে সূর্যের খানিকটা অংশ ছিট্‌কে বেরিয়ে এল, যেমন চন্দ্র বা সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর বুকে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এর আকার হ'ল অনেকটা পটোলের মতো, দু'দিক সরু আর মাঝখানটা মোটা। ইতি-মধ্যে নক্ষত্রটি অনেক দূরে সরে গেল, কাজেই পটোলাকৃতি গ্যাসপিণ্ডটি সূর্যের আকর্ষণে আটকা থেকে তারই চারদিকে ঘুরতে লাগলো। ক্রমশ তা ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বাঁধলো এবং টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেল। এই টুকরোগুলো থেকে এক-একটি গ্রহের সৃষ্টি হ'ল। মাঝের গ্রহ বৃহস্পতি হ'ল সেজন্য সবচেয়ে বড় আর তার দু'দিকে গ্রহগুলোর আকার হ'ল ক্রমশ ছোট। এরপর সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর গা থেকে আবার কিছুটা অংশ ছিট্‌কে বেরিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে লাগলো—ইহাই চন্দ্র। এমনি ক'রে কোন গ্রহের একটি, আবার কোন গ্রহের একাধিক উপগ্রহ সৃষ্টি হ'ল।

(২) বলয় মতবাদ—বহুকাল আগে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, প্রায় দশ লক্ষ কোটি মাইল জায়গা জুড়ে ছিল একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা। এর মধ্যে ছিল জ্বলন্ত বাষ্প। সেই বাষ্প সারাদিনরাত ঘূর্ণি-ঝড়ের মতোই অবিরাম পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতো।

প্রকৃতির নিয়মে এই নীহারিকাটি ক্রমশ সংকুচিত হ'তে লাগলো। নীহারিকা যত ছোট হ'তে লাগলো, তার উষ্ণতাও তত বাড়তে লাগলো, আর



চিত্র ১১৫। বহুদূরবিস্তৃত গ্যাস-পিণ্ড সংকুচিত হ'তে লাগল, এর ফলে তার ঘূর্ণনের বেগও ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এইভাবে গ্যাস-পিণ্ডটি ক্রমশ চেপ্টা হ'য়ে যেতে লাগলো এবং শেষে তার মাঝ বরাবর একটি চাকতির সৃষ্টি হ'ল।

সেই সঙ্গে তার ঘোরার বেগও ততোই বাড়তে লাগলো। এভাবে একটু একটু ক'রে নীহারিকাটি ক্রমশ গাড়ির চাকার মতো চেপ্টা হ'য়ে গেল। কিন্তু তাতেও নীহারিকাটি থামলো না, এর চেপ্টা অংশটা ক্রমশ আরও বড় হ'তে লাগলো।

এরপর একটা মজার ব্যাপার হ'ল। অনেক সময় দেখা যায়, গোরুর গাড়ির চাকা থেকে লোহার বলয়টি খসে পড়েছে। এই নীহারিকা থেকেও সেরকম বলয়ের মতো একটি অংশ খসে পড়লো এবং আপন বেগে চাকার চারদিকে ঘুরতে লাগলো। এই খসে-পড়া অংশ থেকেই একে একে সৃষ্টি হ'ল বিভিন্ন গ্রহ এবং উপগ্রহ। এরপরে নীহারিকার যে অংশটুকু অবশিষ্ট পড়ে রইলো, তাই আমাদের সূর্য হ'য়ে বিরাজ করছে গ্রহদের মাঝে, আর আপন বেগে পাক খেয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে।

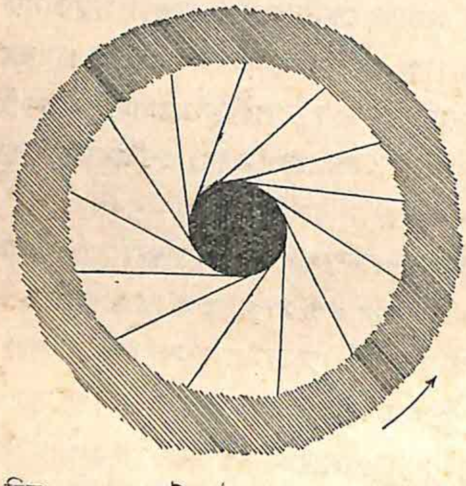
গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীর পক্ষে কল্পনার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে উপরোক্ত মতবাদটি কতগুলি সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সেগুলি বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, সৃষ্টির আদিতে সূর্য প্রায় দশ লক্ষ কোটি মাইল বিস্তৃত একটি গ্যাসের পিণ্ড ছিল। ক্রমাগত সংকুচিত হ'য়ে এই বহুদূর-বিস্তৃত গ্যাস-পিণ্ডের আয়তনই বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় দশ লক্ষ মাইলে। সংকুচিত হওয়ার ফলে এই গ্যাস উত্তপ্ত হ'ল এবং তার ঘূর্ণনের বেগও ক্রমশ বাড়তে লাগলো। হিসেব ক'রে দেখা গেল যে উপরোক্ত হারে সংকুচিত হ'য়ে থাকলে বর্তমানে সূর্যের আবর্তনকাল হওয়া উচিত মাত্র ১২ ঘণ্টা। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, সূর্যের আবর্তনকাল প্রায় ২৬ দিন। অর্থাৎ, হিসেবের তুলনায় সূর্য অনেক ধীরগতিতে আবর্তিত হচ্ছে। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ এই হ'তে পারে যে, বাইরের কোন শক্তি নিশ্চয়ই সূর্যের দ্রুত আবর্তনে বাধা দিচ্ছে। এই শক্তিটা যে কি তাই এখন আলোচনা করা দরকার।

সংকুচিত হওয়ার ফলে শক্তির মাত্রা যত বাড়লো সূর্য তত দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগলো। এর ফলে গ্যাস-পিণ্ডটি ক্রমশ চেপ্টা হ'য়ে যেতে লাগলো এবং শেষে তার মাঝ বরাবর একটি চাক্‌তির সৃষ্টি হ'ল। সূর্য সংকুচিত হ'তে হ'তে তখন বুধের কক্ষের সমান আয়তন প্রাপ্ত হয়েছিল, তখনই সম্ভবত

এই চাক্‌তিটির সৃষ্টি হয়। ক্রমে সূর্য আরও সংকুচিত হ'তে থাকে আর চাক্‌তিটি সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটি বলয়ের সৃষ্টি করে এবং তা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। এই বলয়ের প্রভাবে সূর্যের ঘূর্ণনের বেগ ক্রমশ মন্থর হ'তে থাকে, আর বলয়টিও ক্রমশ সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

এখানে সূর্য এবং বলয়কে একটি সাইকেলের চাকার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সাইকেলের চাকায় নাভি (Hub) এবং বাইরের বলয়ের মধ্যে অনেকগুলি লোহার অর (Spoke) থাকায় নাভির সঙ্গে সঙ্গে বলয়টিও সমান তালে ঘোরে। কিন্তু সূর্য এবং সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন বলয়ের মধ্যে কোন দৃঢ়সংবদ্ধ অর না থাকায় সূর্য এবং বলয় একই তালে ঘুরতে পারবে না। সূর্যের চারদিকে যে চৌম্বক বলক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তারই প্রভাবে বলয়টি ঘুরতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে চৌম্বক-শক্তি ক্রিয়া করে তাকে কতগুলি স্থিতিস্থাপক সূতোর (elastic string) সঙ্গে তুলনা করা যায়। ধরা যাক, সাইকেলের চাকাটি কতগুলি স্থিতিস্থাপক সূতোর সাহায্যে নাভির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাহ'লে কেন্দ্রের নাভিটি যে বেগে ঘুরবে, বাইরের চাকাটি তার চেয়ে পিছিয়ে পড়তে চাইবে। এতে বোঝা গেল, সূর্যের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে বলয়টি ঘুরলেও তার গতিবেগ ক্রমশ মন্থর হ'য়ে পড়বে। বলয়ের গতিবেগ মন্থর হ'লে তারই টানে নাভির ঘূর্ণনের বেগও ক্রমশ মন্থর হ'য়ে পড়তে



চিত্র ১১৬। একটি সাইকেলের চাকা কতগুলি স্থিতিস্থাপক সূতোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রের নাভি যে বেগে ঘুরবে, বাইরের চাকাটি তার চেয়ে পিছিয়ে পড়তে চাইবে।

বাধ্য। আর সূর্যের গতি যত মন্থর হ'তে থাকবে বলয়টিও ধীরে ধীরে সূর্য থেকে ততদূরে সরে যেতে থাকবে।

কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণের পক্ষে একটি খুব বড় বাধা দেখা দিল। সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ একত্রিত ক'রে সূর্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে কি এরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব? হিসেব ক'রে দেখা গেল যে এতে সূর্যের আয়তন ও ওজন যতটা বাড়ে তাতে সূর্যের ঘূর্ণনের বেগ আরও অনেক বেশি হ'ত ঠিক, কিন্তু এ থেকে চাক্‌তি বা বলয়ের সৃষ্টি হ'ত ব'লে মনে করা যায় না। বৃহস্পতির মতো এর উত্তর-দক্ষিণ আরও চাপা হ'ত এই মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু হ'ত ব'লে মনে করা যায় না। বিজ্ঞানী তাই বললেন, সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এই বলয় থেকে যে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে ৪৫০টি পৃথিবীর ওজনের সমান পদার্থ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু এই সময় প্রায় ৩০০০টি পৃথিবীর ওজনের সমান হাইড্রোজেন গ্যাস মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, যার কোন হিসেবই আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ বর্তমানে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ মিলিয়ে যে পরিমাণ পদার্থের হিসেব পাওয়া যায় তার প্রায় সাতগুণ ওজনের হাইড্রোজেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। আর সূর্য-দেহ থেকে এই পরিমাণ পদার্থ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এসেছিল ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে তবেই এই মতবাদ মেনে নেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এটাই হ'ল এই মতবাদের সবচেয়ে দুর্বল অংশ।

ধরা যাক, উপরোক্ত পদ্ধতিতে একটি বলয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তাহ'লে এখন আলোচনা করা যাক, সেই বলয় থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে। গ্যাসীয় বলয়টি সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলো। বিজ্ঞানীদের মতে, বলয়ের উপাদান যতক্ষণ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ তার উপর সূর্যের চৌম্বক-ক্রিয়ার প্রভাব থাকবে। কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হ'য়ে তরল বা কঠিন কণায় পরিণত হ'লে তাদের উপর এই চৌম্বক-শক্তির কোন প্রভাব থাকা সম্ভব নয়। কাজেই মূল গ্যাসীয় পদার্থের বলয়টি ক্রমশ আরও দূরে সরে গেলেও এসব তরল বা কঠিন কণাগুলি পূর্বের জায়গায়ই পড়ে থাকবে।

এই অবস্থায় মূল গ্যাসীয় পদার্থ থেকে কি কি জিনিস ঘনীভূত হ'য়ে তরল বা কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হবে তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। সূর্যের নিকটবর্তী এই অংশের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, তাই মনে হয় তখন নানারূপ সিলিকেট (পাষাণ) ও লৌহ ঘনীভূত হ'য়ে বেরিয়ে আসে। কালক্রমে এভাবে ঘনীভূত কণাগুলোই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই চারটি গ্রহে পরিণত হয়। এজন্য দেখা যায় সৌরজগতের অভ্যন্তর ভাগের এই চারটি গ্রহের উপাদান প্রধানত পাষাণ ও লৌহ।

এখন প্রশ্ন হ'ল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডগুলি একত্রিত হ'য়ে গ্রহে পরিণত হ'ল কি করে ? এজন্য কোন চট্‌চটে আঠালো পদার্থের কথা কল্পনা করতে হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, অপেক্ষাকৃত ভারি হাইড্রোকার্বন-জাতীয় পদার্থ দ্বারা এ কাজ সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। হাইড্রোকার্বন-জাতীয় পদার্থ ঘনীভূত হ'য়ে তেলে পরিণত হয়। তৈলাক্ত পদার্থ সাধারণভাবে আঠালো জিনিসের কাজ করতে পারে না, একথা ঠিক। কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রায় অক্সিজেন-সংস্পর্শে এগুলি পিচজাতীয় পদার্থে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। আর তা যদি হ'য়ে থাকে, তবে এরূপ পিচজাতীয় পদার্থ নিশ্চয়ই গ্রহ-উপগ্রহ গঠনে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সূর্য থেকে দূরত্ব যত বাড়লো তত জল, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি ঘনীভূত হ'তে লাগলো। প্রধানত এসব উপাদান দিয়ে গঠিত হ'ল বৃহস্পতি এবং শনি। মূল গ্যাসীয় বলয়ে জল এবং অ্যামোনিয়া এই দু'টো উপাদানই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ছিল, কাজেই ভেতরের চারটি গ্রহের তুলনায় এই দু'টি গ্রহের আয়তন অনেক বড় হ'ল। কিন্তু এভাবে গ্রহ দু'টির আয়তন সম্পর্কে যে আন্দাজ করা যায় তার চেয়ে তাদের প্রকৃত আয়তন আরও অনেক বেশি। এর কারণ কি ? বিজ্ঞানীরা বলেন, যখন অতিকায় গ্রহ দু'টির সৃষ্টি হয়েছিল তখন তারা গ্যাসীয় পদার্থে ডুবে ছিল। অতিকায় গ্রহের অভিকর্ষীয় বল অত্যন্ত প্রবল হ'ল, তাই তারা গ্যাসীয় পদার্থের অনেকখানি নিজ নিজ দেহে আত্মসাৎ ক'রে নিল।

সম্ভবত এসব কারণেই তাদের দেহের আয়তন আরও অনেক গুণ বেশি হয়েছিল।

বলয়ের গ্যাসীয় পদার্থ যখন বৃহস্পতি ও শনির কক্ষের সীমা ছাড়িয়ে আরও দূরে সরে গেল তখন তার মধ্যে জল এবং অ্যামোনিয়ার পরিমাণ অনেক কমে গেল। কাজেই এর পরের ছু'টি গ্রহ ইউরেনস এবং নেপচুন গঠনে সবচেয়ে হালকা হাইড্রোকার্বন, মিথেন বা জলা-গ্যাস একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। বৃহস্পতি এবং শনির মতো ইউরেনস এবং নেপচুনও ছু'টি অতিকায় গ্রহ। কিন্তু এর পরেও একটা বড় রকমের সমস্যা রয়ে গেল।

শেষোক্ত গ্রহ ছু'টিতে হাইড্রোজেন গ্যাস নেই বললেই চলে, এর কারণ কি? বিজ্ঞানীরা এরও একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন সূর্য থেকে গ্রহদের উৎপত্তিকালে একটি বিরাট নক্ষত্র হয়তো এসময় সৌরজগতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা গ্যাস। কাজেই তা হয়তো এই নক্ষত্রটির অত্যধিক তাপপ্রভাবে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। কিন্তু মিথেন এবং নিয়ন গ্যাস হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারি, তাই সেগুলি মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারেনি। সেজন্য প্রধানত এই ছু'টি গ্যাসই ইউরেনস ও নেপচুন গঠনে অংশ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান মতবাদের একটা ভালো দিক এই যে, এর সাহায্যে উপগ্রহ-গুলির উৎপত্তি সম্পর্কেও একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। নীচের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে, সূর্য থেকে কোন একটি গ্রহের দূরত্ব

গ্রহ	উপগ্রহ	গড় ঘনত্ব
পৃথিবী	চন্দ্র	৩·৩৩
বৃহস্পতি	আইয়ো	৪·০৩
	ইউরোপা	৩·৭৮
	গ্যানিমেড	২·৩৫
	ক্যালিস্টো	২·০৬
শনি	টাইটান	২·৪
নেপচুন	ট্রিটন	২·০

যত বাড়ছে তার অধীনস্থ উপগ্রহের ঘনত্ব তত কমছে। চাঁদের জন্ম হয়েছে পাষাণ-লৌহ অঞ্চলে। বৃহস্পতির দু'টি উপগ্রহ আইয়ো এবং ইউরোপা এই অঞ্চলের সীমা নির্দেশ করছে। বৃহস্পতির অন্য দু'টি বড় উপগ্রহ গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদানে গঠিত।

পাষাণ-লৌহ অঞ্চলটি বুধের কক্ষ থেকে আরম্ভ হ'য়ে মঙ্গলের কক্ষ ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুক্র এবং পৃথিবী এই অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গায় উৎপন্ন হয়েছে, তাই তারা পাষাণ এবং লৌহের উপাদানগুলি বেশি পরিমাণে গ্রহণ ক'রে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় হয়েছে।

বুধ ও মঙ্গল এই অঞ্চলের দুই প্রান্তে অবস্থিত, তাই তাদের আয়তন তেমন বড় হ'তে পারেনি।

এই মতবাদের সমর্থনে আরও একটি মজার যুক্তি আছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কয়েক হাজার (কারও মতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার) গ্রহকণিকা আছে, এদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। আভ্যন্তরীণ গ্রহ চারটির মতো এদের উপাদানও প্রধানত পাষাণ এবং লৌহ। কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই আকারে খুব ছোট। বাস্তবিক সবগুলি গ্রহকণিকা একত্রিত করলেও মোট আয়তন চাঁদের চেয়ে বেশি হবে না। বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্রহকণিকাগুলি পাষাণ-লৌহ অঞ্চলের শেষ সীমায় অবস্থিত। প্রথম চারটি গ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পরে এই অঞ্চলে অবস্থিত পাষাণ এবং লৌহের পরিমাণ খুব কমে যায়, তা ছাড়া সম্ভবত তখন পিচজাতীয় আঠালো পদার্থটির পরিমাণ এত কমে যায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডগুলির পক্ষে একত্রিত হ'য়ে একটি সম্পূর্ণ গ্রহের রূপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তারা বিছিন্ন ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহকণিকার আকারে আজও সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে নানারকম কল্পনার জাল বুনে চলেছেন। তবে এক্ষেত্রে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল এত বেশি যে, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে হ'লেও অনেক বিজ্ঞানীই এই মতবাদটাই এখনকার মতো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব'লে মেনে নিয়েছেন।

৬নং তালিকা। গ্রহগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (পৃথিবীর দূরত্ব = ১)	পরিক্রমণ-কাল	আবর্তন-কাল	ব্যাস (মাইল)	আয়তন (পৃথিবী = ১)	ওজন (পৃথিবী = ১)	ঘনত্ব (জল = ১)	পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা (ফারেন-হাইট)
বুধ	০·৩৯	৮৮ দিন	৮৮ দিন	৩,১০০	০·০৬	০·০৪	৩·৮	৭৭০°
শুক্র	০·৭২	২২৫ "	?	৭,৭০০	০·৯২	০·৮১	৪·৮৬	১৪০°
পৃথিবী	১·০০	৩৬৫ "	১ "	৭,৯১৩	১·০০	১·০০	৫·৫২	১৪০°(?)
মঙ্গল	১·৫২	৬৮৭ "	২৪½ ঘণ্টা	৪,২১৬	০·১৫	০·১১	৩·৯৬	৮৬°
বৃহস্পতি	৫·২০	১১·৯ বছর	৯·৯ "	৮৬,৭০০	১৩১২	৩১৭	১·৩৪	−২১৬°
শনি	৯·৫৪	২৯·৫ "	১০·২ "	৭১,৫০০	৭৩৪	৯৫	০·৭১	−২৪৩°
ইউরেনস	১৯·১৯	৮৪·০ "	১০·৭ "	৩২,০০০	৬৪	১৪·৭	১·২৭	−৩০০° (?)
নেপচুন	৩০·০৭	১৬৪·৮ "	১৫·৮ "	৩১,০০০	৬০	১৭·২	১·৫৮	−৩৩০° (?)
প্লুটো	৩৯·৪৬	২৪৭·৭ "	?	?	?	০·৮	?	?

আগামী কয়েক বছর ধরে প্রধান গ্রহগুলিকে কখন কোথায় দেখা যাবে তার বিবরণ

৭নং তালিকা। নিম্নলিখিত তারিখের কয়েকদিন আগে বা পরে উত্তর গোলার্ধ থেকে বুধ (Mercury)কে ভালোরূপে দেখার সুযোগ হবে।

সন	সন্ধ্যাবেলা (পশ্চিম আকাশে)	ভোরবেলা (পুব আকাশে)	সন	সন্ধ্যাবেলা (পশ্চিম আকাশে)	ভোরবেলা (পুব আকাশে)
১৯৬১	৯ ফেব্রুয়ারী	৯ নভেম্বর	১৯৬৬	৬ "	১৮ আগস্ট
১৯৬২	২২ জানুয়ারী	২৩ অক্টোবর	১৯৬৭	১৮ ফেব্রুয়ারী	১ " ১৯ নভেম্বর
১৯৬৩	৬ " ২২ এপ্রিল	৭ "	১৯৬৮	১ "	২ "
১৯৬৪	১০ এপ্রিল	২১ সেপ্টেম্বর	১৯৬৯	১৬ জানুয়ারী	১৬ অক্টোবর
১৯৬৫	২৩ মার্চ	৩ "	১৯৭০	২০ এপ্রিল	৩০ সেপ্টেম্বর

৮নং তালিকা। নিম্নলিখিত সময়ে শুক্র (Venus)কে দেখার সুযোগ হবে।

সন	সন্ধ্যাবেলা (পশ্চিম আকাশে)	ভোরবেলা (পুব আকাশে)	সন	সন্ধ্যাবেলা (পশ্চিম আকাশে)	ভোরবেলা (পুব আকাশে)
১৯৬১	জানুয়ারী-মার্চ	এপ্রিল-অক্টোবর	১৯৬৬	...	ফেব্রুয়ারী-আগস্ট
১৯৬১	এপ্রিল-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	১৯৬৭	ফেব্রুয়ারী-আগস্ট	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
১৯৬৩	নভেম্বর-ডিসেম্বর	জানুয়ারী-জুন	১৯৬৮	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	জানুয়ারী-মার্চ
১৯৬৪	জানুয়ারী-মে	জুলাই-ডিসেম্বর	১৯৬৯	জানুয়ারী-মার্চ	এপ্রিল-অক্টোবর
১৯৬৫	জুন-ডিসেম্বর	জানুয়ারী	১৯৭০	এপ্রিল-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর

৯নং তালিকা। আগামী কয়েক বছরের প্রতিযোগ-অবস্থানে মঙ্গল (Mars)কে কোন সময় কোন রাশিতে (সূর্যপথের ৭ ডিগ্রীর মধ্যে) থাকবে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

সন	প্রতিযোগ-অবস্থান		সন	প্রতিযোগ-অবস্থান	
	মাস	রাশি		মাস	রাশি
১৯৬১	জানুয়ারী	মিথুন	১৯৬৭	এপ্রিল	কন্যা
১৯৬৩	ফেব্রুয়ারী	কর্কট	১৯৬৯	জুন	বৃশ্চিক
১৯৬৫	মার্চ	সিংহ, কন্যা			

১০নং তালিকা। বিভিন্ন সময়ে **বৃহস্পতি** (Jupiter) নিম্নলিখিত নক্ষত্রমণ্ডলগুলিতে (সূর্যপথের ২ ডিগ্রীর মধ্যে) অবস্থান করবে।

সন	নক্ষত্রমণ্ডল	সন	নক্ষত্রমণ্ডল
১৯৬১	ধনু, মকর	১৯৬৬	বৃষ, মিথুন, কর্কট
১৯৬২	মকর, কুম্ভ	১৯৬৭	কর্কট, সিংহ
১৯৬৩	কুম্ভ, মীন	১৯৬৮	সিংহ, কন্যা
১৯৬৪	মীন, মেষ	১৯৬৯	কন্যা
১৯৬৫	মেষ, বৃষ	১৯৭০	কন্যা, তুলা

১১নং তালিকা। বিভিন্ন সময়ে **শনি** (Saturn) নিম্নলিখিত নক্ষত্রমণ্ডলগুলিতে (সূর্যপথের ৩ ডিগ্রীর মধ্যে) অবস্থান করবে।

সন	নক্ষত্রমণ্ডল	সন	নক্ষত্রমণ্ডল
১৯৬১	ধনু, মকর	১৯৬৬	মীন
১৯৬২	মকর	১৯৬৭	মীন
১৯৬৩	মকর	১৯৬৮	মীন
১৯৬৪	মকর, কুম্ভ	১৯৬৯	মীন, মেষ
১৯৬৫	কুম্ভ	১৯৭০	মেষ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাকাশ-জয়ের পরিকল্পনা

জলে, স্থলে ও আকাশে মানুষের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তবুও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তার কল্পনা-বিলাসী মন স্বপ্ন দেখছে কবে সে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি জমাবে নিঃসীম নীল আকাশের দিকে। সুদূর নভচারী হংস-বলাকাদের পেছনে রেখে সে ছুটে যাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।


চিত্র ১১৭। গাগারিন (মহাকাশে যাত্রার আগে)

মানুষের এই স্বপ্ন প্রায় সফল হবার পথে। কারণ ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে সোভিয়েট রাশিয়া একজন মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করেছে এবং তাঁকে জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে মাটির পৃথিবীতে।

এই দুঃসাহসী মহাকাশ-বিজয়ীর নাম ইউরি গাগারিন। বয়স ২৭ বছর, দু'টি কন্যার জনক। প্রায় পাঁচ টন ওজনের একখানা মহাকাশযানে তিনি ১০৮ মিনিট মহাকাশে ছিলেন,

পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন একবারের সামান্য একটু বেশি। মহাকাশ-যানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভোস্টক' (প্রাচী)। 'ভোস্টক' যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, তখন তার দূরত্ব ছিল ১০৯ মাইল। আর সবচেয়ে দূরে থাকাকালে তার দূরত্ব ছিল ১৮৭ মাইল। পৃথিবী পরিক্রমা করতে সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট। এই সময় 'ভোস্টক'-এর গতিবেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ১৭০০০ মাইল, অর্থাৎ সেই অবধি মানুষ যত দ্রুতবেগে চলতে সক্ষম হয়েছে তার প্রায় ছ'গুণ।



চিত্র ১১৮
গাগারিনকে নিয়ে রকেট মহাকাশে উঠছে

মহাকাশ থেকে গাগারিন যেসব বেতার-বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, মস্কো থেকে তার রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়েছে। তিনি বলেন,—"পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে,—পরিষ্কারভাবে আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।" কিছুক্ষণ পরে আবার— "মহাকাশ - যান স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি······সব-কিছু দেখতে পাচ্ছি,········আমার ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যলোকে টুকরো টুকরো মেঘ।" কিছুক্ষণ পরে আবার —"পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছি, সব-কিছু স্বাভাবিক, যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে,······এগিয়ে চলছি।"

মহাকাশ-যান থেকে গাগারিনের শেষ বার্তা—"বেশ সুস্থ আছি, স্ফূর্তিতে রয়েছি······মহাকাশ-যানে চড়ে বেশতো প্রদক্ষিণ করছি পৃথিবীকে।

সব ভালো, চমৎকার……যন্ত্রপাতিগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে।"

পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার পরে গাগারিন বলেছেন,—"দেখলাম আকাশ অন্ধকার, অতি-মাত্রায় অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। পৃথিবীর রং নীলাভ, তা সত্ত্বেও সব-কিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। খুব উঁচুতে উঠে জেট-প্লেন থেকে যেমন দেখা যায়, পৃথিবীকে আমি সেরকম দেখেছি। পাহাড়, বন, দ্বীপ সব-কিছু পরিষ্কার দেখা গেছে।"

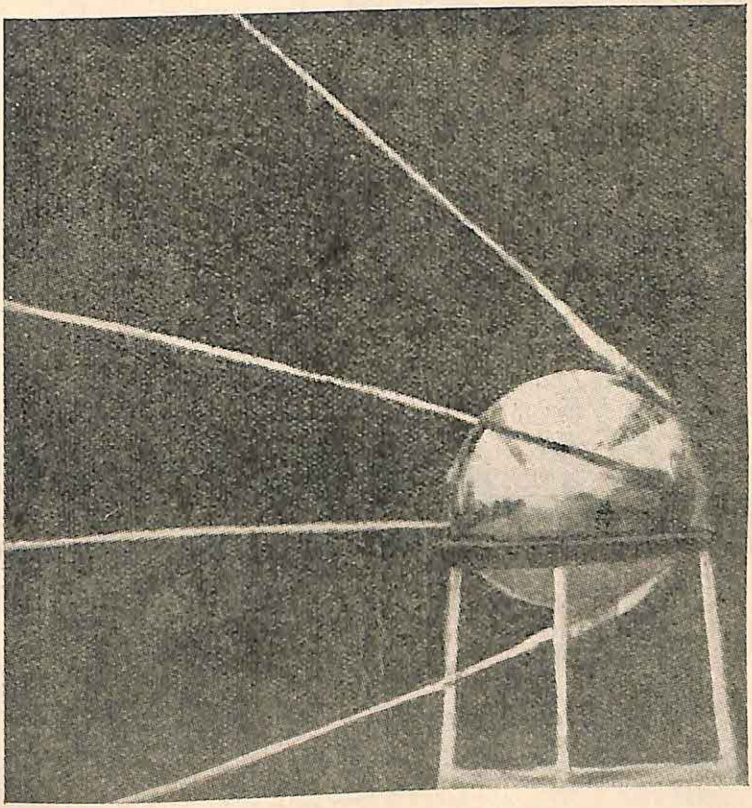


চিত্র ১১৯
মহাকাশ-বিজয়ী মেজর ইউরি গাগারিন

আলোকিত অংশ থেকে অন্ধকার নিবিড় কালো আকাশের, যে আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় তার, বর্ণময় রূপ-পরিবর্তন তিনি দেখেছেন। এই সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ, যেন একটি সূক্ষ্ম মেখলা জড়ানো রয়েছে পৃথিবীর গায়ে। দিগন্তের দৃশ্য সত্যিই অনুপম। উপরে উঠে পৃথিবীকে দেখে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠেন, "কী সুন্দর এই পৃথিবী!"

মহাকাশ-জয়ের প্রতিযোগিতা

মহাকাশ-জয়ের প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। সেদিন সারা পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে শুনলো, রাশিয়ার



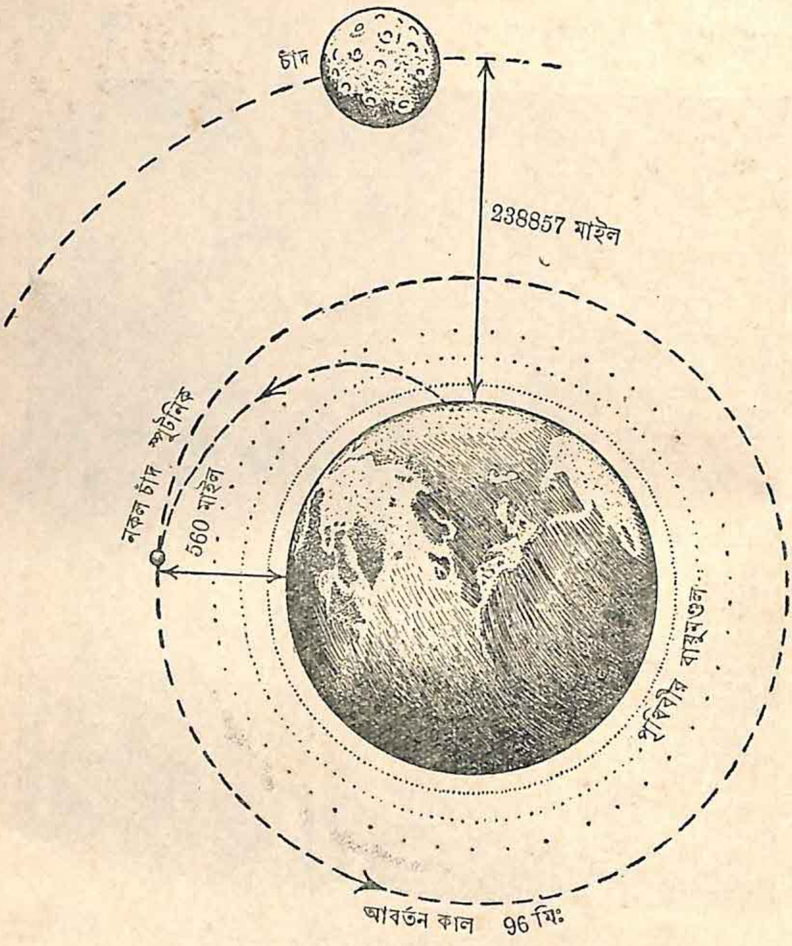
চিত্র ১২০। ঊর্ধ্বাকাশে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহের স্পুৎনিকের ছবি। উপগ্রহটির চারটি অ্যান্টিনাও দেখা যাচ্ছে।

[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুৎনিক' (শিশুচাঁদ) ৫৬০ মাইল উপর দিয়ে একটি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এর ওজন ৮৩·৬ কিলোগ্রাম; কক্ষপথে

আবর্তনের সময় ৯৬ মিনিটে। পৃথিবীর মানুষ উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলো আগামী ইতিহাসের পদধ্বনি—বিপ, বিপ, বিপ।

এক মাস পরেই রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুৎনিক আকাশে উঠলো জীবন্ত

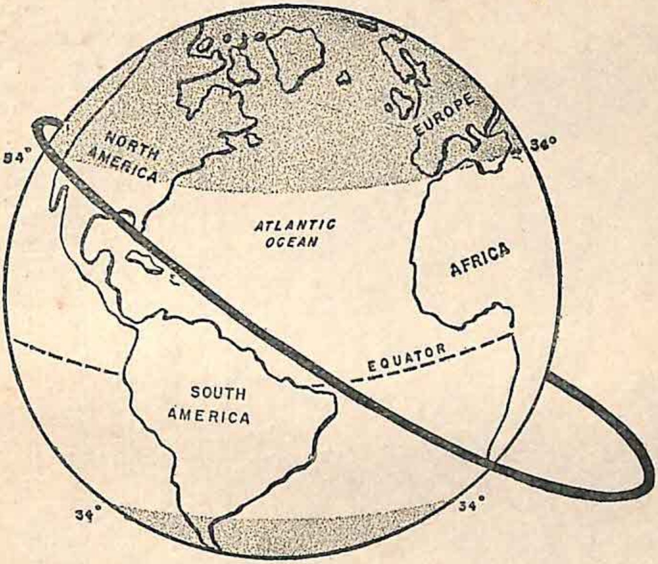


চিত্র ১২১। সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিকের কক্ষপথ।

কুকুর লাইকাকে সঙ্গে নিয়ে। এর ওজন প্রথমটির প্রায় ছ'গুণ। মহাকাশের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটি মহাকাশেই মারা গেল, জীবিত অবস্থায় তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ল না। তবুও এই অভিযান থেকে

এমন অনেক তথ্য সংগৃহীত হ'ল যার ফলে ভবিষ্যৎ অভিযানের সাফল্য সুনিশ্চিত হ'ল।

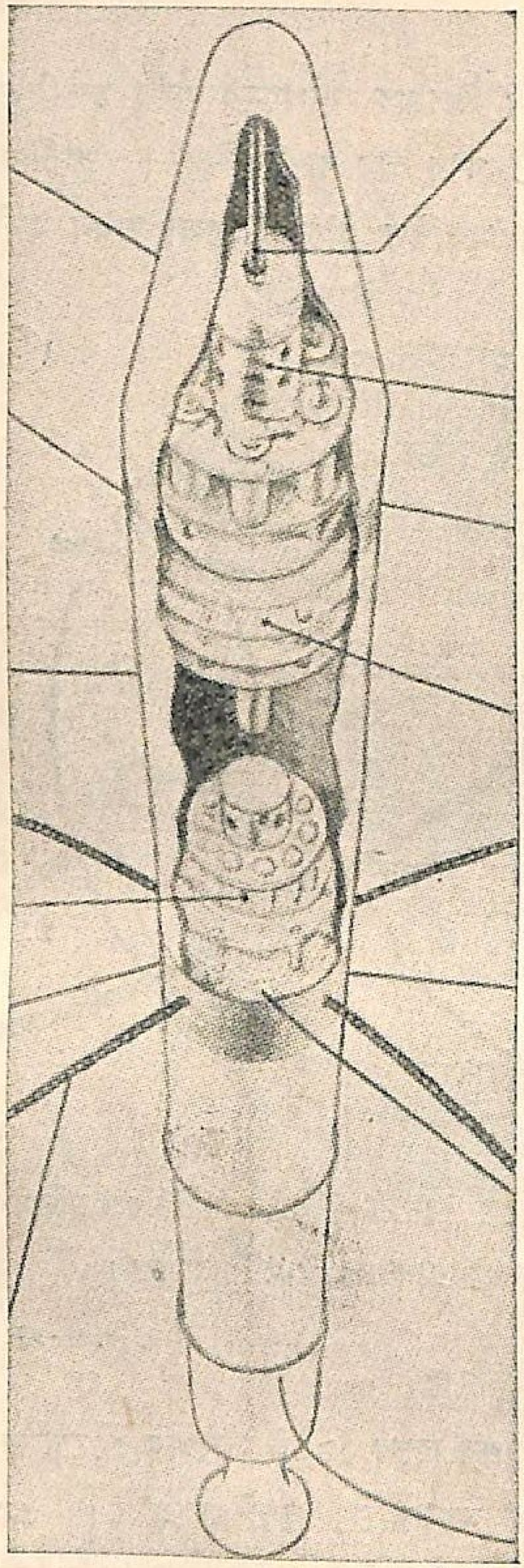
মার্কিন দেশেও কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা চলছিল কয়েক বছর ধরে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। রাশিয়ার অভাবনীয় সাফল্যে যখন সারা পৃথিবী মুখরিত হ'য়ে উঠলো তখন মার্কিন দেশে এই



চিত্র ১২২। মোটা কালো রেখাটি পৃথিবীর চারিদিকে কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারের কক্ষপথ নির্দেশ করছে।

[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

উদ্যম তীব্রতর করা হ'ল। এর ফলে ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী প্রথম মার্কিন উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার' মহাকাশে স্থাপিত হ'ল। এর ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড, আবর্তনের সময় ১১৪ মিনিট। কক্ষপথের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান বা অনুভূ (perigee) ২৩০ মাইল, আর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান বা অপভূ (apogee) ১৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত।



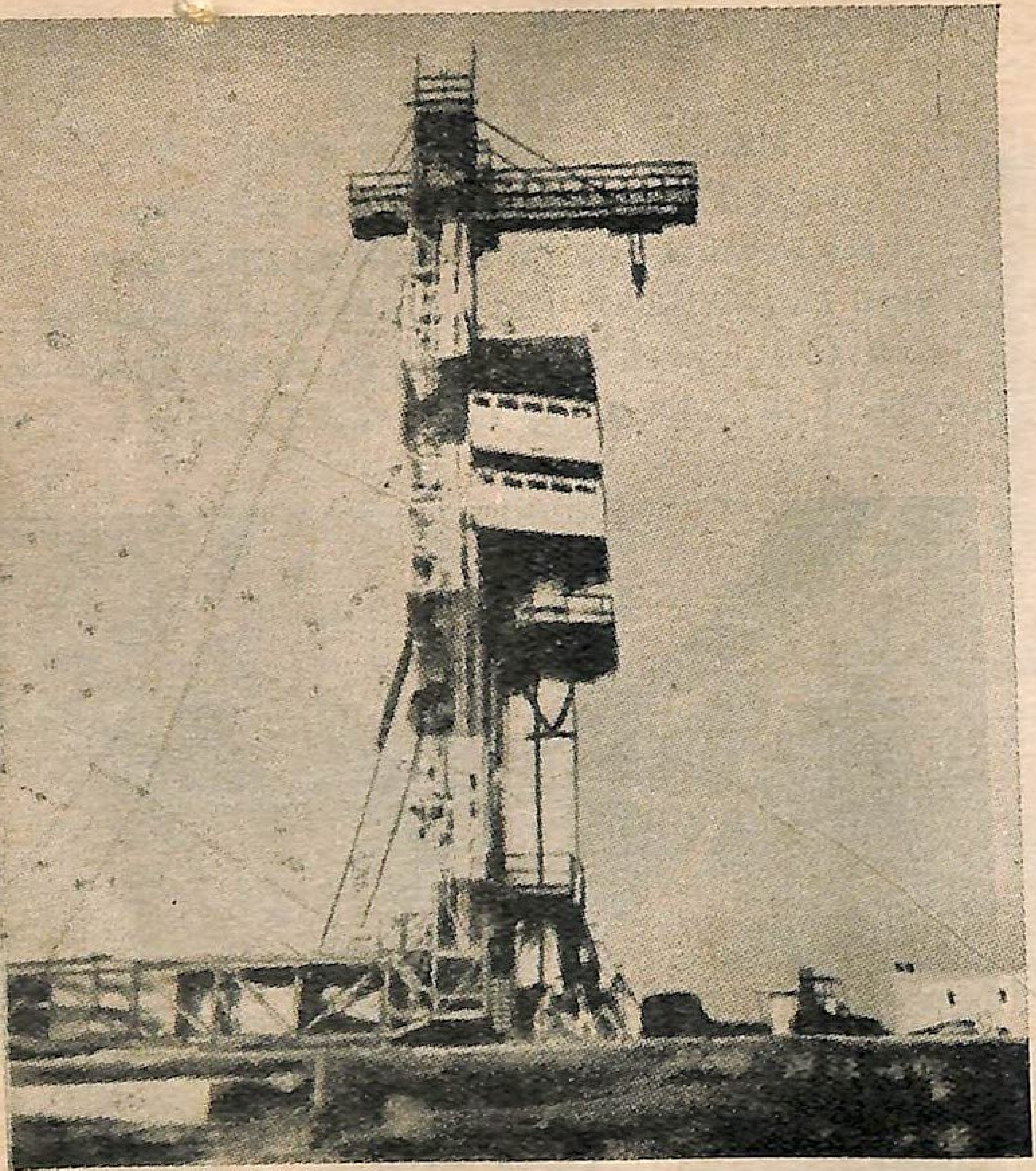
চিত্র ১২৩। আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার'বাহী রকেটের নক্শা। ছবির সামনের দিক—কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রপাতি-বাহিত অংশ। পেছনের দিক উপগ্রহের সহিত সংলগ্ন ভ্রমণকারী রকেটের শেষ পর্যায়।

[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



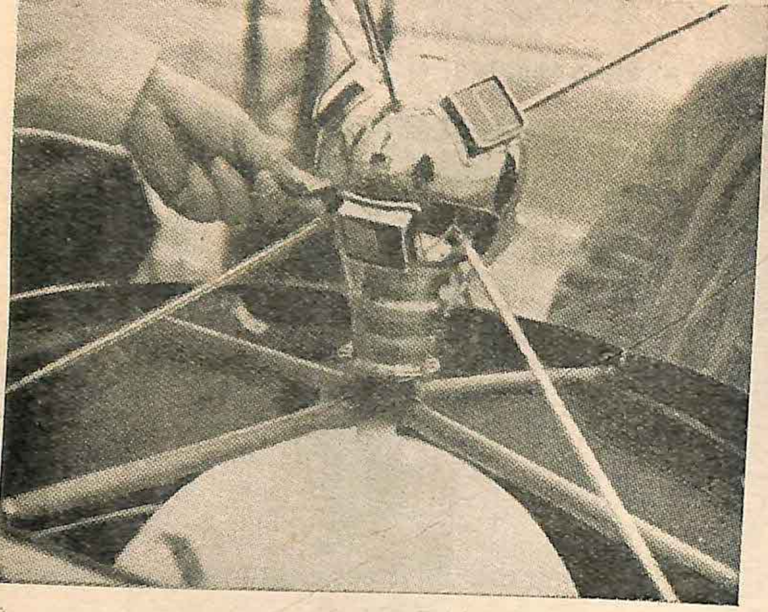
চিত্র ১২৪। জুপিটার-সি রকেটটি ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল পরীক্ষা-কেন্দ্র থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারকে নিয়ে মহাশূন্যে যাত্রা করছে।

[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ১২৫। কৃত্রিম উপগ্রহবাহী জুপিটার-সি রকেটটির ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার আগের দৃশ্য।

[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ১২৭। আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বিতীয় 'এক্সপ্লোরার'। এটি কেপ ক্যানাভেরাল থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ। এর মধ্যে দু'টি রেডিও যন্ত্র স্থাপিত হয়। সৌরশক্তি-চালিত রেডিও থেকে উপগ্রহের অ্যালুমিনিয়াম-আবরণীর তাপমাত্রার খবর পাওয়া গেছে, আর সাধারণ ব্যাটারীর সাহায্যে চালিত রেডিওটি উপগ্রহের ভেতরকার তাপমাত্রার সংবাদ প্রেরণ করেছে।

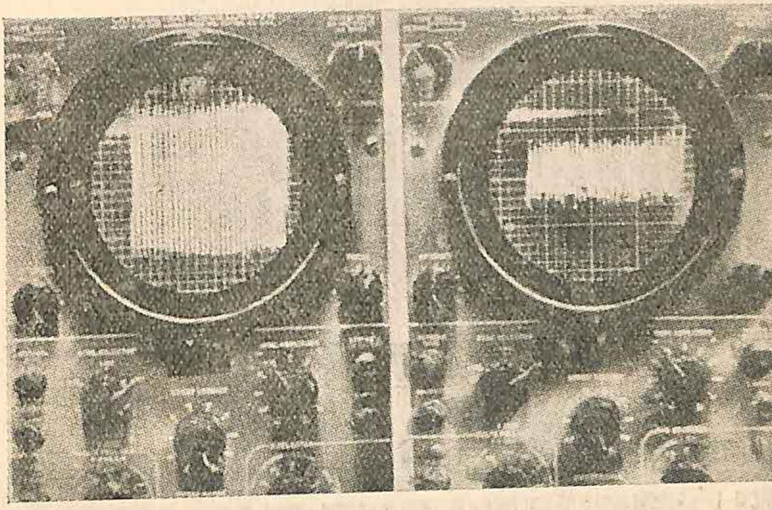
[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ১২৬। কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বিতীয় এক্সপ্লোরার-এর মধ্যে এই ক্ষুদ্রাকৃতি টেপ-রেকর্ডারটি স্থাপিত হয়। এর সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত তথ্যাদি ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত হয়েছে।

[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

এরপর আমেরিকা এবং রাশিয়া থেকে পর পর অনেকগুলি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারেই রাশিয়ার উপগ্রহ নূতন ইতিহাস রচনা করেছে। আমেরিকার উপগ্রহ তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি।

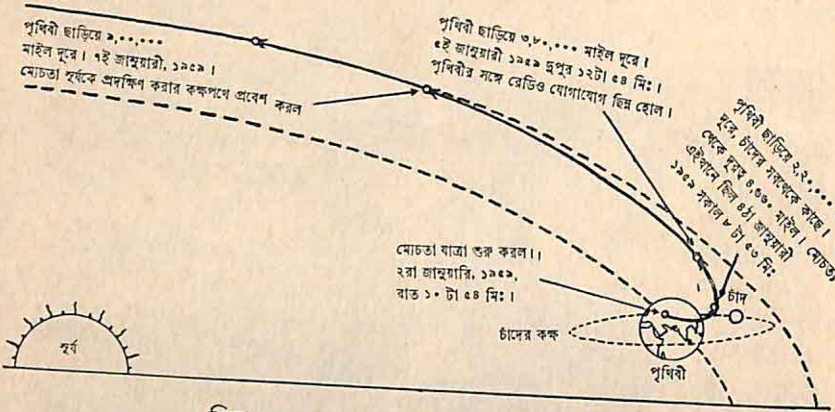


চিত্র ১২৮। কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার থেকে প্রাপ্ত রেডিও-সংকেতের অসিলোগ্রাফ রেকর্ড। এক্সপ্লোরার ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। এই কক্ষপথের অনুভূর (নিকটতম বিন্দুর) দূরত্ব ২৩০ মাইল এবং অপভূর (দূরতম বিন্দুর) দূরত্ব ১৬০০ মাইল। বাঁ-দিকের সংকেতটি অনুভূ থেকে এবং ডানদিকের সংকেতটি অপভূ থেকে গৃহীত রেকর্ড।

[ব. বি. প.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়ার প্রথম 'লুনিক' চন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করে। দুঃখের বিষয় তা চাঁদের প্রায় ৪,৬৬০ মাইল দূর দিয়ে চাঁদের এলাকা অতিক্রম ক'রে যায় এবং শেষে একটি কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। হিসেব অনুযায়ী এই কক্ষ উপবৃত্তাকার এবং পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের মাঝে অবস্থিত। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে

আসতে এর সময় লাগবে প্রায় পনের মাস। এভাবে পৃথিবীর মানুষ সৌরজগতে একটি নকল গ্রহ স্থাপন করতেও সক্ষম হ'ল। সেই অবধি কোন রকেট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশে যেতে পারেনি। তাই

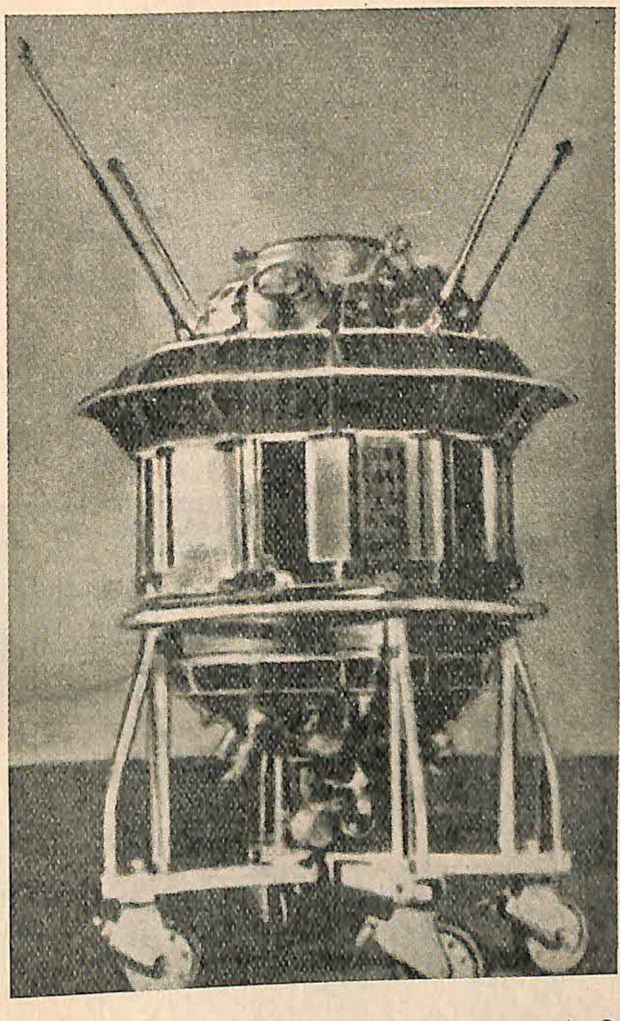


চিত্র ১২৯। নকল গ্রহ ম্যেচতার গতিপথ।

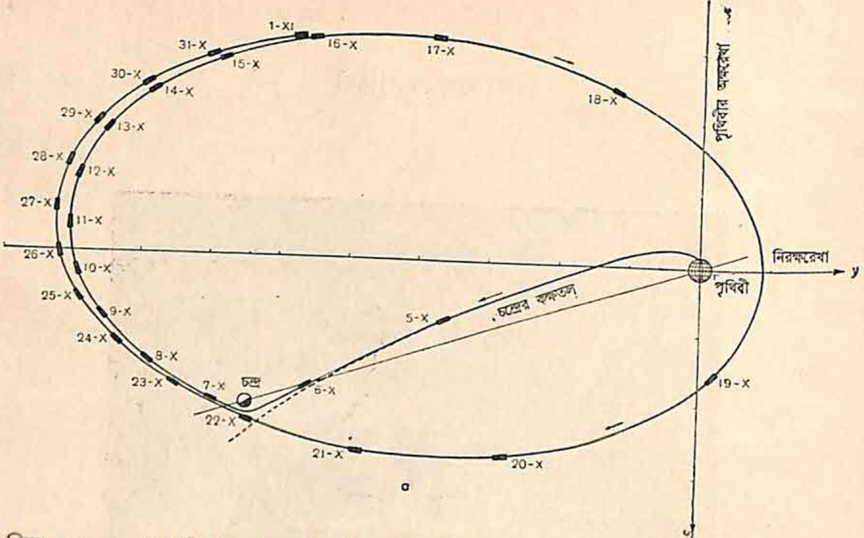
এই ঘটনাটি আন্তগ্র্হ যোগাযোগের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। নূতন গ্রহটি মানুষের বহুকালের স্বপ্ন সফল করলো, তাই রুশ বিজ্ঞানীরা তার নূতন নামকরণ করলেন 'ম্যেচতা' (স্বপ্ন)।

প্রথম 'লুনিক' লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেও দ্বিতীয় 'লুনিক' সাফল্যের সঙ্গে চাঁদে গিয়ে পৌঁছালো ১৩ই সেপ্টেম্বর। পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছাতে এর সময় লাগলো প্রায় ৩৪ ঘণ্টা। এই সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত হ'ল কাস্তে ও হাতুড়ি চিহ্নিত সোভিয়েট সরকারের প্রতীক। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন চন্দ্রের অধিকার নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয় তবে রুশরা যে অগ্রাধিকারের দাবি পেশ করবে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

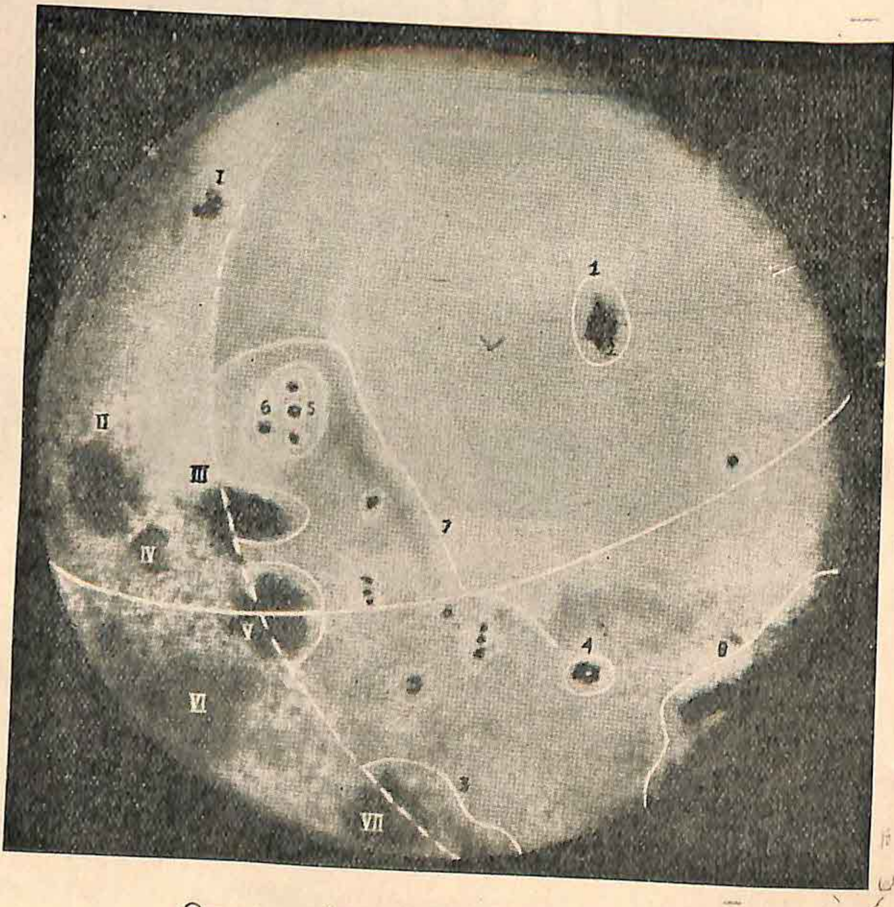
১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবরের খবর আরও চমকপ্রদ। রাশিয়া চাঁদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্যে মহাকাশে স্থাপন করলো একটি উড়ন্ত পর্যবেক্ষণাগার। তৃতীয় 'লুনিক' পৃথিবী থেকে চাঁদের যে-দিকটা দেখা যায় না, সে-দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করলো এবং স্বয়ংক্রিয় বেতারবীক্ষণ (Television) ব্যবস্থায় সেই ছবি পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে।



চিত্র ১৩০। চাঁদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত উড়ন্ত পর্যবেক্ষণাগার তৃতীয় 'লুনিক'। এর সাহায্যে চাঁদের যে-দিকটা দেখা যায় না তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে।



চিত্র ১৩১। স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশনের গতিপথ। যাত্রাকাল থেকে আরম্ভ ক'রে ১লা নভেম্বর (১৯৫৯) পর্যন্ত প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর, আন্তর্জাতিক সময় ০ ঘণ্টায়, স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশনের অবস্থান ▬ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ১৩২। চাঁদের অদৃশ্য অংশের আলোকচিত্র।

পরিচয়-লিপি

1. মস্কো সাগর—এর ব্যাস প্রায় ৩০০ কিলোমিটার (প্রায় ১৮৬ মাইল)
2. এস্ট্রোনট্স উপসাগর
3. দক্ষিণ সাগরের কিছু অংশ
4. সিওলকোভ্স্কি—একটি গিরি-কেন্দ্রিক গহ্বর, এর ব্যাস প্রায় ১০০ কিলোমিটার (প্রায় ৬০ মাইল)
5. লমোনোসভ—একটি গিরিকেন্দ্রিক গহ্বর
6. জ্যোলিওক্যুরি—একটি গহ্বর
7. সোভিয়েট পর্বতমালা
8. স্বপ্ন সাগর

চাঁদের যে-দিকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় তারও কিছু অংশ এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে, যেমন—

I. হামবোল্ট সাগর (Humboldt's Sea)
II. সংকটের সাগর (The Sea of Crisis)
III. প্রান্তস্থ সাগর (The Marginal Sea)
IV. ঢেউয়ের সাগর (The Sea of Waves)
V. স্মাইথের সাগর (Smyth's Sea)
VI. উর্বরতার সাগর (The Sea of Fertility)
VII. দক্ষিণের সাগর (The Southern Sea)

এই ছবিতে দেখা যায়, চাঁদের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই একঘেয়ে। তবে চন্দ্র-পৃষ্ঠে বহুদূরবিস্তৃত সাদা অংশের স্থানে স্থানে রয়েছে ছোটবড় কতগুলি কালো দাগ। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের তাৎপর্য বোঝা কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই চিত্র দেখেই সাগর-উপসাগর, পাহাড়-পর্বত, গর্ত প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং তাদের নামকরণও করেছেন। চাঁদের যে-দিকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় তারও কিছু অংশের চিত্র এই সঙ্গে উঠেছে।

এরপর মহাকাশ অভিযানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সুরু হ'ল। ১৯৬০ সালের ১৯শে আগস্ট রাশিয়া একটি উপগ্রহে ক'রে 'স্ত্রেল্কা' ও 'বেল্কা' নামে দু'টি কুকুরকে মহাকাশ-পরিক্রমায় পাঠিয়ে আবার

পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হ'ল। শুধু তাই নয়, ক্যাপসুলের মধ্যে এদের সঙ্গে কয়েকটি ইঁদুর, কতগুলি মাছি এবং কতগুলি উদ্ভিদ্‌ও পাঠানো হয়।



চিত্র ১৩৩। স্ত্রেল্‌কা।

অতিকায় এই মহাকাশ-যানটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে চার টন। পৃথিবী থেকে গড়ে প্রায় ২০০ মাইল ঊর্ধ্বে থেকে তা প্রায় দেড় ঘণ্টায়

একবার ক'রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে। এভাবে মহাকাশের কক্ষপথে ১৭ বার ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ ক'রে ১৮ বারের বার মানুষের ইঙ্গিতে তা আবার ভূ-পৃষ্ঠে নেমে এসেছে—যেখানে নামবার কথা ছিল সেখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে। মহাজাগতিক মানদণ্ডে এই বিচ্যুতি একেবারেই তুচ্ছ বলা যায়।

মহাশূন্যে থাকাকালে মহাকাশ-যানের আরোহী কুকুর দু'টির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় স্বয়ংক্রিয় বেতারবীক্ষণ ব্যবস্থায়। নীচে তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করা হ'ল।

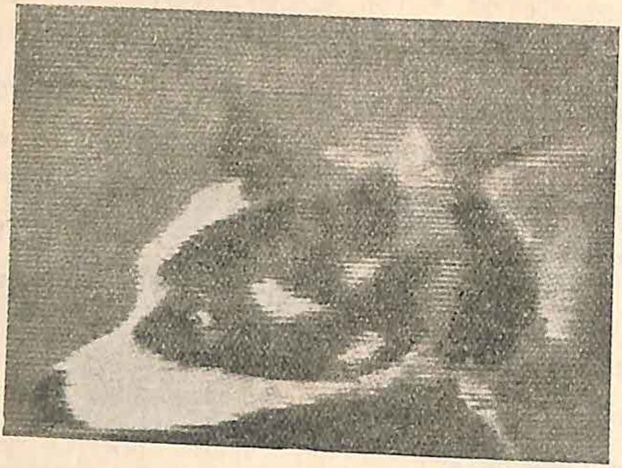
"রকেটটি যখন যাত্রা করলো তখন কুকুর দু'টির কান খাড়া হ'য়ে উঠলো, তারা হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়লো। কয়েক মিনিট পরে তাদের চোখে



চিত্র ১৩৪। বেল্‌কা।

মহাকাশের প্রথম যাত্রী, যারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছে।

দেখা দিল উদ্বেগের ছায়া—তারা এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে আরম্ভ করলো। মহাকাশ-যানের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তাদের যেন নীচের



চিত্র ১৩৫। স্ত্রেল্‌কা।



চিত্র ১৩৬। বেল্‌কা।

সোভিয়েট মহাকাশ-যানে বসানো একটি টেলিভিসন-যন্ত্র এই ফটো প্রেরণ করেছে।

দিকে টেনে ধরলো। রকেটের গতি যত বাড়তে থাকলো ততই তারা চেপ্টে যেতে লাগলো মাধ্যাকর্ষণের টানে। স্ত্রেল্‌কা ছটফট ক'রে এদিকওদিক তাকাতে আরম্ভ করলো। এরপর কিছুক্ষণ উভয়েই একেবারে শান্ত। রকেট ভারশূন্য-লোকে গিয়ে প্রবেশ করলো। কুকুর হু'টি তখন কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো, যেন প্রাণহীন, যেন তাদের গ্রন্থিগুলি সব খুলে গেছে। রকেটটি কক্ষপথে পৌঁছাবার পর এদের নাড়ী-স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ স্বাভাবিক হ'য়ে এল। তখন তারা আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। 'বেল্‌কা' রেগে কয়েক বার ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে তারা এই নূতন অবস্থায় ক্রমশ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলো। তখন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা খাবারের বাক্সটির ঢাকনা খুলে দিতেই তারা খেতে আরম্ভ করলো।"

অবতরণের পর কেবিনের দরজা খুলে দিতেই 'স্ত্রেল্‌কা' এবং 'বেল্‌কা' লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দর্শকদের গা চাটতে লাগলো, আর লেজ



চিত্র ১৩৭। মহাকাশ থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের পর স্ত্রেল্‌কা ও বেল্‌কা মস্কো রেডিওর ঘোষণায় অংশগ্রহণ করছে।

নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। ছাড়া পাওয়ার পর তারা সাগ্রহে খাওয়া-দাওয়া করলো। তারপর তাদের মস্কোয় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

এই প্রসঙ্গে সেপ্টেম্বর মাসের 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকায় লেখা হয়, —"ছোট ও বড় ইঁদুরগুলির উড্ডয়নকালীন আচার-আচরণ বিজ্ঞানীরা জানিতে পারিয়াছেন উহারা নিরাপদে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিবার পরে, আগে নয়। যেসব ছোট খাঁচার মধ্যে করিয়া উহাদের মহাশূন্যে পাঠানো হইয়াছিল সেই খাঁচাগুলির মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আসিয়াও ছুটাছুটি করিয়াছে, চিঁ-চিঁ আওয়াজ তুলিয়াছে। এই ব্যাপার হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় মহাশূন্যে উহারা মোটামুটি ভালোই ছিল। উহাদের বর্তমান অবস্থা চমৎকার। এত কাণ্ডের পরেও ইঁদুরগুলির ক্ষুধা কিন্তু একতিলও কমে নাই।

সাদা ও কালো রঙের বিভিন্ন জাতের ইঁদুর পাঠানো হইয়াছিল। মহাকাশ-যানের রেডিয়েশন-রোধী বা রশ্মি-বিচ্ছুরণ-রোধী বর্ম যথেষ্ট নিখুঁত ও মজবুত কিনা তাহা নির্ণয়ের কাজে কালো ইঁদুরগুলি বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এই কালো ইঁদুররা যদি রেডিয়েশন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুকাল বাদেই উহাদের লোম সাদা হইতে সুরু করিবে।

মাছিগুলিও নিরাপদে ফিরিয়াছে। প্রতিটি বোতলে ছিল পঞ্চাশটি করিয়া মাছি। মহাশূন্যে উহাদের মতিগতি সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। তবে ফিরিয়া আসিয়া উহারা যথারীতি গুন্‌গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, যেন ইতিমধ্যে উহাদের জীবনে নূতন কিছুই ঘটে নাই। বিজ্ঞানীদের কাছে এই মাছিগুলির মূল্য আছে। তাঁহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মালমসলা হিসাবে ইহারা কাজ করিবে।

মহাশূন্য-যানের মধ্যে আমাদের বসুন্ধরার আর একটি 'বার্তাবহ'-ও ছিল—কিছু কিছু উদ্ভিদ্। একটি স্বচ্ছ প্লেক্সিগ্লাস পাত্রে ঐ নরম নমনীয় সবুজ প্রতিনিধিদের রাখা হইয়াছিল। একটি যাত্রী উদ্ভিদের পুষ্পায়ন সুরু হইয়াছিল পৃথিবীতে থাকিতেই, ফিরিয়া আসিয়াও ফুল-ফোটানোর পালা সে সাঙ্গ করে নাই। স্পষ্টতই মহাব্যোমযানের কামরার মধ্যে ঐ ফুলের গাছ আবশ্যক বাতাস, তাপ ও আলো পাইয়াছে।

আর একটি উদ্ভিজ্জ সহযাত্রীর নাম ক্লোরেলা। ইহা একজাতীয় সামুদ্রিক আগাছা। এই ক্লোরেলা বিজ্ঞানীদের কাছে মস্তবড় ভরসা।

দূর-পাল্লার মহাকাশ-যাত্রায় এই উদ্ভিজ্জ মানুষের আহার্যের একটি পুষ্টিকর বিকল্প হইতে পারিবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করেন। ক্লোরেলা চটপট জন্মায়। ইহাতে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে। ক্লোরেলা মহাকাশ-যাত্রার ধাক্কা কতখানি সামলাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য উদ্ভিদ্‌-বিদ্যাবিদ্‌রা এখন স্বভাবতই উদ্‌গ্রীব।

মহাকাশ-যানটি যে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিতে পারিয়াছে এবং উহার যাত্রীরা যে সবই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে তাহা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশ-পরিক্রমার অতীব জটিল সমস্যাটির সমাধান করিয়া এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।"

রাশিয়া এভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সাফল্যের পথে। তারপর মানুষ পাঠাবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নানারকম মহড়া চলেছে অনেকদিন ধরে। শেষে একদিন এক শুভমুহূর্তে পৃথিবীর প্রথম মানুষ পাড়ি দিয়েছে মহাকাশের দিকে, পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আবার নির্বিঘ্নে নেমে এসেছে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে।

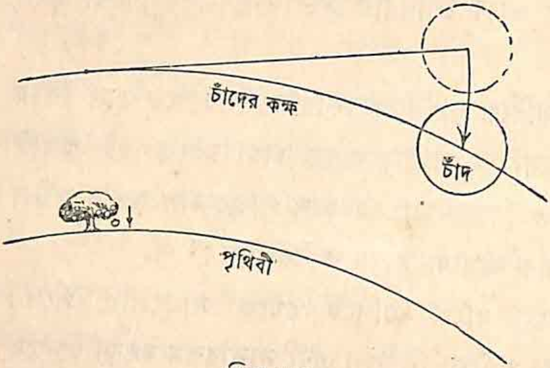
কয়েকটি সমস্যা ও তাদের সমাধান

পৃথিবীর বাধা

উপরদিকে একটা বল ছুঁড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। এর প্রধান কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ, অর্থাৎ অভিকর্ষ (Gravity)। আর একটা বাধা আছে, তা হ'ল বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ-জনিত বল। উপরদিকে কয়েক শ' মাইল পরেই বায়ু আর নেই বললেই চলে। এখন কোন-প্রকারে যদি একটা বল ছুঁড়ে এই স্তরটা পার ক'রে দেওয়া যায়, তখন বায়ুর বাধা আর থাকবে না, থাকবে শুধু অভিকর্ষের টান।

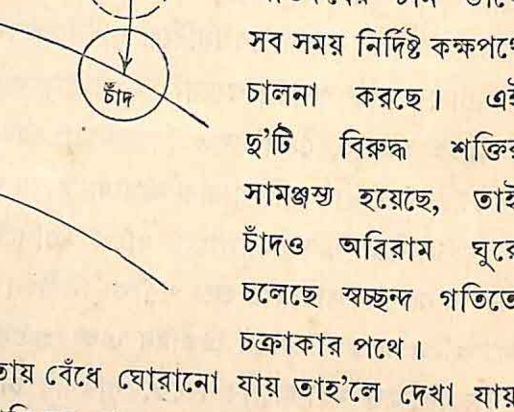
পৃথিবী সব সময়ই চাঁদকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু কই চাঁদ তো পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে না। কিসের জোরে সে অবিশ্রান্ত

ঘুরে ঘুরে চলেছে শূন্যপথে নির্দিষ্ট কক্ষে ? চাঁদ ঘণ্টায় ২,২৩৫ মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এই চক্রবেগ থাকায় চাঁদ প্রতিমুহূর্তেই তার কক্ষপথ থেকে স্পর্শক (tangent) বরাবর বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে, কিন্তু অভিকর্ষের টান তাকে সব সময় নির্দিষ্ট কক্ষপথে চালনা করছে। এই ছু'টি বিরুদ্ধ শক্তির সামঞ্জস্য হয়েছে, তাই চাঁদও অবিরাম ঘুরে চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে চক্রাকার পথে।



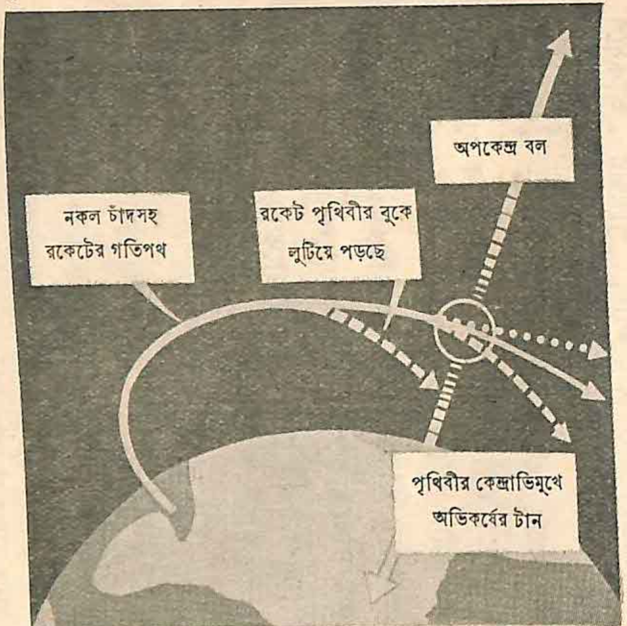
চিত্র ১৩৮

একটা ঢিলকে যদি সূতোয় বেঁধে ঘোরানো যায় তাহ'লে দেখা যায় যে, ঢিলটির একটা বহির্মুখী গতি হয় যার ফলে তা সব সময় বাইরের দিকে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু সূতোর আকর্ষণ-জনিত বল তাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। এই ছুই বিপরীত বলের সামঞ্জস্য হ'লেই ঢিলটি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে স্বচ্ছন্দ গতিতে। দৈবাৎ এই সাম্য যদি নষ্ট হয়, অর্থাৎ দৈবাৎ সূতো যদি ছিঁড়ে যায়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে ঢিলটি ছুটে যাবে বাইরের দিকে।



চিত্র ১৩৯

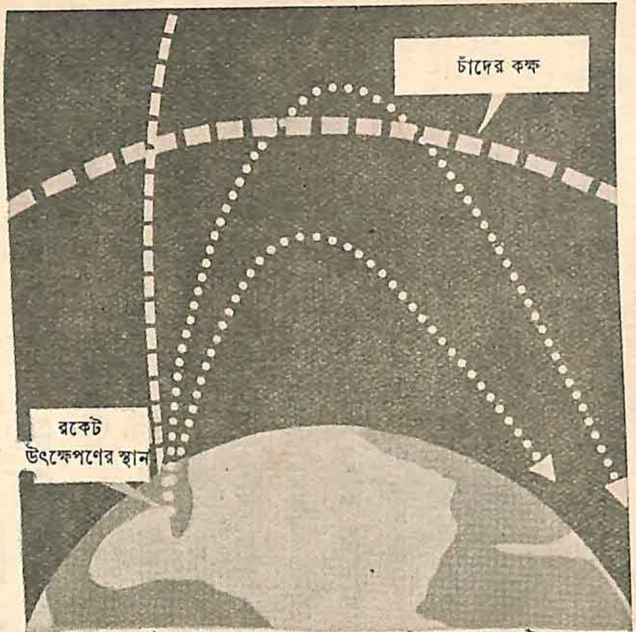
চাঁদের বেলায়ও এরকম ছু'টি বিপরীত বলের সামঞ্জস্য হয়েছে। এখন যদি কোন কারণে চাঁদের গতিবেগ কমে যায় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে



১। অভিকর্ষের টান না থাকলে, রকেটটি একটি সরলরেখা ধরে মহাশূন্যে এগিয়ে যাবে।

২। অভিকর্ষের টান অপকেন্দ্র বলের চেয়ে বেশী হ'লে, রকেটটি পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়ছে।

৩। প্রাথমিক বেগ ও কোণ ঠিক হিসেবমতো হ'লে তবেই নকল চাঁদ বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, নতুবা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে।



১। রকেটটি 'মুক্তিবেগ' অর্জন করলে, অর্থাৎ তার বেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল হ'লে, তা অধিবৃত্তাকার পথে মহাশূন্যে এগিয়ে যাবে।

২। রকেটের বেগ 'মুক্তিবেগ'-এর চেয়ে কম হ'লে তা উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

[ইউনাইটেড স্টেট্‌স ইনফরমেশন্ সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সে লুটিয়ে পড়বে পৃথিবীর উপর। আবার গতিবেগ যদি আরো বেড়ে যায় তবে সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরকালের জন্য উধাও হ'য়ে যাবে মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, কোন বস্তু যদি ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে চলে, তবেই তার পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর নাম 'মুক্তি-বেগ' (Escape velocity)। ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল গতিবেগ অর্জন করতে না পারলে কোন বস্তুই পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, একথা ঠিক। কিন্তু কোন বস্তু যদি ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বা তার চেয়ে বেশি বেগে চলতে সক্ষম হয়, তবে একটা মজার ব্যাপার হবে। ঐ বস্তুটি তখন চাঁদের মতোই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে, অর্থাৎ তা একটি নকল চাঁদে পরিণত হবে।

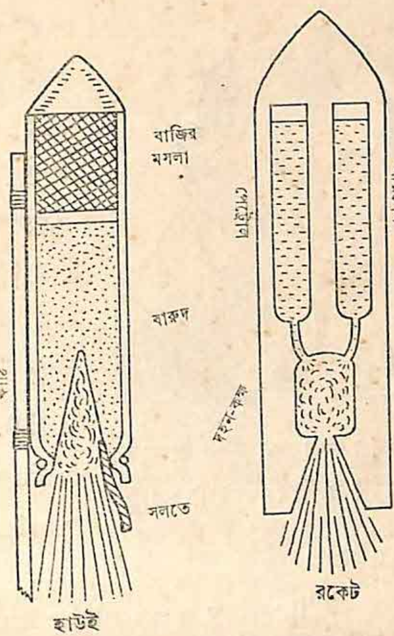
কিন্তু এক ধাক্কায় বস্তুটির গতিবেগ ২৫,০০০ মাইল বা তার কাছাকাছি করলে একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। এ হচ্ছে বাতাসের ঘর্ষণ-জনিত সমস্যা। আমরা জানি, পৃথিবীর আকর্ষণে এক-একটি উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এই উল্কাপিণ্ড এত গরম হ'য়ে ওঠে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাবার আগেই তা জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। কাজেই বিজ্ঞানীর কল্পিত মহাকাশ-যান সুরু থেকেই একটা বিরাট গতিবেগ নিয়ে এগোতে পারবে না। প্রথম দিকে মহাকাশ-যানের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম রাখতে হবে। এভাবে তাকে বাতাসের স্তরটা পার ক'রে দিতে হবে। তারপর এই বেগ ক্রমশ বাড়াতে হবে ধাপে ধাপে।

রকেট

মহাশূন্যে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে যে মহাকাশ-যান ব্যবহার করা হবে তাতে সাধারণ এরোপ্লেনের মতো কোন চালন-চক্র (Propeller) থাকলে চলবে না। কারণ পৃথিবীর কয়েক শ' মাইল উপর থেকেই বায়ু নেই বললেই চলে। আর বায়ুর অভাবে ইঞ্জিন ও চালন-চক্র দুই-ই অচল

হ'য়ে পড়ে। কাজেই মহাশূন্য-অভিযানের বর্তমান চাবিকাঠি, অর্থাৎ বাহক হচ্ছে 'রকেট' (Rocket)।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রকেটের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ হাউই-বাজীর কথা জানতো। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, ১২৩২ খৃস্টাব্দেরও আগে থেকেই চীনদেশে উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে হাউই-বাজী পোড়ানো হ'ত। তবে সেগুলি মাত্র কয়েক শ' ফুট উঠতে পারত। আর হাউই কখন কোন্‌দিকে যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না।



চিত্র ১৪২

হাউইয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেই তা প্রচণ্ডবেগে আকাশের দিকে ছুটে যায়। এর কারণ কি? বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য বিপরীতমুখী এবং সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হাউইয়ের মসলায় আগুন লাগলে তা খুব তাড়াতাড়ি পুড়তে থাকে, এর ফলে হাউইয়ের তলা দিয়ে প্রবলবেগে গ্যাস বেরুতে থাকে। এই গ্যাস বেরুনোটা হ'ল ক্রিয়া, কাজেই এর সমান বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই দেখা দেবে। অর্থাৎ ঐ গ্যাস যত জোরে তলা দিয়ে বেরুতে থাকবে, প্রতিক্রিয়া ঠিক তত জোরে হাউইটিকে উপরদিকে ঠেলা দিয়ে ওঠাতে থাকবে। যে হাউইয়ের মসলা ভালো এবং পরিমাণে বেশি হবে তা আকাশে অনেক বেশিদূর উঠবে। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রেই রকেট নির্মিত হয়েছে।

প্রথম যুগের সব রকেটেই জ্বালানি হিসেবে বারুদ ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু কঠিন জ্বালানি ব্যবহারে অসুবিধা হ'ত। কারণ রকেটের

বারুদ সমানভাবে পুড়তো না। আধুনিক রকেটের জনক মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট এইচ. গডার্ডের ধারণা হ'ল যে, কঠিন জ্বালানির সাহায্যে রকেটকে দ্রুত গতিশীল করা যাবে না। তাই তিনি তরল জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন এবং ১৯২৬ সালে তিনিই সর্বপ্রথম তরল জ্বালানির সাহায্যে রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হলেন। এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল পেট্রোল ও তরল অক্সিজেন।



চিত্র ১৪৩। আধুনিক রকেটের জনক মার্কিন-বিজ্ঞানী গডার্ড।

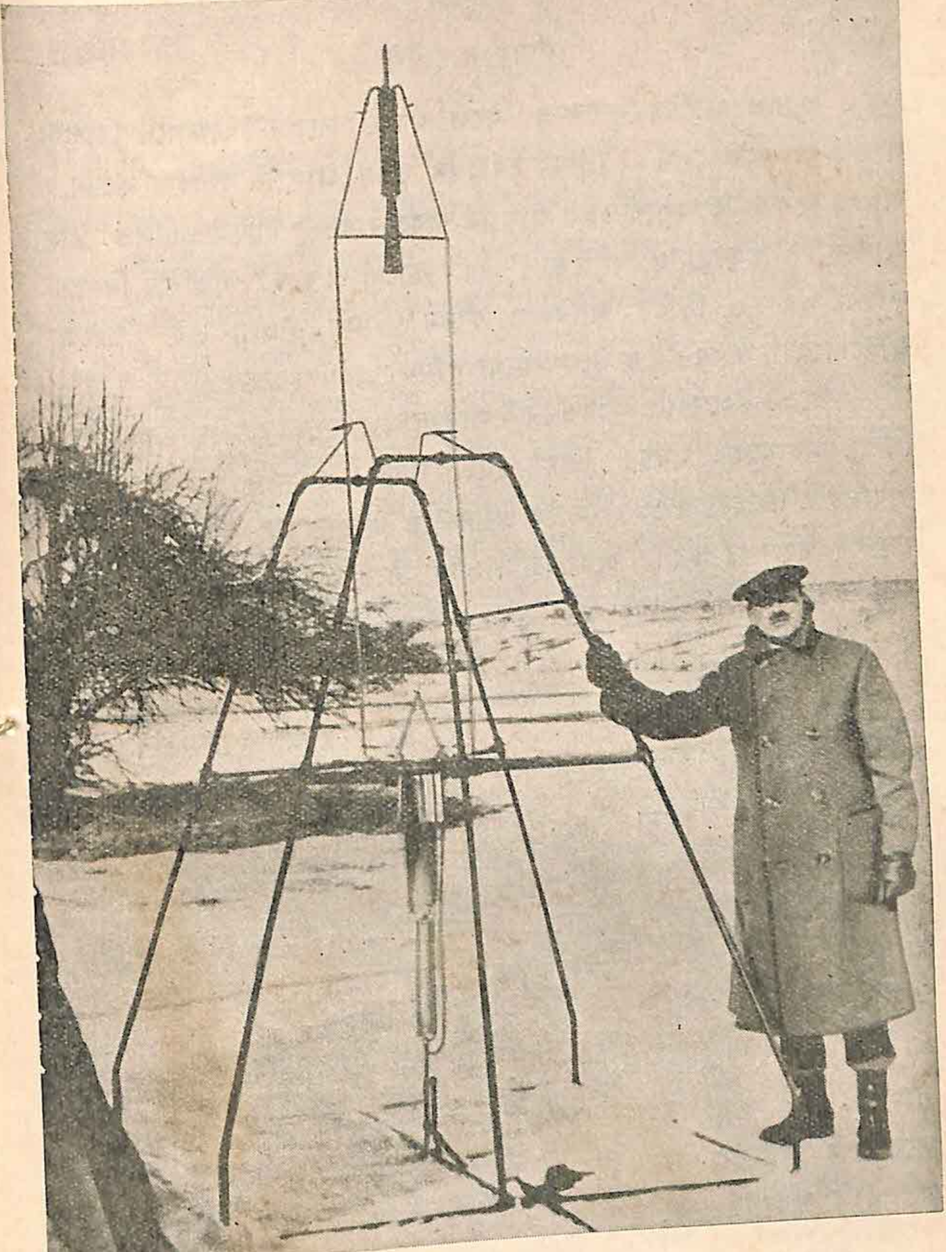
এই ঐতিহাসিক পরীক্ষা সম্পর্কে গডার্ড তাঁর ডায়েরীতে লেখেন,—"March 17, 1926. The first flight with a rocket using liquid propellants was made yesterday at Aunt Effie's farm in Auburn.

The day was clear and comparatively quiet. The anemometer on the Physics lab. was turning leisurely when Mr. Sachs and I left in the morning, and was turning as leisurely when we returned at 5-30 P.M.........

Even though the release was pulled, the rocket did not rise at first, but the flame came out, and there was a steady roar. After a number of seconds it rose, slowly until it cleared the frame, and then at express train speed, curving over to the left, and striking the ice and snow, still going at a rapid rate.

It looked almost magical as it rose, without any appreciably greater noise or flame, as if it said 'I have been here long enough ; I think I'll be going somewhere else, if you don't mind'. ...."*

* Profile of America—p. 226.



চিত্র ১৪৪। গডার্ড এবং তাঁর প্রথম রকেট। ১৯২৬ সালের ১৭ই মার্চ এই রকেটটিই সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল পেট্রোল এবং তরল অক্সিজেন।

[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে গডার্ড রকেট-উৎক্ষেপণে বিশেষ সাফল্য লাভ করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তরল জ্বালানি ব্যবহার করেন। আজও রকেট-উৎক্ষেপণে তরল জ্বালানি ব্যবহার করার রীতিই প্রচলিত হ'য়ে আসছে। এ ছাড়া 'জাইরোস্কোপ'-এর সাহায্যে রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্যে জাইরোস্কোপ এখনও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে।

রকেট-উৎক্ষেপণে আরও বেশি সাফল্য লাভ করেন জার্মান বিজ্ঞানীগণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এদের নেতা ছিলেন ওয়ার্নার ফন ব্রাউন। প্রধানত এঁরই চেষ্টায় ১৯৪৪ সালে জার্মেনীতে বিখ্যাত 'V_2 উড়ন্ত বোমার' উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়। রকেটের সাহায্য নিয়ে এই বোমা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ মাইল উর্ধ্বে উঠতো এবং ২০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে সক্ষম হ'ত।

বিজ্ঞানী ভাবলেন, রকেটের উর্ধ্বগতি বন্ধ হ'য়ে যাবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে যদি তাকে আবার ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহ'লে তা নিশ্চয়ই আরও উপরে উঠবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি V_2 রকেট মাথায় ক'রে আর একটি ছোট রকেট নিয়ে উপরদিকে উঠলো। জ্বালানি শেষ হ'তেই প্রথম রকেটটি আপনা থেকে খুলে পড়ে গেল। তখন দ্বিতীয় রকেটের যাত্রা সুরু হ'ল। এর ফলে দ্বিতীয় রকেটটি মোট ২৫০ মাইল উপরে উঠতে সক্ষম হ'ল। এর গতিবেগ হ'ল ঘণ্টায় ৫০০ মাইল। বোঝা গেল, কতগুলো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যদি পর পর কয়েকবার রকেট জ্বালাবার ব্যবস্থা করা যায় তবে শেষ রকেটের পাল্লা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেড়ে যাবে। এভাবে বহুপর্যায়ী রকেটের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল।

আর একটা কথা। রকেট যখন উপরে উঠতে থাকে তখন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তার গতিপথ একটু একটু ক'রে বাঁকিয়ে দেওয়া যায়। যার ফলে উপরে উঠে রকেটটি পৃথিবীর সঙ্গে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে পারে। সেই সময় রকেটের গতিবেগ অন্তত

ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল হওয়া দরকার, তাহ'লেই সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে চাঁদের মতো, পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়বে না।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের হাতে রকেটের আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই তাঁরা চার-পাঁচ টন ওজনের মহাকাশ-যানকেও অনায়াসে কক্ষপথে স্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁদের যান্ত্রিক ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে, ইচ্ছা করলে, সৌরজগতের যে-কোন এলাকায় তাঁরা এখন রকেট পাঠাতে পারেন। বেতার-নিয়ন্ত্রণ এবং বেতার-সংযোগ ব্যবস্থাও এত নিখুঁত যে, যাত্রাপথে মহাকাশ-যান থেকে যেসব বার্তা পাঠানো হয়, সে-সবই তাঁরা নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। এভাবে পৃথিবীতে বসেই তাঁরা রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর সংগ্রহ ক'রে চলেছেন মহাকাশের কত বিচিত্র বার্তা!

এতকাল সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল মহাকাশ-যানকে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সে-সমস্যারও সমাধান ক'রে ফেলেছেন। এজন্য দরকার হয়েছে অতি নিখুঁত বেতার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যাতে ইচ্ছা করলেই যে-কোন সময়ে রকেটকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা যায়। এ বিষয়ে তাঁরা সাফল্যের প্রমাণও দিয়েছেন একাধিকবার। নামবার সময় মহাকাশ-যানের বেগ ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। সম্ভবত উল্টোদিকে রকেট চালিয়ে ব্রেক কষে কষে গতিবেগ কমানো হয়। বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে মহাকাশ-যানটি যাতে জ্বলে যেতে না পারে সেজন্য তাপ-প্রতিরোধী কোন জিনিস দিয়ে মহাকাশ-যানটি আবৃত ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা যে কেমন নিখুঁত হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় গাগারিনের বিবৃতি থেকে। তিনি বলেছেন—"পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ ক'রে মহাকাশ-যানটি যখন আবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল, তখন সেটাকে অগ্নিশিখায় একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। পোর্ট-হোলের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি মহাকাশ-যানের চারদিকে সে ভয়ংকর অগ্নিশিখার আভা দেখে নিলাম। আমাকে ঘিরে অগ্নিশিখার পুচ্ছ দুল্ছে—কিন্তু আমার কেবিনের ভিতরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল।"

একটি খবরে প্রকাশ, নামবার সময় মহাকাশ-যান থেকে গাগারিনের কেবিনটি আলাদা ক'রে ফেলা হয়, তারপর একটি জেট-প্লেনের মতোই তা পাখা মেলে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে অবতরণ করে। এভাবে নেমে আসতে গাগারিনের কয়েক ঘন্টা সময় লেগেছিল।

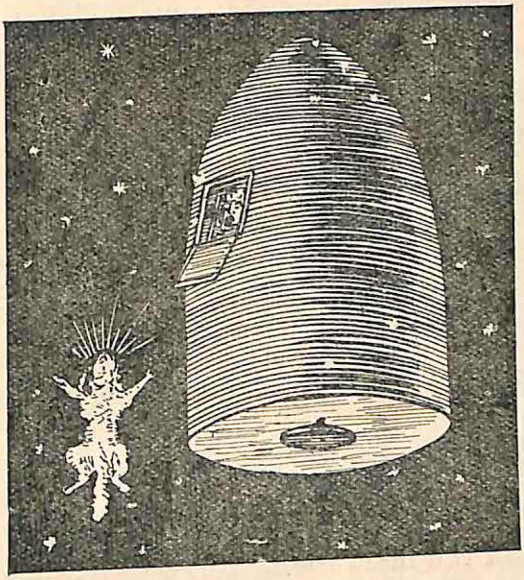
জৈব পরিবেশ সৃষ্টি

পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অথচ জীবের শ্বাসক্রিয়ার জন্য বায়ুর অক্সিজেন অপরিহার্য। এজন্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে। আর শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের ক'রে দেবার জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া যাত্রীদের সঙ্গে জল ও খাদ্যও দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে।

পৃথিবীর উপরে অবিরত মারাত্মক মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ চলেছে। পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অর্থাৎ অনিষ্টকারী মহাজাগতিক রশ্মির বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নেই। সুতরাং এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। এসব কথা বিবেচনা ক'রেই কেবিনের আবরণ এবং অভিযাত্রীদের সাজ-পোশাকের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তবে মহাশূন্যে যাবার সময় ত্বরণের (acceleration) প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে ওঠাটাই হ'ল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই ত্বরণ প্রকাশ করা হয় পৃথিবীর আকর্ষণ-জনিত ত্বরণ 'জি'-র গুণিতক হিসেবে। গণিতের নিয়ম অনুসারে ত্বরণ যত বেশি হবে, যাত্রীর ওজনও তত বেড়ে যাবে। রকেট-উৎক্ষেপণের সময় ত্বরণ সাধারণত ৫ থেকে ৮-'জি'-র মধ্যে থাকে। ত্বরণ ৫-'জি' হলে, দেড় মণ ওজনের একজন মানুষ দেহের ভার বোধ করবে প্রায় সাড়ে সাত মণ। বিজ্ঞানীদের অনুমান, গাগারিনের বেলায় ত্বরণের পরিমাপ ছিল ৫-'জি'। তা না হ'লে, গাগারিন নির্দিষ্ট কাজগুলি সব স্বাভাবিকভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ত্বরণের প্রতিক্রিয়া সহ্য করার জন্য গাগারিনকে মেঝেতে শুয়ে পা দু'টি মুড়ে চেয়ারের উপরে রাখতে হয়েছিল। কারণ রকেট-উৎক্ষেপণের সময় প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ তাঁকে মেঝেতে চেপে ধরে।

তখন এই অবস্থায়ই তাঁর কষ্ট সবচেয়ে কম হয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মহাকাশের যাত্রীকে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিয়ে হেলানো আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখলে, তাকে ত্বরণের কুফল থেকে রক্ষা করা যায়।



চিত্র ১৪৫। জুলে ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযান চাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছে। ব্যোমযানটি উৎক্ষেপণের সময় মস্তকে আঘাত লাগার ফলে "স্যাটিলাইট" নামক কুকুরটি মারা যায় এবং তাকে ব্যোমযানের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। ব্যোমযানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত কুকুরটিও আপন বেগে মহাশূন্যে এগিয়ে চলেছে, যেমন নকল চাঁদবাহী রকেট কক্ষপথে স্থাপিত নকল চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে এগিয়ে যায়।

কক্ষপথে পৌঁছে রকেট যখন ভূ-প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে তখন কিন্তু অবস্থা অন্যরকম হ'য়ে যায়, কারণ তখন মহাকর্ষ শূন্যতে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় কিছুরই ওজন থাকে না, সব-কিছু শূন্যে ভেসে থাকে। খাদ্যদ্রব্য গলার নালী দিয়ে নীচে নামতে চায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এরূপ বিপর্যয় অনেক দেখা যায়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক জুলে ভার্ন তাঁর 'চন্দ্র পরিক্রমা' নামক পুস্তকে এই অবস্থার যে কাল্পনিক বর্ণনা দিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,

But that day, about 11 a.m., Nicholl having let a tumbler escape from his hand, instead of falling, it remained suspended in the air.

"Ah !" cried Michel Arden, "this is a little amusing chemistry !"

And immediately different objects, weapons, bottles etc., left to themselves, hung suspended as if by miracle. Diana (the dog), too lifted up by Michel into space, reproduced, but without trickery, the marvellous suspensions effected by Robert Houdin and Maskelyne and Cook.

The three adventurous companions, surprised and stupefied in spite of their scientific reasoning, carried into the domain of the marvellous, felt weight go out of their bodies. When they stretched out their arms they felt no inclination to drop them. Their heads vacillated on their shoulders. Their feet no longer kept at the bottom of the projectile. They were like staggering drunkards. Imagination has created men deprived of their reflections, others deprived of their shadows ! But here reality, by the neutrality of active forces, made men in whom nothing had any weight, and who weighed nothing themselves.

Suddenly Michel, making a slight spring, left the floor and remained suspended in the air like the good monk in Murillo's *Cuisine des Anges*. His two friends joined him in an instant, and all three, in the centre of the projectile, figured a miraculous ascension.*

* Round the moon—p. 79.



চিত্র ১৪৬। জুলে ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযানের যাত্রীরা শূন্যপথে তাদের দেহের ভার হারিয়ে ফেলেছে। ভারশূন্য অবস্থায় তারা ব্যোমযানের মধ্যে ভেসে রয়েছে।

[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

গাগারিনকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "সব-কিছুই আরও সহজেই করা যাচ্ছিল। হাত ও পায়ের কোন ওজন ছিল না। আমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি, সব-কিছু পৃথিবীর মতোই হয়েছিল। আমার হাতের লেখা বদলায়নি, যদিও হাতটি ছিল ভারশূন্য। কিন্তু লেখার ব্লকটি ধরে রাখতে হয়েছিল, না হ'লে ব্লকটি শূন্যে ভেসে দূরে চলে যেত।"

ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা

মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী হওয়ার জন্য প্রতিটি যাত্রীকেই অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। প্রথমে তাকে মহাকাশ-যানের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে থাকবার অভ্যাস করতে হয়। মহাকাশ-ভ্রমণের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য-পানীয়ে অভ্যস্ত হ'তে হয়। এভাবে শিক্ষানবিশীর প্রথম পর্ব শেষ হ'লে তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। যাত্রীকে তখন অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ (রকেট-উৎক্ষেপণের সময়) এবং ভারশূন্য অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য মহড়া দিতে হয়।

নাগরদোলার মতো বিরাট এক যন্ত্রের মধ্যে একটি হেলানো আরাম-কেদারায় যাত্রীকে বসিয়ে তারপর ঘোরানো হয় বন্‌বন্‌ ক'রে। দেহের ওপর মহাকর্ষ ক্রমশ বাড়তে থাকে, হাত-পা ক্রমশ ভারি বোধ হ'তে থাকে। এই অবস্থায়ও তাকে লিভার-টানা, বোতাম-টেপা প্রভৃতি কাজ ক'রে যেতে হয়। তারপর হয়তো আস্তে আস্তে বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করা হ'ল। যাত্রীর উপরে এসবের কী প্রতিক্রিয়া হয় তারই পরীক্ষা চলতে লাগলো।

এরকম ট্রেনিংয়ের সময় একজনকে ২০০ থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর পিছনের সংখ্যাগুলি লিখতে বলা হ'ল। সে লিখে চললো—২০০, ১৯৯, ১৯৮ ইত্যাদি। কিন্তু ১৮০তে এসে সে আবার লিখতে লাগলো—১৮১, ১৮২ ইত্যাদি। এর অর্থ এই যে, যাত্রীটি অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে, কিন্তু তখনও ইচ্ছাশক্তি হারায়নি।

কিন্তু অন্য একজনের বেলায় দেখা গেল, সে একই কথা বার বার লিখে চলেছে। ক্রমে অক্ষরগুলো বড় হ'য়ে যাচ্ছে, আঁকা-বাঁকা অস্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। শেষে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে আর বাক্যটি শেষ করতে পারছে না। অর্থাৎ সে ক্রমশ ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলছে।

শূন্যলোকে যে ভারশূন্য জীবন যাপন করতে হবে সে-সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফল পাওয়া গেছে। ১৬ জনকে ৩০-৩৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় রেখে দেখা গেছে, ৮ জন সম্পূর্ণ আরামে কাটিয়েছেন। ৫ জন মোহাচ্ছন্ন ভাব অনুভব করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে যে, তাঁরা যেন অতলের দিকে নেমে যাচ্ছেন, অথবা শূন্যে উল্টোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বার বার ভারশূন্য অবস্থায় থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে, জীবদেহ ক্রমশ অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

মহাকাশের প্রতিটি যাত্রীকেই এভাবে অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবেই তাঁকে মনোনীত করা হয় মহাকাশের যাত্রী হিসেবে। বলা বাহুল্য, মহাকাশের প্রথম মানুষ-যাত্রী গাগারিনকেও এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আসতে হয়েছিল।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে

অনেকের ধারণা, মঙ্গলগ্রহে এককালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল, আর তাদেরই সভ্যতার নানা নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে মঙ্গল-পৃষ্ঠে। কাজেই মঙ্গল সম্পর্কেই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। মঙ্গলগ্রহে বেড়াতে যাওয়ার জল্পনা-কল্পনাও চলছে অনেক কাল ধরে। আর এ সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাল্পনিক কাহিনীও লেখা হয়েছে ইতিপূর্বে। সুতরাং কিভাবে মঙ্গলগ্রহে যাওয়া সম্ভব তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গাগারিনকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "সব-কিছুই আরও সহজেই করা যাচ্ছিল। হাত ও পায়ের কোন ওজন ছিল না। আমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি, সব-কিছু পৃথিবীর মতোই হয়েছিল। আমার হাতের লেখা বদলায়নি, যদিও হাতটি ছিল ভারশূন্য। কিন্তু লেখার ব্লকটি ধরে রাখতে হয়েছিল, না হ'লে ব্লকটি শূন্যে ভেসে দূরে চলে যেত।"

ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা

মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী হওয়ার জন্য প্রতিটি যাত্রীকেই অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। প্রথমে তাকে মহাকাশ-যানের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে থাকবার অভ্যাস করতে হয়। মহাকাশ-ভ্রমণের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য-পানীয়ে অভ্যস্ত হ'তে হয়। এভাবে শিক্ষানবিশীর প্রথম পর্ব শেষ হ'লে তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। যাত্রীকে তখন অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ (রকেট-উৎক্ষেপণের সময়) এবং ভারশূন্য অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য মহড়া দিতে হয়।

নাগরদোলার মতো বিরাট এক যন্ত্রের মধ্যে একটি হেলানো আরাম-কেদারায় যাত্রীকে বসিয়ে তারপর ঘোরানো হয় বন্‌বন্‌ ক'রে। দেহের ওপর মহাকর্ষ ক্রমশ বাড়তে থাকে, হাত-পা ক্রমশ ভারি বোধ হ'তে থাকে। এই অবস্থায়ও তাকে লিভার-টানা, বোতাম-টেপা প্রভৃতি কাজ ক'রে যেতে হয়। তারপর হয়তো আস্তে আস্তে বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করা হ'ল। যাত্রীর উপরে এসবের কী প্রতিক্রিয়া হয় তারই পরীক্ষা চলতে লাগলো।

এরকম ট্রেনিংয়ের সময় একজনকে ২০০ থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর পিছনের সংখ্যাগুলি লিখতে বলা হ'ল। সে লিখে চললো—২০০, ১৯৯, ১৯৮ ইত্যাদি। কিন্তু ১৮০তে এসে সে আবার লিখতে লাগলো—১৮১, ১৮২ ইত্যাদি। এর অর্থ এই যে, যাত্রীটি অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে, কিন্তু তখনও ইচ্ছাশক্তি হারায়নি।

কিন্তু অন্য একজনের বেলায় দেখা গেল, সে একই কথা বার বার লিখে চলেছে। ক্রমে অক্ষরগুলো বড় হ'য়ে যাচ্ছে, আঁকা-বাঁকা অস্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। শেষে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে আর বাক্যটি শেষ করতে পারছে না। অর্থাৎ সে ক্রমশ ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলছে।

শূন্যলোকে যে ভারশূন্য জীবন যাপন করতে হবে সে-সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফল পাওয়া গেছে। ১৬ জনকে ৩০-৩৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় রেখে দেখা গেছে, ৮ জন সম্পূর্ণ আরামে কাটিয়েছেন। ৫ জন মোহাচ্ছন্ন ভাব অনুভব করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে যে, তাঁরা যেন অতলের দিকে নেমে যাচ্ছেন, অথবা শূন্যে উল্টোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বার বার ভারশূন্য অবস্থায় থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে, জীবদেহ ক্রমশ অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

মহাকাশের প্রতিটি যাত্রীকেই এভাবে অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবেই তাঁকে মনোনীত করা হয় মহাকাশের যাত্রী হিসেবে। বলা বাহুল্য, মহাকাশের প্রথম মানুষ-যাত্রী গাগারিনকেও এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আসতে হয়েছিল।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে

অনেকের ধারণা, মঙ্গলগ্রহে এককালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল, আর তাদেরই সভ্যতার নানা নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে মঙ্গল-পৃষ্ঠে। কাজেই মঙ্গল সম্পর্কেই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। মঙ্গলগ্রহে বেড়াতে যাওয়ার জল্পনা-কল্পনাও চলছে অনেক কাল ধরে। আর এ সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাল্পনিক কাহিনীও লেখা হয়েছে ইতিপূর্বে। সুতরাং কিভাবে মঙ্গলগ্রহে যাওয়া সম্ভব তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রকেটে ক'রে অন্য কোন গ্রহে পাড়ি দিতে হ'লে এমন একটি পথ বেছে নিতে হ'বে যে পথে অতি অল্পসময়ের জন্য রকেটের ইঞ্জিন চালাতে হবে, অবশিষ্ট সময় রকেট এগিয়ে যাবে আপনা থেকেই। এটা কি ক'রে সম্ভব হবে ?

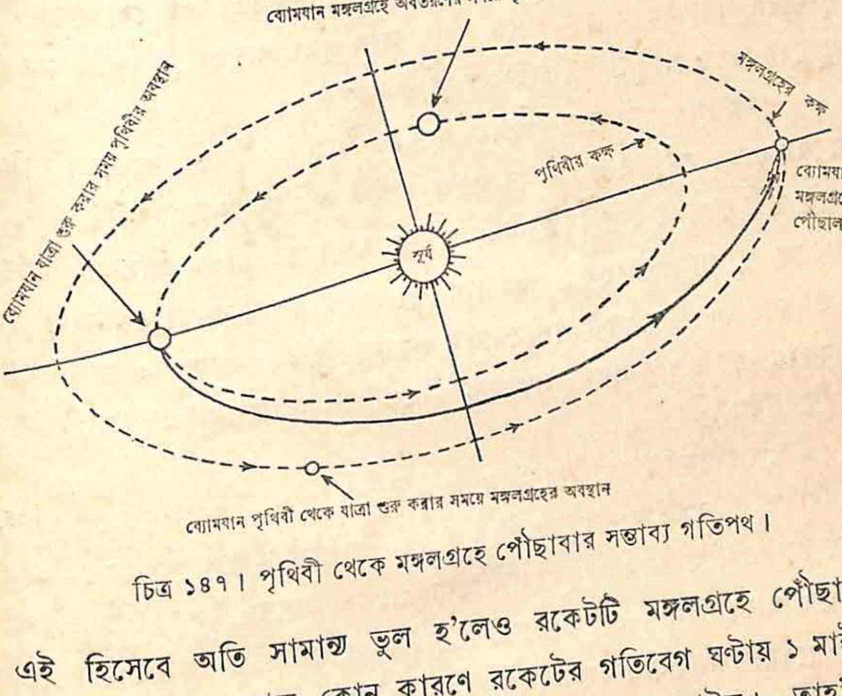
বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, কোন বস্তু যদি থেমে থাকে কিংবা চলতে থাকে তবে তা সেই অবস্থায়ই থাকবে যতক্ষণ না অন্য কোন শক্তি ধাক্কা দিয়ে তাকে চালিয়ে দেয়, কিংবা ধাক্কা দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়।

ধরা যাক, নৌকায় ক'রে একটি পুকুরের এপার থেকে ওপারে যাওয়া হচ্ছে। বৈঠা চালালে নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু বৈঠা চালানো বন্ধ করলে তখনই নৌকার এগিয়ে চলা বন্ধ হয় না, নৌকাটি আপনা থেকেই এগিয়ে যেতে থাকে। অবশ্য জলের ধাক্কা নৌকাকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তাই খানিকক্ষণ পরে তার গতি যায় রুদ্ধ হ'য়ে।

আমরা যদি সবচেয়ে কম দূরত্বের পথে পৃথিবী থেকে সোজাসুজি মঙ্গলগ্রহে পৌঁছাতে চাই তাহ'লে কতগুলি সমস্যা দেখা দেবে। কারণ, পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘণ্টায় ৬৬,৫০০ মাইল বেগে ছুটছে। কাজেই ধরে নিতে হবে যে, রকেটও যাত্রা সুরু করার আগে এই বেগে ছুটছিল। এখন রকেট যদি ঐ সোজা পথে যায় তবে তাকে ঐ গতিবেগের শক্তিকে কাটিয়ে তারপর এগোতে হবে। কোন খরস্রোতা নদী সোজাসুজি পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, আর সে চেষ্টাও আমরা করি না। কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের স্রোতের বাধা কাটিয়ে এগোতে হয়। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার সময়ও আমরা সোজা পথে যাওয়ার চেষ্টা করব না। আমাদের যেতে হবে বাঁকা পথে, উপবৃত্তাকার পথে। তাহ'লে যে প্রাথমিক বেগ হ'ত রকেটটির এগিয়ে চলার পথে একটা বিরাট বাধা, তাই তখন হবে তার এগিয়ে চলার দিকে খুব বড় সহায়ক।

বিজ্ঞানী হিসেব ক'রে দেখেছেন, রকেট যদি ঘণ্টায় ২৬,১০০ মাইল বেগ নিয়ে যাত্রা সুরু করে তবে তা ঠিক ২৫৯ দিনে একটি অর্ধবৃত্তাকার পথে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌঁছাবে। যাত্রা সুরু করার সময় এমনভাবে নির্ধারণ

করতে হবে যাতে ঐ রকেটটি ২৫৯ দিন ধরে অবিরাম চলবার পর ঠিক যে সময়ে এবং যে জায়গায় মঙ্গলগ্রহের কক্ষে প্রবেশ করবে, মঙ্গলগ্রহও যেন আপন কক্ষপথে চলতে চলতে সেই নির্দিষ্ট সময়ে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতেই থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবী, মঙ্গল এবং রকেট প্রত্যেকেই প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে। মহাকাশে যাত্রাপথ লক্ষ লক্ষ মাইল, সময়ও লাগবে কয়েক হাজার ঘণ্টা। এজন্য রকেটের যাত্রার সময় তার গতিবেগ এবং গতিপথ সম্পর্কে সব হিসেব একেবারে নির্ভুল হওয়া দরকার।



চিত্র ১৪৭। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছাবার সম্ভাব্য গতিপথ।

এই হিসেবে অতি সামান্য ভুল হ'লেও রকেটটি মঙ্গলগ্রহে পৌঁছাতে পারবে না। ধরা যাক, কোন কারণে রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় ১ মাইল ক'রে কম হ'ল, অর্থাৎ তার গতিবেগ হ'ল ঘণ্টায় ২৬,০৯৯ মাইল। তাহ'লে ঐ ২৫৯ দিন পরে ঐ রকেটটি থাকবে মঙ্গলগ্রহ থেকে ৬,২১৬ মাইল দূরে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, মঙ্গলগ্রহে পৌঁছাতে হ'লে যাত্রা সুরু করার অতি নির্দিষ্ট সময়, মহাকাশে রকেটের অতি নির্দিষ্ট গতিবেগ এবং অতি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করতেই হবে। আর সেজন্য দরকার হবে

অত্যন্ত নির্ভুল গাণিতিক হিসাব। শুধু তাই নয়, মহাশূন্যে এগিয়ে চলার সময়, যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন অথবা ধূমকেতু কিংবা উল্কাপিণ্ডের প্রভাবে, এই গতিবেগ কিংবা গতিপথের সামান্য পরিবর্তন হ'লেও চলবে না। তা যদি হয়, তাহ'লে রকেটটি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, দিক্‌ভ্রান্ত ধূমকেতুর মতো মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্য।

তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভবিষ্যতে কোনদিন যদি ব্যোম-ভ্রমণ সম্ভবপর হয় তবে প্রথম অভিযান চালাবার পক্ষে শুক্রই সবচেয়ে উপযুক্ত গ্রহ ব'লে বিবেচিত হবে। এর একটা কারণ এই যে, শুক্র যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন তার দূরত্ব অনুরূপ অবস্থায় মঙ্গলের দূরত্বের চেয়ে প্রায় এক কোটি মাইল কম হয়।

মঙ্গলের তুলনায় শুক্র সূর্যের আরো কাছে রয়েছে। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড মহাকর্ষ জয় ক'রে শুক্রে রকেট পাঠানো আরো কঠিন সমস্যা। সেই কথা ভেবেই রুশ বিজ্ঞানীরা প্রথমে মহাশূন্যে একটি অতিকায় কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করেছেন। তারপর তা থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কৌশলে এক শুভমুহূর্তে একটি রকেট পাঠিয়েছেন শুক্রের দিকে। আন্তর্গ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই হ'ল প্রথম পদক্ষেপ। সেদিক দিয়ে ১৩ই ফেব্রুয়ারী এক স্মরণীয় দিন।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন রকেটটি শুক্রগ্রহে পৌঁছাবে, অথবা তার একটি নকল চাঁদ হ'য়ে তাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। এবং শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করবে। শুক্রগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরও রকেটটি মারফত জানা যাবে। এই রকেটের অভিযান বস্তুত বিপুল এক কৌতূহলের অভিযান।

স্বয়ংক্রিয় এই মহাজাগতিক স্টেশনটি সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। কারণ কিছুদিন আগে এরূপ একটি স্টেশনই চাঁদের পিছনের পিঠের ছবি তুলেছিল। এই স্টেশনেও এমন ব্যবস্থা করা হয় যে, বহু কোটি মাইল দূরে গিয়েও তা বেতার-সংকেত মারফত অনেক মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে পাঠাতে পারে, সৌর-রশ্মি-চালিত ব্যাটারীর সাহায্যে।

সব-কিছু হিসেবমতো হ'য়ে থাকলে, স্টেশনটি সোজা রাস্তায় এগিয়ে গিয়ে শুক্রের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, মে মাসের ১৯-২০ তারিখে, এবং ইতিমধ্যে সে শুক্রের একটি নকল চাঁদে পরিণত হয়েছে। আমাদের এই অবগুণ্ঠিত প্রতিবেশীটি সম্পর্কে হয়তো নানা বিচিত্র তথ্য সে পাঠিয়েছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

"শুকতারা আকাশেরই কোণেতে,
সাথীহারা ব্যথা মোর মনেতে"—

রূপসী শুকতারা যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা ক'রে আছে, প্রিয়-মিলন কামনায়। এতকাল পরে সেই লগ্ন আগতপ্রায়। সোভিয়েট রকেট যৌবনের বিপুল আবেগে ছুটে চলেছে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হবার উদগ্র কামনা নিয়ে। রূপসী শুকতারাকে আর হয়তো নিভৃতে একলা দিন কাটাতে হবে না। রকেট তার কাছে পৌঁছে হয়তো তাকে ভালো ক'রে দেখছে, তার রূপে মুগ্ধ হচ্ছে। মহাকাশে ঘটছে এক নূতন শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান।

চাঁদের দেশে

সৌরজগতের অধিবাসী শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ সব অনন্ত ব্যোমে ভেসে রয়েছে, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব কোটি কোটি মাইল। মহাব্যোম-পথের এই দূরত্ব অতিক্রম ক'রে কোনকালে আমাদের প্রতিবেশী কোন গ্রহে পৌঁছানো সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। মহাশূন্যে চাঁদই হ'ল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৩৯,০০০ মাইল। সুতরাং মহাব্যোমপথের দূরত্ব অতিক্রম ক'রে চাঁদে পৌঁছানোই সবচেয়ে সহজ। কাজেই ভবিষ্যতে যদি কোনদিন মানুষের পক্ষে মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়, তবে চাঁদই হবে তার প্রথম গন্তব্যস্থান।

কয়েকটি সমস্যা

মানুষ চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে অনেকদিন ধরে। বিজ্ঞানীরা এদিকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন একথাও ঠিক, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটি সার্থক ক'রে তোলার পথে এখনও অনেক সমস্যা আছে। সেগুলির সমাধান হ'লে তবেই এদিকে আরো অগ্রসর হওয়া যাবে।

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, একটি ক্রিকেট বলকে উপরদিকে ছুঁড়ে দিতে যে বল দরকার, একটি ভারি পাথরখণ্ডকে সেই সমান উঁচুতে ওঠাতে হ'লে তার চেয়ে অনেক বেশি বল দরকার হয়। অর্থাৎ যে বস্তুর ওজন যত বেশি, তাকে উপরদিকে ওঠাতে হ'লে তত বেশি বলের প্রয়োজন হয়।

রকেটের ওজন বেশি হয় প্রধানত জ্বালানির জন্য। কাজেই জ্বালানির কার্যকারিতা যত বেশি হবে তত কম জ্বালানি দিয়েই অভিযান শেষ করা যাবে। বিমান-চালনার ব্যাপারেও একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

এতদিন ধরে যেসব জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি জ্বালানির নামই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

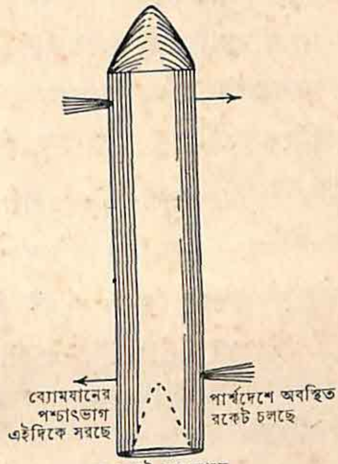
জ্বালানি	দহন-সহায়ক
১। পেট্রোল	তরল অক্সিজেন
২। কেরোসিন	" "
৩। তরল হাইড্রোজেন	" "
৪। ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন	ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড

এদের মধ্যে তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনকেই সবচেয়ে ভালো জ্বালানি বলা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এক টন ওজনের একটি মহাকাশ-যানের একবার চাঁদে গিয়ে ফিরে আসতে অন্তত ১০০ টন জ্বালানি দরকার হবে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে রকেট, শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয়, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক কিছুর ওজন। মাত্র

এক টন ওজনের একটি মহাকাশ-যানে এত জিনিসের স্থান সংকুলান হওয়া খুবই কঠিন।

আর যাত্রাকালে মহাকাশ-যানের ওজন যত বেশি হবে তাকে উপরদিকে ওঠাতে শক্তির অপচয়ও হবে তত বেশি। এভাবে একটি দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হবে। কাজেই যাত্রাকালে মহাকাশ-যানের ওজন যতটা সম্ভব কম রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শূন্যপথের স্টেশন থেকে জ্বালানি, অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে নূতন ক'রে যাত্রা সুরু করতে পারলে এ সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে।

একটা ভরসার কথা এই যে পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে হ'লে আগাগোড়াই রকেট চালাতে হবে না। উপরদিকে উঠতে উঠতে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশ কমবে আর চাঁদের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়বে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, চাঁদ থেকে প্রায় ২০,০০০ মাইল দূরে থাকতেই পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে। কাজেই তখন রকেট না চালালেও চাঁদের আকর্ষণে মহাকাশ-যানটি আপনা থেকেই চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।



চিত্র ১৪৮। মহাকাশ-যানের পার্শ্বদেশে অবস্থিত ছোট ছোট রকেট চালিয়ে মহাকাশ-যানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

চাঁদে অবতরণ করা যাবে কি ক'রে? চাঁদে বায়ু নেই, তাই সেখানে প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছেই রকেটটি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে তার লেজটি থাকে চাঁদের দিকে। এই অবস্থায় ছোট ছোট কতগুলি রকেট চালালে ব্রেকের মতো কাজ করবে। কাজেই তখন মহাকাশ-যানের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হ'য়ে আসবে। এর ফলে মহাকাশ-যানটি ধীরে ধীরে এবং নির্বিঘ্নে চাঁদে অবতরণ করতে সক্ষম হবে।

মহাকাশ-যানটি ঘোরানো যাবে কি ক'রে? এজন্য মহাকাশ-যানের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে আড়াআড়িভাবে আরও কতগুলি ছোট রকেট বসানো থাকবে। এরূপ একটি রকেট চালালে মহাকাশ-যানের একপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুবে, তখন মহাকাশ-যানের সেই প্রান্তটি উলটোদিকে সরে যাবে। এভাবে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকেট চালিয়ে মহাকাশ-যানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তবে এরূপ একটি মহাকাশ-যান চালাতে হ'লে অত্যন্ত পারদর্শী একজন পরিচালকের দরকার হবে। আর চাঁদে যাত্রা করার আগেই তাকে মহাকাশ-যান-পরিচালনার ট্রেনিং নিতে হবে। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল আছে, কাজেই এখানে এ ধরনের ট্রেনিং নেওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি মহাশূন্যে কোন স্টেশন স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে মহাকাশের যাত্রীকে সেখানে গিয়ে মহাকাশ-যান-পরিচালনার ট্রেনিং নিতে হবে।

মহাশূন্যে সঞ্চরণশীল মহাকাশ-যানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার এই পরিকল্পনা নূতন নয়। জুলে ভার্ন তাঁর 'চন্দ্র পরিক্রমা' নামক পুস্তকেই এর উল্লেখ করেছিলেন। সেই অংশটুকু নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"I faith !" cried Michel "What fools we are !"

"I dont say we are not," answered Barbicane ; "but why ?"

"Because we have some very simple means of slackening the speed that is taking us away from the moon, and we don't use them."

"And what are those means ?"

"That of utilising the force of recoil in our rockets."

"Ah, why not ?" said Nicholl.

"We have not yet uitilised that force, it is true," said Barbicane, "but we shall do so."

"When ?" asked Michel.

"When the time comes. Remark, my friends, that in the position now occupied by the projectile, a position

still oblique to the lunar disc, our rockets, by altering its direction, might take it farther away instead of nearer to the moon. Now I suppose it is the moon you want to reach ?"

"Essentially," answered Michel

* * * * * *

The rockets had been put in their places to slacken the fall of the bullet upon the moon, and now the bold fellows were going to use them to provoke an exactly contrary effect.*

চাঁদে গিয়ে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হ'লে দীর্ঘকাল ধরে এমন পরিবেশে থাকতে হবে যেখানে জল, বায়ু, খাদ্য কিছুই পাওয়া যাবে না। কাজেই অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক'রে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সবই নিয়ে যেতে হবে। দৈবাৎ এর যে-কোন একটির অভাব হ'লেই অভিযাত্রীদের জীবনান্ত হবে পৃথিবীর বাইরে অজ্ঞাত কোনস্থানে, পৃথিবীর মানুষ হয়তো সেকথা জানতেই পারবে না কোন-কালে।

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে, অতিদ্রুত বর্ধিষ্ণু একপ্রকার সামুদ্রিক আগাছার সন্ধান পাওয়া গেছে, এর নাম ক্লোরেলা। মাত্র একদিনেই এদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশ-যানের একটি বদ্ধ কামরার মধ্যে এইজাতীয় শেওলা রেখে তার সাহায্যে অভিযাত্রীদের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, শেওলা ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস-মিশ্রিত জল পাম্পের সাহায্যে একটি নলের একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করলে এবং তার উপর সবিরামভাবে পেন্সিলের মতো সরু অথচ তীব্র আলোক-রশ্মি ফেললে অঙ্গার-আত্তীকরণের কাজ (carbon assimilation or, photosynthesis) অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়। আলোকপাতের সময় এই

* Round the moon—p. 163.

শেওলা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ ক'রে তার সাহায্যে কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। অন্ধকারের সময় এরা বিশ্রাম পায়। এই অবস্থাতেই এদের কার্যকারিতা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে এই শেওলার সাহায্যে বদ্ধ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অপসৃত হবে এবং তার পরিবর্তে প্রচুর অক্সিজেন এবং খাদ্য পাওয়া যাবে।

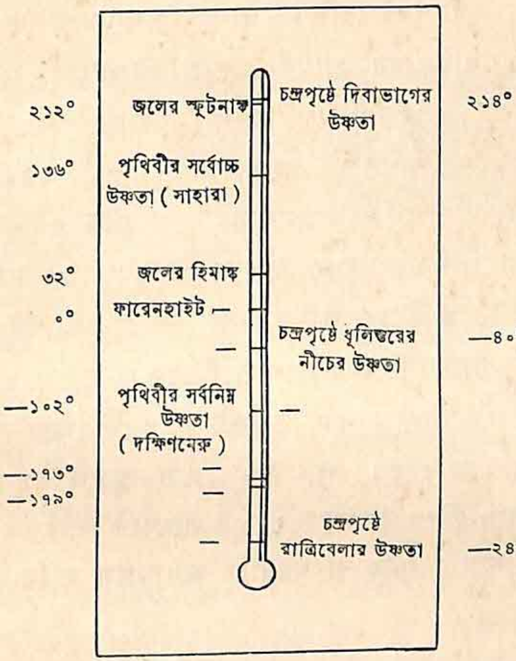
কেউ কেউ বলেন, মহাকাশ-যানের কেবিনের মধ্যে যেমন উদ্ভিদের চাষ করা হবে তেমনি কতগুলি তৃণভোজী জীবজন্তুও রাখতে হবে। তারা ঐ সব উদ্ভিদ্ থেকে আহার্য সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকবে এবং অভিযাত্রীদের আরও ভালো আহার্য যোগাবে। তাতে খাদ্যের একঘেয়েমি অনেকটা ঘুচবে। অর্থাৎ কেবিনের মধ্যে পৃথিবীর মতোই একটি জীবন-চক্র চালু করতে হবে। তা না হ'লে চাঁদে গিয়ে আবার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার আশা করা যায় না।

মহাকাশ-বিজয়ের পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে ধাপে ধাপে। মহাশূন্যে যে স্টেশন স্থাপন করা হবে, সেখানে প্রথমে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ এবং জীব-জন্তুদের নিয়ে গিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক নূতন উপনিবেশ! তারপর সমস্ত অবস্থা অনুকূল ব'লে মনে হ'লে, একদিন সুযোগ বুঝে পাড়ি দিতে হবে চাঁদের দিকে।

চাঁদে পোঁছালে কিরূপ অভিজ্ঞতা হবে?

দূর থেকে মনে হয় চাঁদের একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য হ'ল মৃতের মতো পাণ্ডুর এবং বিষাদময়। কোনপ্রকারে চাঁদে গিয়ে হাজির হ'তে পারলে কি দেখা যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। দেখা যাবে, চাঁদ একটা পাহাড়-পর্বতে ঘেরা ঠাণ্ডা মরুভূমির মতো। তাতে জল নেই, বাতাস নেই, গাছপালা জন-প্রাণী কিছুই নেই। বায়ু নেই ব'লে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকার্য চালানো সম্ভব হবে না। পৃথিবীর মতো সেখানেও অবিরত অসংখ্য উল্কাপিণ্ড ঝরে পড়ছে। বায়ু না থাকায় সেখানে

উল্কার বিন্দুমাত্র ক্ষয় হ'তে পারে না। কাজেই দেখা যাবে, বিরাট এক-একটি উল্কা ভীমবেগে এসে আঘাত করছে চাঁদের বুকে। কিন্তু কোনরূপ শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কারণ শব্দের বাহক বায়ু সেখানে নেই। বেঁচে থাকলে অবশ্য চাঁদের বুকে কান পেতে দূরবর্তী উল্কাপাতের শব্দ-কম্পন অনুভব করা যেতে পারে।



চিত্র ১৪৯। চন্দ্রপৃষ্ঠে উষ্ণতার তারতম্য। সেখানে দিবাভাগে জল ফুটে উঠবে (স্ফুঃ ২১২°), আর রাত্রিবেলায় জলতো বটেই এমন কি অ্যাল্‌কোহলও জমাট বাঁধবে (হিঃ — ১৭৯°)

চাঁদের একটা দিকই সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে, তাই চাঁদের পিছনের দিকে কি আছে তা চোখে দেখা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি মহাজাগতিক স্টেশন চাঁদের পিছনের দিকের ফটো তুলে তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এতে মানুষের কৌতূহল কিছুটা মিটেছে। এই ছবিতে দেখা যায়, চাঁদের উলটোদিকের

দৃশ্যে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই। কারণ সেদিকেও আছে কতগুলি পাহাড়-পর্বত-গর্ত আর শুকনো সাগর। তবে চাঁদের যে ছবি পাওয়া গেছে তা খুব স্পষ্ট নয়। কাজেই চাঁদে যাওয়া সম্ভব হ'লে এসবের পরিচয় আরও ভালো ক'রে পাওয়া যাবে।

চাঁদে দিন কিংবা রাত্রির দৈর্ঘ্য এক পক্ষকাল। তাই সেখানে উষ্ণতার তারতম্য হয় খুবই বেশি। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলের রক্ষাকবচ না থাকায় সেখানে সূর্যকিরণের প্রাখর্য অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দিবাভাগে চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ২১৪° ফারেনহাইট অবধি ওঠে, আবার রাত্রিবেলা তা শূন্যের আরো প্রায় ২৫০° ফাঃ নীচে নেমে যায়। বলা বাহুল্য, এত অল্পসময়ের মধ্যে প্রায় ৫০০° ফাঃ উষ্ণতার পার্থক্য সহ্য করা পৃথিবীর কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই অভিযাত্রীদের এই দুরন্ত শীতের কামড় সহ্য করার উপযোগী সব ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে তারপর চাঁদের দিকে যাত্রা করতে হবে।

চাঁদের আকর্ষণ অত্যন্ত কম, কাজেই সেখানে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ খুব হালকা ব'লে মনে হবে। পৃথিবীতে কেউ হয়তো ৬ ফুট লাফাতে পারেন, কিন্তু চাঁদে গিয়ে তিনিই ২১ ফুট লাফাতে পারবেন।* কাজেই ওখানে গিয়ে ছোটখাটো ঢিবি বা ঘরবাড়ি অনায়াসে লাফিয়ে পার হওয়া যাবে।

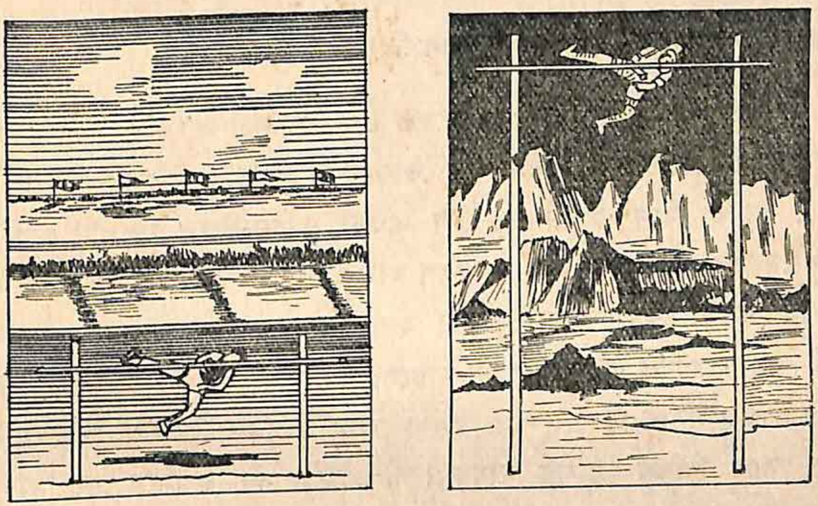
চাঁদে বায়ু নেই ব'লে সেখানকার আকাশ ঘোর কালো দেখাবে, আর সেই আকাশে দিন-রাত্রি সব সময়ই অনেক নক্ষত্র দেখা যাবে। চাঁদ থেকে গ্রহ-নক্ষত্র সব-কিছুই অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যাবে। বায়ুমণ্ডল থাকায় পৃথিবী থেকে এদের স্পষ্ট ক'রে দেখা সম্ভব হয় না। কাজেই চাঁদ থেকে বিশ্ব-পর্যবেক্ষণের কাজ অনেক ভালোভাবে করা যাবে।

সেখান থেকে এই পৃথিবীকে আমরা চাঁদকে যেমন দেখি তার প্রায়

---

* ধরা যাক, দেহের ভারকেন্দ্র (centre of gravity) আছে ৩ ফুট উঁচুতে, কাজেই ভারকেন্দ্র আরও ৩ ফুট উঁচুতে ওঠাতে পারলে ৩+৩=৬ ফুট লাফানো যাবে। অতএব চাঁদে গিয়ে ৩+৩×৬=২১ ফুট লাফানো সম্ভব হবে।

১৩ গুণ বড় একটি থালার মতো দেখাবে। আর সেজন্য পৃথিবীর জ্যোৎস্না চাঁদের জ্যোৎস্নার তুলনায় ১৩ গুণ উজ্জ্বল ব'লে মনে হবে। আর একটা মজার কথা এই যে, চাঁদ থেকে পৃথিবীর কলা-পরিবর্তনও দেখা যাবে, যেমন দেখা যায় চাঁদের বেলায়। তবে পৃথিবীতে যখন অমাবস্যা, তখনই চাঁদ থেকে পূর্ণিমার পৃথিবী দেখা যাবে। আবার পৃথিবীতে যখন পূর্ণিমা, তখন চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাবে না, কারণ তখন পৃথিবীর অন্ধকার দিকটাই



চিত্র ১৫০। পৃথিবীতে একজন মানুষ দেহের ভারকেন্দ্র (৩ ফুট উচ্চে অবস্থিত) প্রায় ৩ ফুট উঁচুতে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই সে ৩+৩=৬ ফুট লাফাতে পারে। সেই মানুষই চাঁদে গেলে ৬×৩+৩=২১ ফুট লাফাতে পারবে।

ফেরানো থাকবে চাঁদের দিকে। চাঁদ থেকে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফের মুকুট নিশ্চয়ই দেখা যাবে। স্থানে স্থানে মেঘের আবরণ দেখা যাবে, এদের আকৃতি ও প্রকৃতি অবিরত বদলায়, কাজেই এদের চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যেসব স্থলভাগ দেখা যাবে তাদের আকার বদলাবে না, কাজেই তাদের চিনতে কোন ভুল হবে না। সমুদ্রের জলে সময় সময় সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে, কাজেই স্থলভাগ ও জলভাগের পার্থক্যও সহজেই বোঝা যাবে।

চাঁদ থেকে মাঝে মাঝে পৃথিবীর এবং সূর্যের গ্রহণ দেখা যাবে, তবে এদের মধ্যে সূর্য-গ্রহণের দৃশ্যই অধিকতর আকর্ষণীয় ব'লে মনে হবে। পৃথিবীর কালো চাকৃতিটি ধীরে ধীরে সূর্যকে ঢেকে ফেলবে, কিন্তু গোলাকার এবং কালো পৃথিবীর চারিধার দিয়ে রক্তিম আলো ফুটে বেরুবে। পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডল আছে ব'লেই এমন চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে।

এরূপ অভিযানের সার্থকতা কি ?

বর্তমানে অনেকেই প্রশ্ন করেন, এত খরচপত্র ক'রে যে এতরকম গবেষণা চলছে, চাঁদে যাওয়ার এত তোড়জোড় চলছে, তার সার্থকতা কি ? এঁরা হয়তো মনে করেন যে, চাঁদ একটা তুহিন-শীতল মরুভূমি মাত্র। সেখানে জল নেই, বায়ু নেই, কোনরূপ খাদ্যও নেই। সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কাজেই চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা কতগুলি কল্পনা-বিলাসী মানুষের উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সত্যই কি এই পরিকল্পনার কোন সার্থকতা নেই ? তাই যদি হবে, তবে বিভিন্ন দেশের নামকরা বিজ্ঞানীরা সব এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? আর এই পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলার জন্য এত কোটি কোটি টাকাই বা কেন খরচ করা হচ্ছে অকাতরে ? বিশিষ্ট ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার বার্নার্ড লোভেল বলেছেন—"The answer to this question can be readily seen when it is realised that the technical devices which form that basis of the present cultural and economic strength of nations can be traced back within a few generations to this kind of research.

There are many classical examples. The fundamental work of Faraday led to the generation of electrical power ; studies by Clark Maxwell formed the basis for the world's radio communication system, and in this century the work of Lord Rutherford on the atom led to the atomic bomb and

atomic power." এতেই বোঝা যায় যে, এই পরিকল্পনার কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

চাঁদে যাওয়া সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহই সবচেয়ে বেশি। কারণ, চাঁদে বায়ু নেই ব'লে সেখান থেকে সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যাবে। কাজেই এর ফলে হয়তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আরো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের গঠন, গ্রহ-উপগ্রহের উপাদান, মহাজাগতিক রশ্মির স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে আরও অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চয়ই জানা যাবে। সেখান থেকে সূর্য ও চন্দ্রকে আরো ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করা যাবে ব'লে মনে হয়, সৌরজগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিও আরো নির্ভুলভাবে জানা যাবে। আর এসব নবলব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠবে নূতন নূতন নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব।

চাঁদে বায়ু নেই ব'লে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যেসব উল্কা ঝরে পড়েছে চাঁদের পিঠে সে-সবই স্তরে স্তরে সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে। পৃথিবীতে যেসব উল্কা পৌঁছায় তাদের মূল চরিত্রের কোন হদিস পাবার উপায় নেই। কারণ বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে তাদের অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে, গলে গেছে। চাঁদে গিয়ে মূল উল্কাগুলিকে অক্ষত অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে। তাই গ্রহ-গ্রহান্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও অনেক নূতন তথ্য জানা যাবে। তা ছাড়া এসব উল্কার মধ্যে হয়তো এমন জৈব পদার্থের সন্ধান মিলবে যা জীবনের সাক্ষ্য বহন ক'রে এনেছে। কাজেই তখন মহাজগতে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কেও হয়তো অনেক বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

যদি কোনপ্রকারে চাঁদে একটি ঘাঁটি স্থাপন করা যায়, তাহ'লে সেখান থেকে পৃথিবীর আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় খবর আরো সহজেই এবং নির্ভুলভাবে জানা যাবে। তাহ'লে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিশ্চয়ই আরো সহজসাধ্য হবে। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই আরো নির্ভরযোগ্য ব'লে প্রমাণিত হবে। সবচেয়ে মজা হবে যদি চাঁদে একটি বেতার কিংবা টেলিভিশন প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করা যায়।

সেখান থেকে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তা আরো সহজেই পৃথিবীর গ্রাহক-যন্ত্রগুলি দ্বারা গৃহীত হ'তে পারবে।

চাঁদে অনেক মূল্যবান ধাতু থাকা সম্ভব। তবে ঐসব খনিজ পৃথিবীতে এনে তারপর ধাতু-নিষ্কাশন করার খরচ নিশ্চয়ই পোষাবে না। এজন্য চাঁদেই একটি কারখানা নির্মাণ করতে হবে। তাহ'লে হয়তো এসব মূল্যবান ধাতুর সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

চাঁদে-যাওয়ার এসব পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন দেশে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তাদের ফলাফল সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি তাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু একদল মানুষ আবার এসবই খুব সন্দেহের চোখে দেখছেন। তাঁদের ধারণা, আপাত-দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পরিকল্পনার অন্তরালে চলেছে এক ভয়াবহ মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি।

সামরিক শক্তির সাহায্যে কম্যুনিজম ও ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনা ও আয়োজন বন্ধ হয়নি। এই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আর সেজন্যেই হয়তো মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দু'টি দেশের মধ্যে এমন পড়ি-মরি প্রতিযোগিতা চলেছে। এমন দিন যদি আসে, তবে মানব-সভ্যতার যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা ধারণা করাও কঠিন। তবে এজন্য বিজ্ঞানীকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। কারণ বিজ্ঞানীর কাজ হ'ল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করা। এগুলির ভালোমন্দ বিচার করার কোন অবকাশ তার থাকে না। এভাবে যেসব জ্ঞান লাভ করা যায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করা কিংবা অপপ্রয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর। মারাত্মক বিস্ফোরক ডিনামাইট দিয়ে যেমন মানব-সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে ভেঙেচুরে নষ্ট ক'রে ফেলা যায় তেমনি এ দিয়ে আবার পাহাড়-পর্বত ভেঙে ফেলে পথ-ঘাট, টানেল প্রভৃতি তৈরি ক'রে মানুষের যাতায়াতের পথও সুগম করা যায়। পরমাণু-বোমার সাহায্যে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমায়

ব্যাপক ধ্বংসলীলা সম্পাদন করা হয়েছিল, সেকথা আমরা জানি। কিন্তু পরমাণু-যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা উপলব্ধি ক'রে এখন সব দেশের বিজ্ঞানীরাই পরমাণু-শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগী হ'য়ে উঠেছেন। তাই যে উন্নততর ও সমৃদ্ধতর জীবনের কথা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না, তারই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে পরমাণু-যুগ। এ যুগের নাগরিক হ'য়ে একে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কি ? তাইতো বলি, এসব পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানের অপপ্রয়োগ হবার সম্ভাবনা আছে ব'লেই এসব পরীক্ষা বন্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করা বাতুলতা মাত্র। মানুষকে এগিয়ে চলতে হবে সাধনার দুর্গম পথে, এখনই লাভ-লোকসান হিসেব করতে বসলে তার চলবে না।

কয়েক বছর আগে, মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিপুল ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার সময়, ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"Scientific research has never been amenable to rigorous cost accounting in advance.

Nor, for that matter, has exploration of any sort. But if we have earned one lesson, it is that research and exploration have a remarkable way of paying off. Quite apart from the fact that they demonstrate that man is alive and insatiably curious."

মানুষ সত্য-সন্ধানী। তার কৌতূহলের যেমন সীমা নেই, তেমনি তার অসাধ্য ব'লেও কিছু নেই। অজানাকে জানবার, অজেয়কে জয় করবার আগ্রহ তার চিরকালের। তাইতো সে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে বার বার অভিযান চালায় দুর্গম গিরিকান্তারে, সাগরের অতল তলে। চাঁদের বুকেও যে কত রহস্য, কত অমূল্য সম্পদ লুকানো রয়েছে, তা কে জানে ? চাঁদে না যাওয়া পর্যন্ত মানুষের সেই কৌতূহলের নিবৃত্তি হবে না। তাইতো মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে বার বার মহড়া দিচ্ছে, মহাকাশ-বিজয়ের দুরন্ত আশা নিয়ে। বলা যায় না, এমনি এক সফল অভিযানের ফলেই হয়তো জানা

যাবে অনেক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য, আর তা থেকেই হয়তো মীমাংসা হবে অনেক নূতন নূতন রহস্যের।

মহাজাগতিক স্টেশন

বিজ্ঞানীরা বলেন, চন্দ্রলোকে অভিযান চালাবার এই পরিকল্পনা সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে প্রথমে পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান একটি নকল চাঁদ সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই চাঁদটি হবে সম্ভাব্য ব্যোম-পথের প্রথম স্টেশন।

দূরপাল্লার রেল-ইঞ্জিন তার চলার পথের সবটা কয়লা ও জল একসঙ্গে নিতে পারে না। পথের ধারে এক-একটি স্টেশনে থেমে নূতন ক'রে কয়লা ও জল নেয়, তাই সে অনায়াসে চলতে পারে শত শত মাইল দূরের পথ। একটি এরোপ্লেনও তার চলার পথে সবটা তেল একসঙ্গে নেয় না। মাঝে মাঝে এক-একটি বিমান-বন্দরে নেমে এসে তেল নিয়ে নেয়, তাই সেও অনায়াসে উড়ে চলে যায় হাজার হাজার মাইল। তেমনি মহাশূন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে মহাকাশ-যান ব্যবহার করা হবে তাও সবটা জ্বালানি একবারে নেবে না। পৃথিবী থেকে প্রেরিত মহাকাশ-যান মহাজাগতিক স্টেশনে পৌঁছে নূতন জ্বালানি নিয়ে নূতন ক'রে শক্তি আহরণ ক'রে নূতন উদ্যমে পাড়ি দেবে মহাকাশের দিকে। বিজ্ঞানীরা তাই এখন এরূপ একটি স্টেশন স্থাপন করার দিকেই সবিশেষ উদ্যোগী হ'য়ে উঠেছেন।

মহাশূন্যে এই স্টেশন স্থাপন করা যাবে কি ক'রে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, রকেটের সাহায্যে যেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে, একেও হয়তো সেভাবেই কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে। এরকম একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। এখানে তারই কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

বিজ্ঞানী কল্পনা করেছেন, ৬৫ ফুট চৌকো একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর

দাঁড়িয়ে থাকবে ২৬৫ ফুট উঁচু বিশাল একটি রকেট। এর ওজন হবে কম পক্ষে সাত হাজার টন। আর এতে থাকবে তিনটি অংশ—মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। কিন্তু প্রত্যেকটি অংশই হবে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রকেট।

এই রকেট কিভাবে উপরে উঠবে তাই এখন আলোচনা করা যাক। লেজের অংশে থাকবে ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন ও ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা পূর্ণ ৫১টি রকেট-মোটর। প্রথমে লেজের রকেট-মোটরগুলি জ্বলে উঠবে এবং মাত্র দেড় মিনিটের ভিতরেই এর মধ্যেকার ৫২৫০ টন বিস্ফোরক জ্বালানি সবটা জ্বলে শেষ হ'য়ে যাবে। আর প্রচণ্ড গর্জন তুলে রকেটটি মুহূর্তের মধ্যেই মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে চলে যাবে ঊর্ধ্বলোকে। রকেটটি কিন্তু ঠিক খাড়াভাবে উঠবে না। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে এর হালটি এমনভাবে ঘুরে যেতে থাকবে যাতে এর গতিপথ ক্রমশ বেঁকে যায়। এর ফলে রওনা হবার ঠিক দেড় মিনিট পরে যখন লেজের অংশের বিস্ফোরক নিঃশেষিত হ'য়ে যাবে, তখন দেখা যাবে যে রকেটটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৫ মাইল ঊর্ধ্বে রয়েছে এবং ২০ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে তা ঘণ্টায় ৫২৫৬ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। এই সময় লেজের অংশটুকু আপনা থেকেই খুলে পড়ে যাবে। এর ফলে রকেটটির ওজন শতকরা ৭৫ ভাগ কমে যাবে, আর ভারমুক্ত রকেটটি এখন আরো সহজে উপরে উঠতে পারবে। এর পরই দেহকাণ্ডে অবস্থিত রকেট-মোটরগুলি জ্বলে উঠবে। এই অংশে রকেট-মোটরের জ্বালানি থাকবে ৭৭০ টন। এর ধাক্কায় ১২৪ সেকেণ্ড পরে রকেটটি ৪০ মাইল উঁচুতে উঠে যাবে এবং তখন তার বেগ হবে ঘণ্টায় ১৪,৩৬৪ মাইল। উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের গতিপথ ক্রমশ বেঁকে যাচ্ছে, কাজেই যাত্রাস্থল থেকে মাপলে এই সময় দূরত্ব দাঁড়াবে ৩৩২ মাইল। দ্বিতীয়বারের বিস্ফোরণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহকাণ্ডটিও খসে পড়ে যাবে।

লেজের অংশ এবং দেহকাণ্ডের সঙ্গে বিশেষভাবে নির্মিত প্যারাস্যুট লাগানো থাকলে সেগুলি ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসতে পারবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে ঘর-বাড়ি কিংবা জন-প্রাণীর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য

এদের সমুদ্রের উপর পড়াই বাঞ্ছনীয়। কাজেই প্রথমদিকে যাতে রকেটটি কয়েক শ' মাইল সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে পারে সেকথা বিবেচনা ক'রে সমুদ্রতীরবর্তী কোনস্থান থেকে রকেটের যাত্রা সুরু করতে হবে।

দেহমুক্ত হবার পর শুধু মাথার রকেটটুকু এগিয়ে চলতে থাকবে। এতে আছে মাত্র ৫টি রকেট, আর তার মধ্যে মাত্র ৯০ টন বিস্ফোরক। আরও ৮৪ সেকেণ্ড চলবার পর সে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬৩ মাইল উপরে উঠবে এবং তার বেগ হবে ঘণ্টায় ১৮,৪৬৮ মাইল। এরূপ কল্পনাতীত বেগ লাভ করায় সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১০৭৫ মাইল উঁচুতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে এখানে এসেই তার ঊর্ধ্বগমনের সমাপ্তি ঘটবে, সে তখন পৃথিবীর সঙ্গে এককেন্দ্রিক একটা বৃত্ত রচনা ক'রে ঘুরতে সুরু করবে। কিন্তু দেখা যাবে যে, এই অবসরে রকেটের বেগ কমে ঘণ্টায় ১৪,৭৭০ মাইল দাঁড়িয়ে গেছে। আগেই বলেছি, উপগ্রহের মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমণ করতে হ'লে রকেটটির বেগ ঘণ্টায় অন্তত ১৫,৮০০ মাইল হওয়া দরকার। কাজেই এখন আরও ১৫ সেকেণ্ড ধরে মস্তকে অবস্থিত রকেট-মোটর চালিয়ে, তার বেগ ঠিক হিসেবমতো ক'রে নিতে হবে। তাহ'লেই মহাশূন্যের এই স্টেশনটি আর ওঠা-নামা করবে না, মানুষের তৈরি চাঁদ হ'য়ে অনুক্ষণ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুসারে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে স্টেশনটির মোট ৫৬ মিনিট সময় লাগবে, এর মধ্যে রকেট-মোটর চালাতে হবে মাত্র ৫ মিনিট। স্টেশনটি বায়ুমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে বিচরণ করবে, কাজেই তার মধ্যে অবস্থিত বিজ্ঞানীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ভেতরে কৃত্রিম বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে রাখতে হবে। আর মাঝে মাঝে দূষিত বায়ু বের ক'রে দিয়ে যাতে তার বদলে বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ করা যায় তার যান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেমন থাকে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজের মধ্যে। আর এজন্য স্টেশনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তরল বায়ু বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

মহাশূন্যের এই ঘাঁটি থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার উপায় কি হবে? এজন্য ছোটখাটো একটা রকেট এবং আরো কিছুটা জ্বালানি সঙ্গে ক'রে নিয়ে

যেতে হবে। ভ্রাম্যমাণ এই স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছুই ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বেগে ছুটে চলবে। কাজেই তখন প্রধান রকেটটি যেদিকে চলেছে তার বিপরীত দিকে রকেট-মোটর চালিয়ে ছোট রকেটটির গতিবেগ কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। তাহ'লেই অভিকর্ষের টানে এই রকেটটি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে থাকবে। এভাবে পৃথিবীর ৫০ মাইলের মধ্যে এসে, অপেক্ষাকৃত ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করার আগেই, তার বেগ আরো কমিয়ে দিতে হবে, তাহ'লেই সে অনায়াসে একটি জেট-প্লেনের মতো নির্বিঘ্নে নেমে আসতে পারবে।

মহাশূন্যে এরূপ একটি ঘাঁটি স্থাপিত হ'লে সেখানে ইচ্ছামতো যাতায়াত করা কিছুই কঠিন হবে না। আগেই বলেছি, রকেটের পরিত্যক্ত দেহকাণ্ড এবং লেজের অংশ প্যারাস্যুটে ভর ক'রে নির্বিঘ্নে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসবে। ইঞ্জিনিয়ারগণ এগুলির সঙ্গে নূতন একটি মস্তকের অংশ জুড়ে আবার একটি সম্পূর্ণ রকেট তৈরি করবেন এবং তাতে প্রয়োজনানুরূপ জ্বালানি দিয়ে দেবেন। তারপর বিজ্ঞানীরা সেই রকেটে ক'রে পূর্ববর্ণিত উপায়ে আবার মহাশূন্যের ঘাঁটিতে উঠে যেতে পারবেন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবার পর আবার পৃথিবীতে ফিরে আসা মোটেই কঠিন হবে না।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মহাশূন্যের এই ঘাঁটিতে বসে আকাশের বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন করা অনেক সহজ হবে। যতক্ষণে পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর একবার মাত্র পাক খায় সেই সময়ের মধ্যে এই স্টেশনটি ১২ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। কাজেই পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তা মহাশূন্যের ঘাঁটি থেকে সব সময় অতি সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যাবে। তা ছাড়া এরূপ একটি স্টেশন স্থাপন করা যদি সত্যসত্যই সম্ভব হয় তবে সেখান থেকে চন্দ্রলোকে অভিযান চালানো যে আরো অনেক সহজ হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। এমনি ক'রে একদিন হয়তো মানুষের পক্ষে চাঁদে পৌঁছানো সম্ভব হবে। আর এভাবে ব্যোম-ভ্রমণের পাল্লা বাড়াতে পারলে শেষে একদিন নিকটতম গ্রহ শুক্রে পৌঁছানোও আর অসম্ভব ব'লে মনে হবে না।

ভবিষ্যৎ অভিযানের কথা

মহাকাশ-জয়ের প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে। এজন্য দুই দেশেই হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে অকাতরে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। বরমাল্য এখন রাশিয়ার গলে।

এবার আরম্ভ হবে দ্বিতীয় পর্ব। অর্থাৎ কে আগে চাঁদে যেতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময়ই রাশিয়া পুরোভাগে ছিল। কাজেই মনে হয়, এবারেও রাশিয়াই জয়ী হবে।

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে চাঁদে যাওয়ার এক কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুলে ভার্ন। তাঁর 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' এবং 'চন্দ্র পরিক্রমা' এই দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৬৫ এবং ১৮৭০ সালে। ভার্ন-এর লেখায় বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং কল্পনাশক্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। এসব যে কোনদিন বাস্তব-ক্ষেত্রে সম্ভব হ'তে পারে তখন তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সবাই একে গ্রহণ করেছিল একটি নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই। কিন্তু ১৯২০ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী গডার্ড সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ রকেটের সাহায্যে চাঁদে যেতে পারবে। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁর এই উক্তি নিয়ে বহু সংবাদপত্র ব্যঙ্গ করেছিল, আর এজন্য জনসাধারণের অনেকেই তাঁকে পথে ঘাটে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। কিন্তু গডার্ড তাতে বিচলিত না হ'য়ে, নির্ভীকভাবে সাধনার পথে এগিয়ে যান। তাঁরই সাধনালব্ধ ফল মহাকাশ-ভ্রমণ সার্থক ক'রে তুলেছে। রকেটে ক'রে চাঁদে যাওয়ার প্রস্তাব আজ আর অলীক কল্পনার বিষয় নয়। চাঁদে-যাওয়ার প্রশ্নটি পরিকল্পনার স্তর থেকে বাস্তব রূপায়ণের স্তরে এসেছে।

রাশিয়ার দ্বিতীয় 'লুনিক' সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যে মন্তব্য করা হয়েছিল তারই পুনরুক্তি

ক'রে বলি, "The performance of Lunik-I dazzled the world by the progress science has made in the U. S. S. R. But to land a rocket on the moon is a tremendous and much greater achievement indicating as it does the degree of perfection Soviet scientists have reached in guidance and remote control."

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যান্ত্রিক ব্যবস্থায় যত রকম সমস্যা ছিল সে-সবেরই সমাধান রাশিয়া করেছে। কাজেই চাঁদে-যাওয়ার এই পরিকল্পনাটি সফল ক'রে তুলতে হ'লে, আর মাত্র তিনটি ধাপ পার হ'তে হবে। চাঁদের চারদিকে ঘুরে আসবে এমন একটি মনুষ্যবাহী-রকেট পাঠাতে হবে চাঁদের দিকে। যথাসময়ে সেই রকেট থেকে চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর সবশেষে দেখতে হবে—এই অবতরণ হয় এমন ধীরে ধীরে যাতে চন্দ্র-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে মহাকাশ-যানটি ভেঙে চুরমার হ'তে না পারে।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা যেমন উঠে-পড়ে লেগেছেন তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। অনেকেই মনে করেন, আগামী দশ বছরের মধ্যেই হয়তো চাঁদে-যাওয়া সম্ভব হবে। আর তা যদি হয়, তবে তখন ছুটির অবসরে সিমলা কিংবা মুসৌরির পাহাড়ে না গিয়ে, চন্দ্রলোকে বেড়াতে যাবার কথা ভাবতে দোষ কি? মহাশূন্যে ভ্রমণের আনন্দ তো থাকবেই, সেই সঙ্গে মিশে থাকবে অনেকখানি রোমান্সের স্বাদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্রজগৎ

আকাশ পর্যবেক্ষণ

নক্ষত্র—দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে যখন চারদিক আঁধার হ'য়ে আসে, তখন আকাশের গায়ে যেন হাজার হাজার নক্ষত্রের দীপ জ্বলে ওঠে। সমস্ত আকাশটা যেন দীপে দীপে ঝলমল করতে থাকে, আলোয় আলোয় ভরে ওঠে। প্রত্যেক রাত্রিতেই আকাশে চলতে থাকে এরকম দীপালির উৎসব।

আকাশে এই যেসব হাজার হাজার দীপ জ্বলে, এদের কতগুলি খুব উজ্জ্বল—যেন দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলছে, আবার কতগুলি খুবই ম্লান—যেন মিট্‌মিট্‌ করছে। এদের রঙেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোনটি লাল, কোনটি হল্‌দে, কোনটি নীল, আবার কোনটি ফুটফুটে সাদা।

আকাশের গায়ে এই যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়, এরা কতগুলি বিন্দুমাত্র নয়, এদের কোনটি আকারে সূর্যের মতো বা তার চেয়ে ছোট, আবার কোনটি সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় এবং সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে বিকিরণ করে। কিন্তু এরা সূর্যের চেয়ে আরও কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে তাই এদের এত ছোট দেখায়, এদের আলো এত ক্ষীণ ব'লে মনে হয়।

মনে হয়, আকাশে যেন ছোট-বড় অসংখ্য নক্ষত্রের সভা বসেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলি নক্ষত্র জড়ো হ'য়ে এক-একটা দল গড়েছে। এরূপ এক-একটি নক্ষত্রের দল এবং তাদের মধ্যমণিকে চিনতে পারলে মনে যে আনন্দ হয় তার কোন তুলনা নেই। একবার সুরু করলে নক্ষত্র-চেনার

আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ আরও বাড়তে থাকে। নক্ষত্র চিনতে গিয়ে কত রাত যে অনিদ্রায় কেটে যায় তার কোন হিসেব থাকে না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে বেদের অনেক মন্ত্র এবং পুরাণের অনেক কাহিনীর সঙ্গে এসব আলোক-বিন্দুর সম্পর্ক উপলব্ধি ক'রে আমাদের মন এক অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে।

পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই তিন মাস আকাশ থাকে উজ্জ্বল এবং মেঘ ও কুয়াশাশূন্য। কাজেই এই তিন মাসই হ'ল রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আকাশে চাঁদ থাকলে নক্ষত্র চেনার অসুবিধা হয়, কাজেই যতদূর সম্ভব কৃষ্ণপক্ষের রাতেই আকাশ পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বড় খোলা মাঠে অথবা উঁচু ছাদে দাঁড়ালে একসঙ্গে গোটা আকাশটা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। এরূপ নৈশ-অভিযানের সহায় হবে সে-সময়ের উপযোগী ভালো একটি নক্ষত্র-পট এবং একটি টর্চ অথবা কালো কাপড়ে ঢাকা একটি লণ্ঠন। একাজে ছু'জন থাকলে অনেক সুবিধা হয়। একজন নক্ষত্র-পটটি মাথার উপর এমনভাবে উল্‌টে ধরবে যাতে পটে নির্দেশিত উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম যথানির্দিষ্ট দিকে থাকে। অন্যজন টর্চের বা লণ্ঠনের আলোয় এই পট দেখতে সহায়তা করবে। এভাবে আকাশ-পটের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে এক-একটি নক্ষত্রমণ্ডল এবং তার বিশিষ্ট নক্ষত্রগুলি চিনে নেওয়া অনেক সহজ হবে। তিন মাসকাল ব্যবধানে আকাশের যে রূপ ফুটে ওঠে তাই এখানে চারটি চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, আকাশের প্রধান নক্ষত্রমণ্ডল সবগুলিরই পরিচয় এ থেকে পাওয়া যাবে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এক এক মাস পরে পশ্চিম আকাশের এক-একটি রাশি অদৃশ্য হ'য়ে যায়, আর এক-একটি ক'রে নূতন রাশি পুব আকাশে দেখা দেয়। কাজেই কোন মাসে এবং কত রাত্রে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সেকথা মনে রেখে তারপর বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলের অনুসন্ধান করতে হবে।

রাতের বেলা খালি চোখেই প্রায় তিন হাজার নক্ষত্র একসঙ্গে দেখা যায়। কাজেই খালি চোখে মোট প্রায় ছ'হাজার নক্ষত্র দেখা সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা দূরবীণ ও ক্যামেরার সাহায্যে প্রায় ৪০ কোটি নক্ষত্রের পরিচয় পেয়েছেন। ঔজ্জ্বল্য অনুসারে এদের চোদ্দটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রথম প্রভার (1st magnitude), তার চেয়ে কম উজ্জ্বলগুলি দ্বিতীয় প্রভার (2nd magnitude), তার চেয়ে কমগুলি তৃতীয় প্রভার (3rd magnitude), এরূপ। ঔজ্জ্বল্য অনুসারে প্রত্যেকটি মণ্ডলের নক্ষত্রগুলিকে আবার গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন—বৃষরাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আল্‌ফা (α), তার পরেরটি বিটা (β), এরূপ। যাদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর তাদের পক্ষে খালি চোখে ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্র পর্যন্ত দেখা সম্ভব হয়।

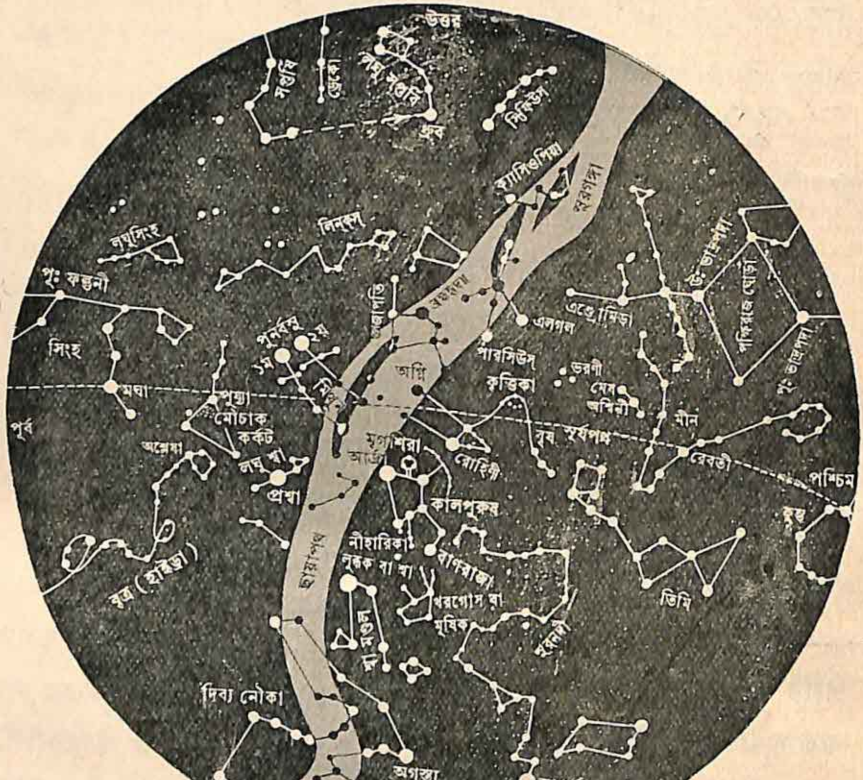
নক্ষত্র চেনার কাজে প্রবৃত্ত হ'লে সবার আগে পঞ্জিকা দেখে গ্রহগুলির পরিচয় এবং বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে জেনে নেওয়া দরকার। নতুবা তাদের উজ্জ্বল নক্ষত্র ব'লে ভুল হওয়া সম্ভব। এরপর প্রথম প্রভার নক্ষত্রগুলির অনুসন্ধান করতে হবে এবং তারা যে যে নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত সেগুলির পরিচয় নিতে হবে। আকাশে এরূপ নক্ষত্র আছে মোট কুড়িটি, তবে এদের সবগুলিকে কখনও একসঙ্গে দেখা যায় না। হিন্দু জ্যোতিষীরাও এদের প্রায় সবগুলির সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। নীচে এদের পরিচয় দেওয়া হ'ল।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে একটু বেশি রাত্রে উত্তর আকাশে কাছাকাছি সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, এর নাম **সপ্তর্ষিমণ্ডল** বা **ঋক্ষ** (Ursa Major)। কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে একে একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো দেখায়। এই মণ্ডলের হু'টি নক্ষত্র (পুলহ ও ক্রতু) কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ ক'রে সেই রেখাটি বাড়িয়ে দিলে যে দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রটির গা ঘেঁষে চলে যাবে, তারই নাম **ধ্রুবতারা** (Pole Star)। প্রতিরাত্রেই দেখা যায়, ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র ক'রেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এবং আকাশের অন্যান্য নক্ষত্র ঘুরছে। কাজেই আকাশের সব নক্ষত্র ক্রমাগত সরে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'লেও ধ্রুবতারা উত্তরদিকে একই জায়গায় স্থির আছে ব'লে মনে হয়। রাতে আঁধারে দিক্ ভুল হ'লে ধ্রুবতারা দেখেই আমরা দিক্ নির্ণয় করতে

১নং তালিকা। প্রথম প্রভার কুড়িটি নক্ষত্রের তালিকা

নক্ষত্রের নাম	নক্ষত্রমণ্ডলের নাম	নক্ষত্রের নাম	নক্ষত্রমণ্ডলের নাম
১। লুব্ধক বা শ্বা (Sirius)	শ্বা বা বৃহৎ কুক্কুর (Canis Major)	১১। আর্দ্রা (Betelgeuse)	কালপুরুষ (Orion)
২। অগস্ত্য (Canopus)	দিব্য নৌকা (Argo Navis)	১২। শ্রবণা (Altair)	শ্যেন (Aquila)
৩। আল্‌ফা সেণ্টরাই বা কিন্নর মণ্ডলের প্রথম প্রভার নক্ষত্র (α-Centauri)	কিন্নর (Centaurus)	১৩। আল্‌ফা ক্রুসিস্ বা দঃ ক্রুশ মণ্ডলের প্রথম প্রভার নক্ষত্র (α-Crusis)	দক্ষিণ ক্রুশ (Crux)
৪। অভিজিৎ (Vega)	বীণা (Lyra)	১৪। রোহিণী (Aldebaran)	বৃষ (Taurus)
৫। ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	প্রজাপতি (Auriga)	১৫। পুনর্বসু (১ম) (Pollux)	মিথুন (Gemini)
৬। স্বাতী (Arcturus)	বুয়েটিস (Boœtes)		
৭। বাণরাজা (Rigel)	কালপুরুষ (Orion)	১৬। চিত্রা (Spica)	কন্যা (Virgo)
৮। প্রশ্বা (Procyon)	লঘু শ্বা বা ক্ষুদ্র কুক্কুর (Canis Minor)	১৭। জ্যেষ্ঠা (Antares)	বৃশ্চিক (Scorpio)
৯। আথার্নার (Acherner)	সুর নদী (Eridanus)	১৮। ফোমালো (Fomalhaut)	দক্ষিণ মীন (Piscis Australis)
১০। বিটা সেণ্টরাই বা কিন্নর মণ্ডলের দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র (β-Centauri)	কিন্নর (Centaurus)	১৯। দেনেব (Deneb)	হংস (Cygnus)
		২০। মঘা (Regulus)	সিংহ (Leo)

পারি। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ষষ্ঠ তারাটির নাম বশিষ্ঠ (Mizar)। একটু লক্ষ্য করলে এরই কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটি তারা দেখা যাবে, এর নাম অরুন্ধতী (Alcor)। ধ্রুবতারার একদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, তার উল্‌টোদিকে উত্তর আকাশেই আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার নাম ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia)। এই নক্ষত্রগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে ইংরেজী W অথবা M এর মতো মনে হয়। ধ্রুবতারার নীচেই আরও কয়েকটি ছোট তারা দেখা যায়, ধ্রুবতারাকে নিয়ে এদের সংখ্যাও মোট সাতটি। এগুলি সব মিলিয়ে যে আকৃতি রচনা করে তাও প্রায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতোই। এর নামই **লঘু সপ্তর্ষি** বা **ক্ষুদ্র ঋক্ষ** (Ursa Minor)।

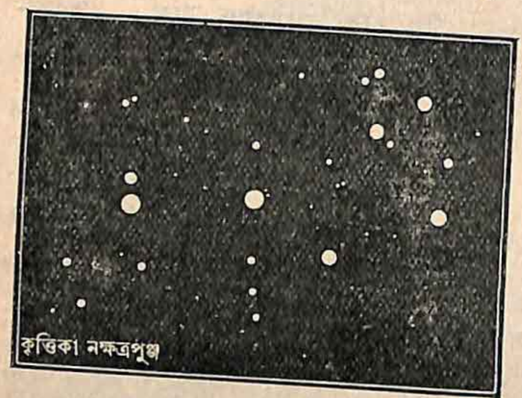


চিত্র ১৫১। আকাশ-পট—পৌষ-মাঘ।

পৌষ-মাঘ মাসে সন্ধ্যার পর পুব আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডলটি সবচেয়ে সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার নাম **কালপুরুষ**, ইংরেজীতে এর নাম Orion অর্থাৎ শিকারী। দেখে মনে হয় একটা বিরাট পুরুষ যেন মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে ; তার অন্য হাতে আছে ধনুক কিংবা ঢাল, কোমরে আছে কোমরবন্ধ এবং তা থেকে ঝুলছে একটি তলোয়ার। কালপুরুষকে সবচেয়ে সহজে চেনা যায় তার কোমরবন্ধ দেখে। তেরছা-ভাবে অবস্থিত এই তিনটি তারা খুব সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাস্তবিক এসময় সমস্ত আকাশে এরূপ অবস্থানে তারকাত্রয় আর কোথাও দেখা যায় না। কোমরবন্ধের মাঝের তারাটি থেকে উত্তরদিকে, একটু পশ্চিম ঘেঁষে একটি রেখা টানলে তিনটি ছোট তারা নিয়ে গঠিত কালপুরুষের মস্তক মৃগশিরায় পৌঁছনো যায়। কালপুরুষের প্রথম প্রভার নক্ষত্র আছে দু'টি, একটি হ'ল দক্ষিণ বাহুতে অবস্থিত তাম্রবর্ণের নক্ষত্র, আর্দ্রা (Betelgeuse), অন্যটি হ'ল এর বাম পায়ে অবস্থিত নীলাভ নক্ষত্র, বাণরাজা (Rigel)। এর তলোয়ারের মাঝের তারাটি একটি নীহারিকা।

কালপুরুষের ডান পায়ের অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল নক্ষত্রটি (Saiph) থেকে মনে মনে একটি রেখা কল্পনা ক'রে তা নীচের দিকে প্রসারিত করলে যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটি পাওয়া যাবে, তার নাম লুব্ধক বা শ্বা (Sirius)। আকাশে এর মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র আর একটিও নেই। এই নক্ষত্রটি **শ্বা** অথবা **বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডলে** (Canis Major) অবস্থিত। নক্ষত্র-পটের সঙ্গে মিলিয়ে এই মণ্ডলটি খুঁজে বের করতে একটুও কষ্ট হয় না। লুব্ধক থেকে উত্তরদিকে একটু পুবদিক ঘেঁষে একটি রেখা কল্পনা করলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটিতে গিয়ে পৌঁছায়, তার নাম প্রশ্বা (Procyon)। এটি **লঘু শ্বা** বা **ক্ষুদ্র কুক্কুরমণ্ডলে** (Canis Minor) অবস্থিত। আবার লুব্ধক থেকে একটি রেখা দক্ষিণদিকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করলে দিক্‌চক্রের একটু উপরে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল নক্ষত্রটি পাওয়া যায়, তার নাম অগস্ত্য (Canopus)। এটি **দিব্য নৌকা** (Argo Navis) নক্ষত্রমণ্ডলের প্রথম প্রভার তারা। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে, সমস্ত আকাশে লুব্ধকের পরেই এর স্থান।

কালপুরুষ থেকে সোজাসুজি পশ্চিমদিকে তাকালে ছোট ছোট আলোর ফুটকি দিয়ে গঠিত যে নক্ষত্রগুচ্ছ (Star cluster) দেখা যায়, তার নাম কৃত্তিকা (Pleiades)। খালি চোখে এতে মোট ছ'টি ছোট তারা দেখা যায়, কিন্তু অনেকে ভুল ক'রে এর নাম দিয়েছেন সাতভাই। ইউরোপে একে বলা হয় Seven Virgins। দূরবীণ দিয়ে দেখলে অবশ্য এতে ছোট ছোট আরও অনেক তারা দেখা যায়। খালি চোখে আকাশে এরূপ নক্ষত্রগুচ্ছ আরও দু'টি দেখা যায়, একটি কোমা বেরিণিসিস (Coma Bereneces) বা বেরিণিসের চুল (Berenece's Hair) এবং অন্যটি কর্কটরাশিতে অবস্থিত প্রিসিপি (Praesepe)। কেউ কেউ তাকে কাঁকড়ার হৃৎপিণ্ড ব'লে কল্পনা করেছেন, আবার কেউ কেউ তাকে মৌচাক (Bee-hive) ব'লে মনে করেছেন।



চিত্র ১৫২। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে তারা-সন্নিবেশ—দূরবীণের সাহায্যে কৃত্তিকা এইরূপ দেখায়। খালি চোখে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছ'টি নক্ষত্রকে শুধু দেখা যায়।

কালপুরুষ ও কৃত্তিকা নক্ষত্রগুচ্ছের মাঝে যে ঈষৎ লালরঙের প্রথম প্রভার নক্ষত্রটি দেখা যায়, তার নাম রোহিণী (Aldebaran)। এটি বৃষরাশিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। একটু লক্ষ্য করলেই কালপুরুষের মাথার উপরে বৃষরাশির শিঙের দু'টি তারাও দেখা যাবে। এই দু'টি তারার মধ্যে যেটি বেশি উজ্জ্বল, তাকে বলা হয় অগ্নি (β Tauri)। বৃষরাশির নক্ষত্রগুলির মধ্যে ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে এর স্থান দ্বিতীয়।

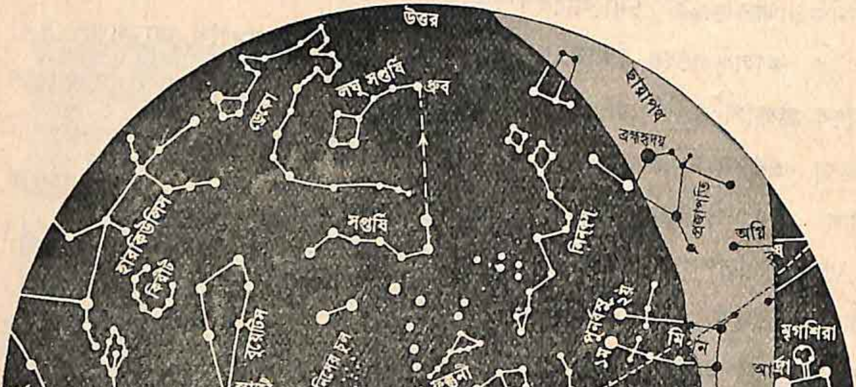
বৃষরাশির পশ্চিমে আছে তিনটি তারকা দিয়ে গঠিত মেষরাশি (Aries), এর মাঝের তারাটি হ'ল অশ্বিনী। বৃষের পুবে আছে তারকাময়

মিথুনরাশি (Gemini)। এর মাথায় আছে দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র, পুনর্বসুদ্বয় (Castor and Pollux)। আরও একটু পুবে দেখা যাবে কয়েকটি ম্লান তারা দিয়ে গঠিত **কর্কটরাশি** (Cancer)। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এই মণ্ডলে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড বা মৌচাক নামক নক্ষত্রগুচ্ছটি চেনা যাবে।

কালপুরুষের কোমরবন্ধ এবং ধ্রুবতারার মাঝামাঝি জায়গায় দেখা যাবে **প্রজাপতি** (Auriga) মণ্ডলে অবস্থিত একটি হল্‌দেরঙের প্রথম প্রভার তারা, এর নাম ব্রহ্মহৃদয় (Capella)। এরই পশ্চিমে যে নক্ষত্রমণ্ডলটি দেখা যায়, তার নাম **পারসিউস** (Perseus)। এই মণ্ডলের এল্‌গলকে (Algol) বলা হয় দৈত্য তারা। এর ঔজ্জ্বল্য পর্যায়ক্রমে বাড়ে এবং কমে। আরও একটু পশ্চিমে আছে **এণ্ড্রোমিডা** (Andromeda) নক্ষত্রমণ্ডল। এই মণ্ডলে একটি বিখ্যাত নীহারিকা আছে, আঁধার রাতে খালি চোখেই এই নীহারিকাটি দেখা যায়।

কালপুরুষের বাম পায়ে অবস্থিত বাণরাজা থেকে একটু পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, কতগুলি নক্ষত্র মিলে যেন একটি বিরাট নদীর সৃষ্টি করেছে। এই নদী যেন এঁকেবেঁকে মোড় ঘুরে ঘুরে সর্পিল গতিতে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। এর নাম **এরিডানাস** (Eridanus) বা **সুরনদী**। এই নদীর শেষ প্রান্তে যে নীলরঙের প্রথম প্রভার তারাটি দেখা যায়, তার নাম আখার্নার (Acherner)। 'আখার্নার' কথাটির অর্থ হ'ল নদীর শেষ।

ফাল্গুন মাসে যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে আসবে তখন দেখা যাবে, উত্তর আকাশের পুবদিক ঘেঁষে একটি প্রথম প্রভার লাল তারা জ্বল্‌জ্বল্ করছে। এটি **বুয়েটিস** (Boœtes) নক্ষত্রমণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা স্বাতী (Arcturus)। এটি একটি লাল দানব, প্রথম প্রভার কুড়িটি তারার মধ্যে এর স্থান ষষ্ঠ। এসময় কর্কটরাশির পুবে **সিংহ** (Leo) রাশিকেও স্পষ্ট দেখা যাবে। এই মণ্ডলে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, মঘা (Regulus)। প্রথম প্রভার কুড়িটি নক্ষত্রের মধ্যে এর স্থানই

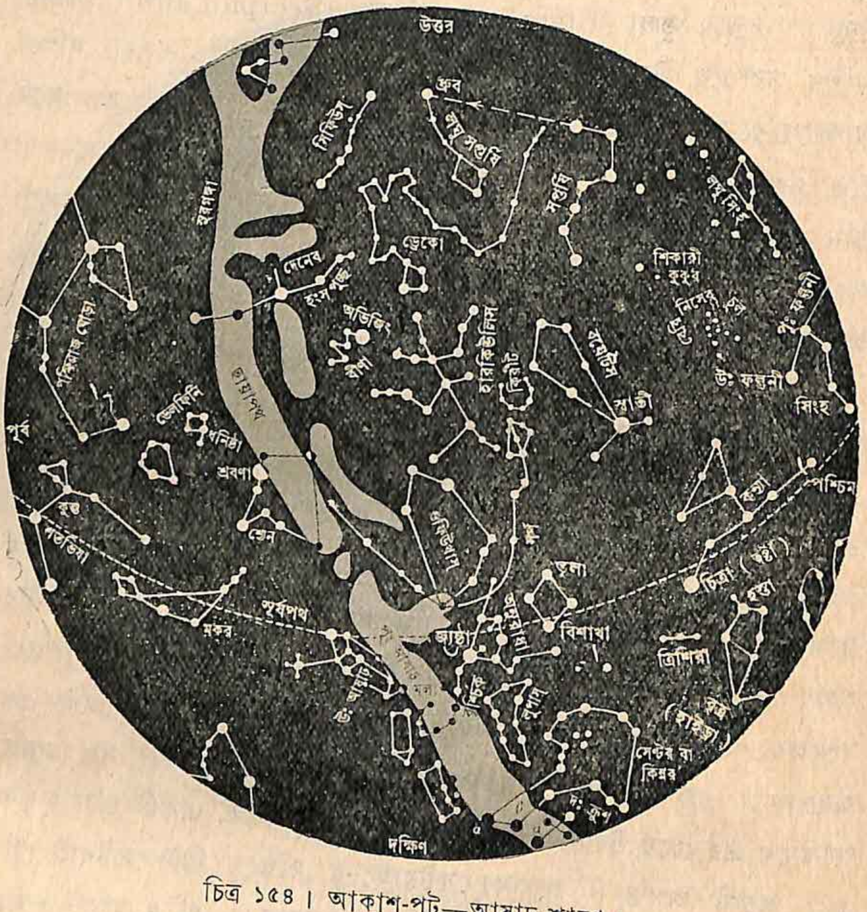


চিত্র ১৫৩। আকাশ-পট—চৈত্র-বৈশাখ।

সবচেয়ে নীচে। এ ছাড়া এই মণ্ডলে আছে পূর্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারলে সিংহরাশির পুবে পর পর আরও কয়েকটি রাশি চেনা সহজ হবে। এগুলি যথাক্রমে কন্যা (Virgo), তুলা (Libra) এবং **বৃশ্চিক** (Scorpio) রাশি। কন্যা-রাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির নাম চিত্রা (Spica)। এসময় দক্ষিণ আকাশে **বৃত্রের** (Hydra) সমগ্র দেহটি দেখাও সম্ভব হবে। দেখে মনে হবে, একটি বিরাট সাপ যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের অনেকটা স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এর মস্তক রয়েছে কন্যারাশির দক্ষিণে অবস্থিত হস্তার পাঁচটি নক্ষত্রে, আর পুচ্ছটি রয়েছে কর্কটরাশির নীচে অবস্থিত অশ্লেষা নক্ষত্রে।

আষাঢ় মাসে রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময় দক্ষিণ আকাশে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, একটা নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যরেখা অতিক্রম ক'রে পশ্চিমদিকে এগিয়ে আসছে। এর নাম **সেণ্টরাস** (Centaurus) বা কিন্নরমণ্ডল। একমাত্র কালপুরুষ ছাড়া এটিই আকাশের সবচেয়ে জমকালো নক্ষত্রমণ্ডল। এর নীচের দিকে প্রায় পাঁচ ডিগ্রী ব্যবধানে অবস্থিত হল্‌দে এবং নীল রঙের প্রায় সমপ্রভ ছু'টি তারা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তরের অপূর্ব দ্যুতিমণ্ডিত তারাটি হ'ল আল্‌ফা-সেণ্টরাই (α-centauri) বা কিন্নর-মণ্ডলের প্রথম প্রভার নক্ষত্র—দক্ষিণ মেরুর ত্রিশ ডিগ্রীর মধ্যেই এর অবস্থান। এটি যে শুধু কিন্নরমণ্ডলের সর্বোজ্জ্বল নক্ষত্র তা নয়, সমগ্র আকাশে এর চেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র আর মাত্র ছু'টি আছে, একটি হ'ল লুব্ধক এবং অন্যটি অগস্ত্য। আল্‌ফা-সেণ্টরাইয়ের দক্ষিণে বিটা-সেণ্টরাই (β-centauri) বা কিন্নরমণ্ডলের দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র। এটিও কুড়িটি প্রথম প্রভার নক্ষত্রের অন্যতম। আল্‌ফা-সেণ্টরাই থেকে সামান্য দূরে একটি অত্যন্ত ম্লান তারা আছে, এর নাম প্রক্সিমা সেণ্টরাই (Proxima centauri)। নানারূপ পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, এটিই আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল বা ৪ ই আলো-বছর।

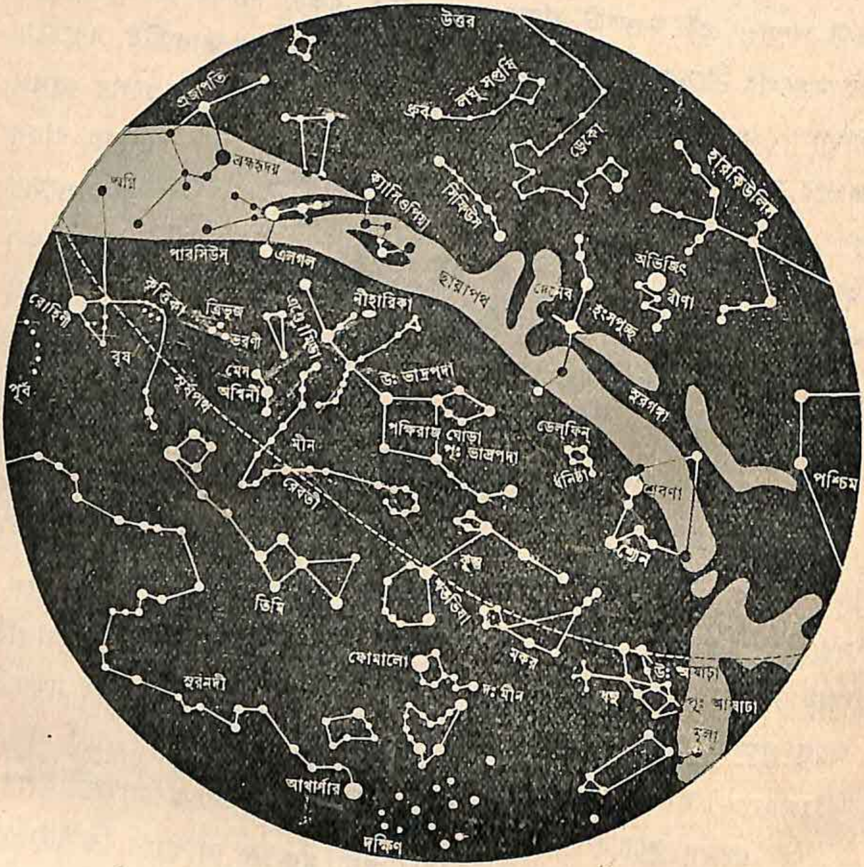


চিত্র ১৫৪। আকাশ-পট—আষাঢ়-শ্রাবণ।

এসময় দেখা যাবে, আল্‌ফা-সেণ্টরাই নক্ষত্রটির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ক্রুশ-চিহ্নের মতো একটি মণ্ডল মধ্যরেখা অতিক্রম ক'রে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে। এর নাম ক্রুক্‌স্ (Crux) বা **দক্ষিণ ক্রুশ**। এর বৃহত্তর বাহুটি উত্তর-দক্ষিণ এবং ক্ষুদ্রতর বাহুটি পূর্ব-পশ্চিমদিকে প্রসারিত। ছোট হ'লেও এই মণ্ডলটি দক্ষিণ আকাশকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। এই মণ্ডলের নীচের দিকে অবস্থিত দক্ষিণ মেরুর নিকটতম তারাটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল। এর নাম আল্‌ফা-ক্রুসিস্ (α-Crusis) বা ক্রুশমণ্ডলের প্রথম প্রভার তারা, এও প্রথম প্রভার কুড়িটি তারার অন্যতম। ক্রুশের বাহুর পূর্ব প্রান্তের তারাটির নাম বিটা-ক্রুসিস্ (β-Crusis) বা ক্রুশমণ্ডলের দ্বিতীয় প্রভার তারা। এর কাছেই অষ্টম প্রভার একটি তারা আছে। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে সেটিই হ'ল সবচেয়ে রক্তরাঙা (deepest maroon red)। উজ্জ্বল শ্বেতশুভ্র বিটা-ক্রুসিসের পাশে একে দেখায় একটি রক্তবিন্দুর মতো।

এবারে দক্ষিণ আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পশ্চিম থেকে পুবদিকে প্রসারিত করলে পর পর **কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক** ও **ধনুরাশি** দেখা যাবে। এদের মধ্যে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য যে নক্ষত্রমণ্ডলটি সবচেয়ে সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হ'ল বৃশ্চিকরাশি। আষাঢ় মাসে রাত্রি দশটার সময় এ থাকে প্রায় মাথার ওপর। এর আকৃতি হুবহু একটি কাঁকড়া বিছার মতো। এর উপরদিকে অবস্থিত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রটি (Antares) সমগ্র আকাশের সবচেয়ে লাল তারা।

এসময় বুয়েটিসমণ্ডলের স্বাতী নক্ষত্র থাকে ঠিক মাথার উপর। এর উত্তর-পূর্বদিকে একটু দূরেই দেখা যায় মুকুটের আকারে **কিরীটমণ্ডল** (Corona borealis); এর উত্তর-পূর্বদিকে আছে **হারকিউলিস** (Harcules)। হারকিউলিস ও বৃশ্চিকের মাঝে আকাশে দেখা যাবে **ওফিউখাস** (Ophiuchus) এবং **সার্পেন্‌স্** (Serpens) বা **সর্পমণ্ডল**। হারকিউলিসের উত্তর-পূর্বদিকে যে অত্যুজ্জ্বল তারাটি দেখা যাবে তা হ'ল বীণামণ্ডলের (Lyra) অভিজিৎ (Vega)। প্রথম প্রভার কুড়িটি তারার



চিত্র ১৫৫। আকাশ-পট—আশ্বিন-কার্তিক।

মধ্যে এর স্থান চতুর্থ। এ ছাড়া ধনুরাশির উত্তরে অবস্থিত **শ্যেনমণ্ডলটি** (Aquila) চিনে নিতে একটুও কষ্ট হবে না, কারণ এতেও একটি প্রথম প্রভার তারা আছে, এর নাম শ্রবণা (Altair)। শ্যেনমণ্ডলের উপরেই দেখা যায় **হংসমণ্ডল** (Cygnus), এতে যে প্রথম প্রভার তারাটি আছে, তার নাম দেনেব (Deneb)। আর কিছুদিন পরেই **মকর, কুম্ভ ও মীন** রাশিগুলি একে একে দেখা দেবে। মীনরাশির উত্তরে এবং শ্যেনমণ্ডলের পরে আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এর নাম **পেগাসাস্** বা **পক্ষিরাজ ঘোড়া** (Pegasus)।

এভাবে মাসের পর মাস ধরে ক্রমাগত আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারলে এক বছরে ১২টি রাশি, চন্দ্রপথের (বা সূর্যপথের) দু'পাশে অবস্থিত ২৭টি নক্ষত্র এবং আকাশের প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলগুলি সব একে একে চিনে নেওয়া যাবে। নীচে বারোটি রাশি এবং সাতাশটি নক্ষত্রের এবং প্রধান কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হ'ল।

২নং তালিকা। **রাশিচক্রের অন্তর্গত বারোটি নক্ষত্রমণ্ডল**

বাংলা নাম	ল্যাটিন নাম	ইংরাজী নাম	বাংলা নাম	ল্যাটিন নাম	ইংরাজী নাম
১। মেষ	Aries	The Ram	৭। তুলা	Libra	The Balances
২। বৃষ	Taurus	The Bull	৮। বৃশ্চিক	Scorpio	The Scorpion
৩। মিথুন	Gemini	The Twins	৯। ধনু	Sagittarius	The Archer
৪। কর্কট	Cancer	The Crab	১০। মকর	Capricornus	The Sea-goat
৫। সিংহ	Leo	The Lion	১১। কুম্ভ	Aquarius	The Water-bearer
৬। কন্যা	Virgo	The Virgin	১২। মীন	Pisces	The Fishes

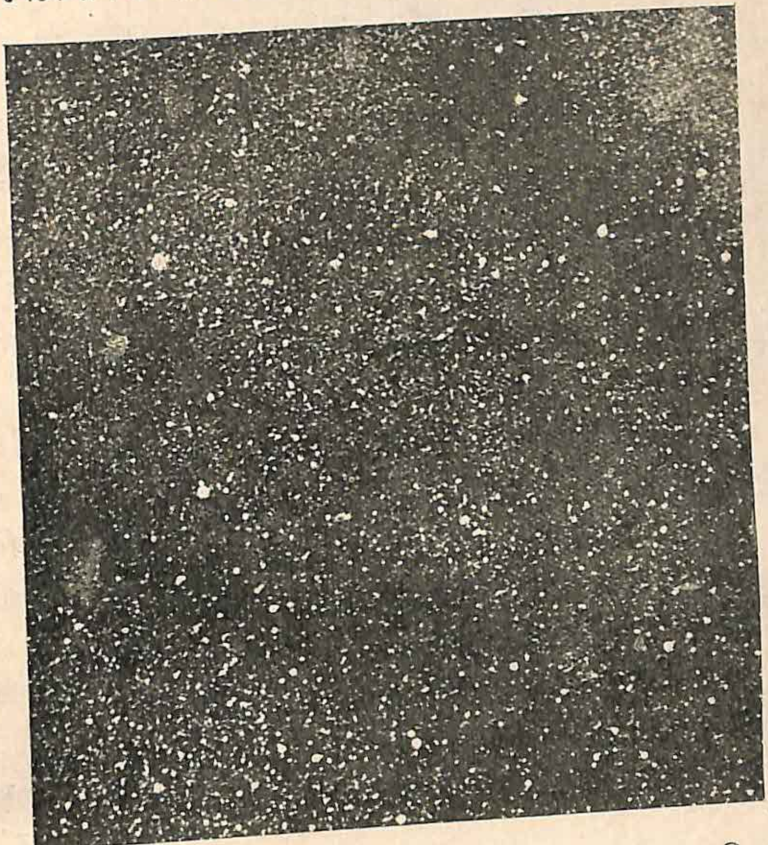
৩নং তালিকা **সাতাশটি নক্ষত্রের নাম**

(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব-ফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব-আষাঢ়া, (২১) উত্তর-আষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব-ভাদ্রপদা, (২৬) উত্তর-ভাদ্রপদা, (২৭) রেবতী।

৪নং তালিকা। রাশিচক্রের বাইরে অবস্থিত প্রধান কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডল

	বাংলা নাম	ল্যাটিন নাম	ইংরাজী নাম
১।	শ্যেন	Aquila	The Eagle
২।	দিব্য-নৌকা	Argo Navis	The Ship
৩।	প্রজাপতি	Auriga	The Charioteer
৪।	বুয়েটিস	Boötes	The Herdsman
৫।	শিকারী কুকুর	Canum Venatici	The Greyhound
৬।	শ্বা বা বৃহৎ কুক্কুর	Canis Major	The Greater Dog
৭।	লঘু শ্বা বা ক্ষুদ্র কুক্কুর	Canis Minor	The Lesser Dog
৮।	কিন্নর	Centaurus	The Man-horse
৯।	তিমি	Cetus	The Leviathan (Sea-monster or Whale)
১০।	বেরিণিসের চুল	Coma Bereneces	Berenece's Hair
১১।	কিরীট	Corona	The Crown
১২।	দক্ষিণ ক্রুশ	Crux	The Southern Cross
১৩।	হংস	Cygnus	The Swan
১৪।	সুরনদী	Eridanus	The River
১৫।	বীণা	Lyra	The Lyre
১৬।	ওফিউখাস	Ophiuchus	The Serpent-bearer
১৭।	কালপুরুষ	Orion	The Hunter
১৮।	পক্ষিরাজ ঘোড়া	Pegasus	The Winged Horse
১৯।	দক্ষিণ মীন	Piscis Australis	The Southern Fish
২০।	সর্প	Serpens	The Serpent
২১।	ঋক্ষ বা সপ্তর্ষি	Ursa Major	The Great Bear
২২।	ক্ষুদ্র ঋক্ষ বা লঘু সপ্তর্ষি	Ursa Minor	The Lesser Bear

ছায়াপথ—শীতের রাতে উপরদিকে তাকালে দেখা যায়, একটা জ্যোতির্ময় নদী যেন আকাশের উত্তর প্রান্ত থেকে আরম্ভ হ'য়ে মাথার উপর দিয়ে শেষে দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। তাই আমাদের দেশের ঋষিরা



চিত্র ১৫৬। হংস (The swan) নক্ষত্রমণ্ডলে ছায়াপথের একটি অংশ। খালি চোখে ছায়াপথ হাল্কা মেঘের মতো দেখালেও শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে দেখা যায় যে, এর মাঝে ভিড় ক'রে আছে ছোট-বড় অসংখ্য নক্ষত্র।

এর নাম দিয়েছিলেন 'সুরগঙ্গা' বা 'আকাশ-গঙ্গা'। সাধারণ লোকে একে বলে ছায়াপথ (Milky way)। কারণ, কালো আকাশের মাঝে একে দেখায় যেন একটা উজ্জ্বল পথের মতো। ঐ পথের যাত্রী হাজার হাজার নক্ষত্র যেন পৃথিবীর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। খালি চোখে ছায়াপথকে

হাল্‌কা মেঘের মতো দেখায়, একথা ঠিক, কিন্তু একটি শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এর মাঝে ভিড় ক'রে আছে ছোট-বড় অসংখ্য নক্ষত্র। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা যে নক্ষত্রজগতে আছি তারই সীমা নির্দেশ করছে এই ছায়াপথ। আমাদের এই নক্ষত্রজগতের বাইরে আর যে-সব নক্ষত্রজগৎ রয়েছে তাদের আমরা দেখতে পাই এক-একটি নীহারিকা রূপে।

নীহারিকা—অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে আর একপ্রকার অতি সুন্দর জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে, এদের বলা হয় **নীহারিকা** (Nebula)। দূরবীণ দিয়ে দেখলে নীহারিকার হাল্‌কা মেঘের মতো রূপ আমাদের চোখে পড়ে। নীহারিকা প্রধানত তিনরকম—(১) উজ্জ্বল কিন্তু হাল্‌কা মেঘের মতো, (২) উজ্জ্বল কিন্তু চরকির মতো, এবং (৩) নিষ্প্রভ।

উজ্জ্বল মেঘের মতো যে নীহারিকা সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, এ অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের সমষ্টি। কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত এরা নিজেরা জ্যোতিষ্মান নয়, অন্যান্য নক্ষত্রের আলোকেই এরা আলোকিত, তাই এদের উজ্জ্বল মেঘের মতো রূপ আমরা দেখতে পাই। অতি শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখলেও এর মধ্যে পৃথক্ তারকার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। কালপুরুষের তলোয়ারের মাঝের তারাটি প্রকৃতপক্ষে এজাতীয় একটি নীহারিকা। চরকির মতো যে নীহারিকা সে সম্পর্কেই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। কারণ, শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখলে মনে হয়, বহুদূরবিস্তৃত জ্বলন্ত গ্যাসরাশি যেন একটা চরকির মতো বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এক-একটি নীহারিকা এক-একটি নক্ষত্রজগৎ। এইরূপ এক-একটি নীহারিকার মাঝে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র। নীহারিকা পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে, তাই এসব নক্ষত্রকে পৃথক্‌ভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা মিলে গড়ে তোলে বালুচর। কিন্তু দূর থেকে এসব বালিকণার পৃথক্ অস্তিত্ব বোঝা যায় কি ? সবইতো মিলে মিশে একাকার হ'য়ে যায়। নীহারিকার বেলায়ও তেমনি অসংখ্য নক্ষত্র মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে, তাই



চিত্র ১৫৭। "কালপুরুষ" (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত নীহারিকা। দূরবীণ দিয়ে দেখলে, এর হাল্‌কা মেঘের মতো রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। খালি চোখে একেই কালপুরুষের তলোয়ারের মাঝখানের তারকারূপে দেখা যায়। ইহা পৃথিবী থেকে ১,৫০০ আলো-বছর দূরে অবস্থিত এবং এর বিস্তার ১৫ আলো-বছর। হাল্‌কা গ্যাসের সমষ্টি হ'লেও এর মধ্যে ১০টি সূর্যের সমান পদার্থ আছে।



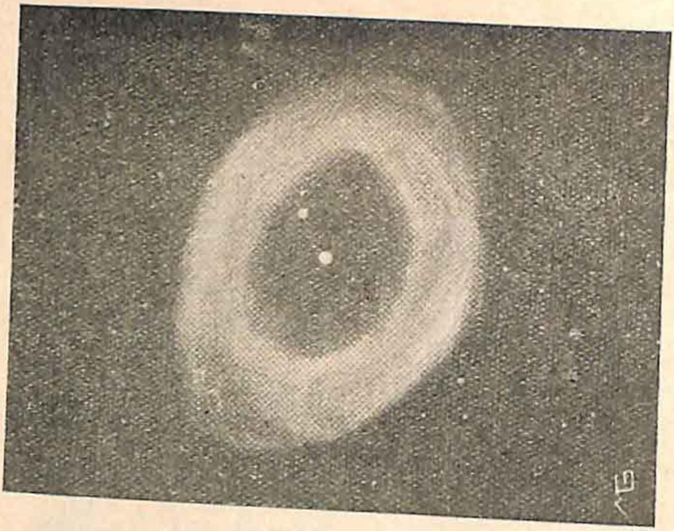
চিত্র ১৫৮। এণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলের সুবিখ্যাত নীহারিকা। সমুদ্র-তীরে যেমন অসংখ্য বালিকণা, এই নীহারিকায় তেমনি অসংখ্য ও ঘনবিন্যস্ত নক্ষত্র বিদ্যমান। দূরবীণ দিয়ে দেখলে মনে হয়, বহুদূরবিস্তৃত জ্বলন্ত গ্যাসরাশি যেন একটা চরকির মতো বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুরছে। ইহা পৃথিবী থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ আলো-বছর দূরে অবস্থিত এবং এর ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলো-বছর। নীহারিকাটি কল্পনাতীত দূরে থাকায় এইসব নক্ষত্রকে পৃথক্‌ভাবে দেখা যায় না, সব মিলে জ্বলন্ত মেঘের মতো দেখায়। ছায়াপথের কথা চিন্তা করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।



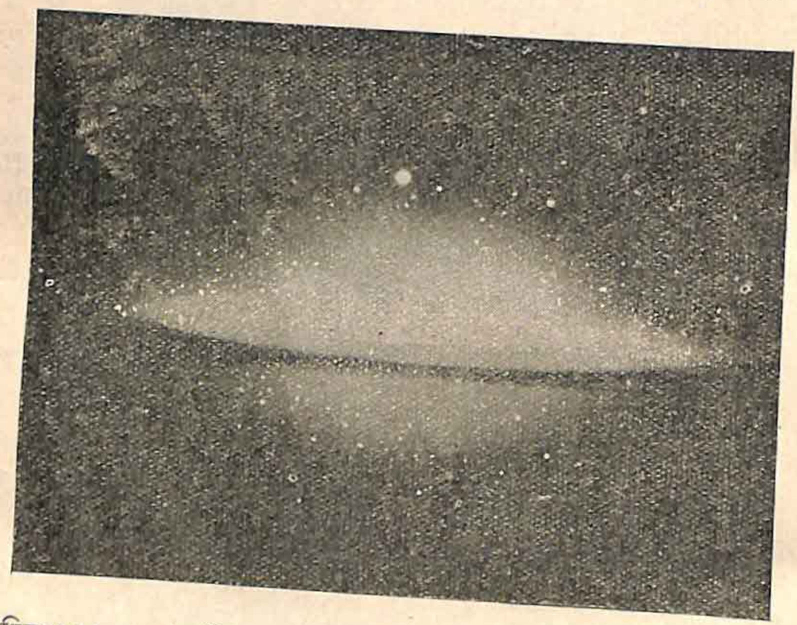
চিত্র ১৫৯। "শিকারী কুকুর" (Canum Venatici) নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত নীহারিকা। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন "ঘূর্ণাবর্ত" (whirlpool)।



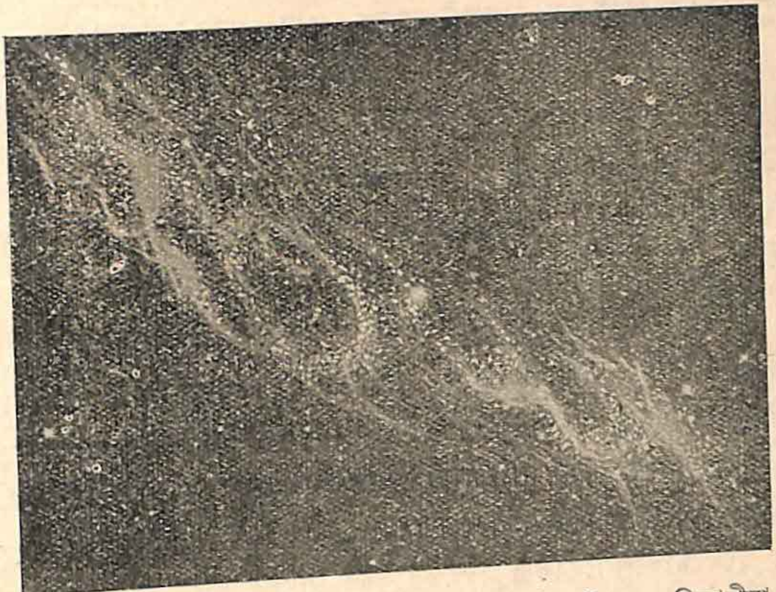
চিত্র ১৬০। "কালপুরুষ" (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি নিষ্প্রভ নীহারিকা। এর নিজস্ব কোন আলো নেই, তাই দূরের উজ্জ্বল গ্যাসরাশির সামনে একে কালো মেঘের মতো দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'অশ্বমুখ' (Horse's head)।



চিত্র ১৬১। "বীণা" (Lyra) নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত "পেচক" (The owl) নীহারিকা।



চিত্র ১৬২। কন্যারাশিতে (Virgo) অবস্থিত নীহারিকা—পার্শ্বদেশ থেকে দৃষ্ট। নীহারিকার সামনে অনুজ্জ্বল এবং অনচ্ছ (opaque) পদার্থ থাকায় এর সবটা আলো আমাদের চোখে পৌঁছাতে পারে না। তাই উজ্জ্বল নীহারিকার সামনে একটি কালো পেটির মতো দেখা যায়। এরূপ নীহারিকা দেখেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান নীহারিকার মাঝখানে একটি বলয়ের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।



চিত্র ১৬৩। হংস (Cygnus) নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত নীহারিকা। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন—"নববধূর ওড়না" (Bridal veil) বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে একটি নোভা বা নূতন তারার বিস্ফোরণের ফলে এর সৃষ্টি হয়েছিল।

সব মিলিয়ে এমন জ্বলন্ত ঘূর্ণির রূপ নিয়েছে। ছায়াপথের কথা চিন্তা করলে এই ধারণা সত্য ব'লে মনে হয়। এণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলের সুবিখ্যাত নীহারিকাটি এজাতীয়। নিষ্প্রভ নীহারিকার নিজস্ব কোন আলো নেই, তাই সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলের সামনে একে অন্ধকার কালো মেঘের মতো দেখায়। এরূপ একটি নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে।

নক্ষত্রের দূরত্ব

দূরত্বের মাপকাঠি—নক্ষত্রদের মধ্যে সূর্যই আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে, কিন্তু তার দূরত্বও পৃথিবী থেকে প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ

মাইল। এর পরই যে নক্ষত্রটি আছে, তার নাম 'প্রক্সিমা সেণ্টরাই' (Proxima centauri)। এর দূরত্ব হ'ল পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। অন্যান্য নক্ষত্র রয়েছে কোটি কোটি মাইল দূরে। দূরত্বের এই হিসেব দেখলে মাথা ঘুরে যায়। বিজ্ঞানীরা তাই নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার জন্য একটা সুন্দর মাপনী (Scale) ঠিক করেছেন। এই মাপনী কিরকম তাই বুঝিয়ে বলছি।

স্কুলের একটা বই কতটুকু লম্বা হয়? একটা স্কেল দিয়ে মেপে বলব, সাত ইঞ্চি হ'ল। বসবার ঘরটা কতখানি লম্বা? এবারে স্কেল দিয়ে মাপা মুশকিল, তাই ফুটের মাপ দরকার। ফিতে দিয়ে মেপে বলব, ঘরটা ষোল ফুট লম্বা। ধরা যাক, দূরত্ব আরো অনেক বেশি হ'ল, যেমন কলকাতা থেকে দিল্লী কতদূর তাই মেপে বলতে হবে। এবারে হিসেব করতে হবে মাইলে। কিন্তু নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে গিয়ে আমরা মাইলের হিসেবেও দিশেহারা হ'য়ে যাই। প্রক্সিমা সেণ্টরাই নক্ষত্রের দূরত্ব অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করলে কেমন দাঁড়ায় দেখা যাক—

২৫,০০,০০০,০০,০০,০০০ মাইল, অথবা ২৫×১০^{১২} মাইল। সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের বেলায়ই এই অবস্থা। এ থেকেই অনুমান করা যায়, দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব প্রকাশে আরো কত জটিলতার সৃষ্টি হবে।

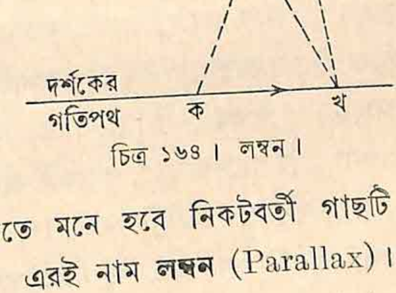
আমরা জানি, আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে যায়। অন্ধকারে একটা দীপ জ্বালালে, মাত্র এক সেকেণ্ড সময়ে আলো ছুটে যাবে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে। এখন যদি বলি, একটা জিনিস এক 'আলো-সেকেণ্ড' দূরে আছে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এই জিনিসটা আসলে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে রয়েছে। এভাবে কত সহজে দূরত্বটা বোঝানো গেল!

চাঁদ পৃথিবী থেকে দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে, চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে লাগে প্রায় দেড় সেকেণ্ড। কাজেই এখন আমরা বলব, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব দেড় 'আলো-সেকেণ্ড'। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। সূর্যের

আলো পৃথিবীতে আসতে লাগে ৪৮০ সেকেণ্ড বা আট মিনিট, কাজেই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব আট 'আলো-মিনিট'। এই হিসেবে প্রক্সিমা সেন্টরাই নক্ষত্রের দূরত্ব সাড়ে চার **'আলো-বছর'** (Light-years)। এই দূরত্বের কথা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। এই নক্ষত্রটি থেকে আজকে যে আলো বেরিয়েছে তা পৃথিবীতে পৌঁছাবে সাড়ে চার বছর পরে, যদিও এই আলো ছুটে চলেছে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে।

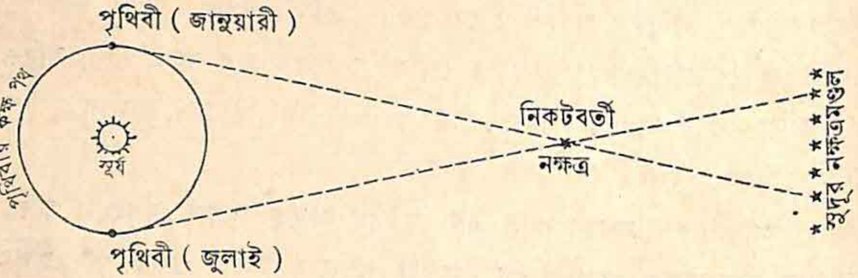
আর একটা মজার কথা এই যে, যে আলো আজ দেখলাম তাতে বুঝলাম, সাড়ে চার বছর আগে নক্ষত্রটি ওখানে ছিল। আজ যদি হঠাৎ নক্ষত্রটি নিভে যায়, তবে তা আমরা জানতে পারব সাড়ে চার বছর পরে। আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র দেখা গেছে যাদের আলো পৃথিবীতে আসতে কোটি কোটি বছর কেটে যায়।

দূরত্ব নির্ধারণের উপায়—দ্রুতগামী রেলগাড়িতে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, দূরের ঘরবাড়ি, গাছপালা সবই যেন চক্রাকারে ঘুরছে। এর কারণ কি? ধরা যাক, ক-অবস্থানে থাকলে দর্শক নিকটবর্তী গাছ (গ) এবং দূরবর্তী মন্দির (ঘ) কে একই রেখায় অবস্থিত দেখতে পেলো। এখন দর্শক যদি সামনের দিকে এগিয়ে খ-তে উপস্থিত হয়, তাহ'লে দূরবর্তী মন্দিরটি স্থির আছে মনে হবে, কিন্তু গ-তে অবস্থিত গাছটি এবং মন্দির এখন আর একই রেখায় দেখা যাবে না। মনে হবে গাছটি একটু পেছনদিকে সরে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে দূরবর্তী ঘরবাড়ি গাছপালা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হবে নিকটবর্তী গাছটি যেন ক্রমশ পেছনদিকে সরে যাচ্ছে। এরই নাম **লম্বন** (Parallax)। আর একটা কথা, গ ও ঘ-র মধ্যে দূরত্ব যত বেশি হবে লম্বনের মাত্রাও



চিত্র ১৬৪। লম্বন।

তত বেশি হবে, আর এই দূরত্ব কম হ'লে লম্বনের মাত্রাও কম হবে। এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবীর কাছে আছে একথা ভাবা অন্যায়



চিত্র ১৬৫। লম্বন-পদ্ধতিতে নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণ।

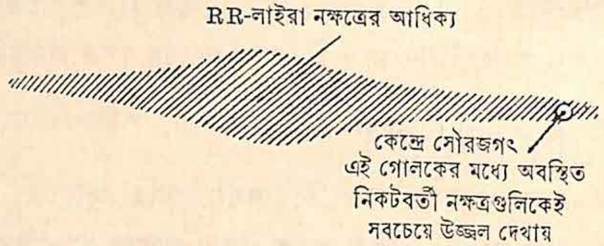
নয়। কাজেই পৃথিবী যখন তার কক্ষপথে বেশ খানিকটা দূরে সরে যায় তখন সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে নিকটবর্তী নক্ষত্রটি স্থানচ্যুত হয়েছে ব'লে মনে হবে।

যে যে সময় পৃথিবী তার কক্ষপথে ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করে সেই সেই সময়, অর্থাৎ ঠিক ছ'মাস পর পর, সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝে নিকটবর্তী নক্ষত্রটির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর এই দুই অবস্থান থেকে নক্ষত্রটিকে কতটুকু সরে যেতে দেখা গেল, অর্থাৎ নক্ষত্রটির লম্বন কতটুকু হ'ল, তা এই উপায়ে জানা গেল। এখন ত্রিকোণমিতির সাহায্য নিয়ে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রটির দূরত্ব অনায়াসে হিসেব ক'রে বের করা যায়। দুঃখের বিষয় এই পদ্ধতিতে শুধু নিকটবর্তী নক্ষত্রদেরই দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, পঞ্চাশটি হবে কিনা তাও সন্দেহ। বিজ্ঞানীদের অনুমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট প্রায় তিন হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। এতেই বোঝা গেল যে, মোট নক্ষত্রের তুলনায় এই কয়টি নক্ষত্রের সংখ্যা একেবারেই তুচ্ছ, কাজেই অন্যান্য নক্ষত্রের দূরত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের আরো কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। এরূপ একটি পদ্ধতির বিষয় নীচে আলোচনা করা হ'ল। অন্যান্য পদ্ধতিগুলি এত জটিল যে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

দু'টি মোমবাতি যদি পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাখা যায় তাহ'লে তাদের বর্ণালী ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এই দু'টি আলোই একজাতের, কিন্তু মোমবাতির দূরত্ব যত বেশি হবে তার দীপন-মাত্রাও (Intensity of illumination) তত কম হবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, দীপন-মাত্রা দীপকের দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় $\left(I \propto \frac{1}{d^2}\right)$। এখন ধরা যাক যে, পরীক্ষার ফলে পাওয়া গেল, একটি নক্ষত্র লুব্ধকের স্বজাতি, অর্থাৎ তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে লুব্ধকের মতো। কিন্তু লুব্ধক থেকে আমরা যে পরিমাণ আলো পাই এই নক্ষত্রটি থেকে তার দশলক্ষভাগের একভাগ আলো পাওয়া যাচ্ছে। নক্ষত্রটি লুব্ধকের স্বজাতি এবং তার আয়তনও লুব্ধকের সমান, কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, এ থেকেও লুব্ধকের সমপরিমাণ আলো বেরুচ্ছে। কিন্তু নক্ষত্রটি লুব্ধকের তুলনায় আরো অনেক দূরে রয়েছে তাই তার আলো এত ম্লান। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে নক্ষত্রটির দূরত্ব লুব্ধকের দূরত্বের $\sqrt{১০,০০,০০০}$ বা ১০০০ গুণ হবে। অর্থাৎ লুব্ধকের দূরত্ব যদি ৮·৬ আলো-বছর ধরা যায়, তাহ'লে নক্ষত্রটির দূরত্ব হবে ৮,৬০০ আলো-বছর। যেসব নক্ষত্রের বর্ণালী নিভুর্লভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা সম্ভব তাদের সবার দূরত্বই এই উপায়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার—নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণের উপায় হ'ল, এবার কল্পনায় বিশ্বভ্রমণে বেরুনো যাক। এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে দ্রুতগামী আলোকরথ ব্যবহার করতে হবে, এই রথের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই রথে ক'রে রওনা হ'লে আমরা একমুহূর্তেই চলে যাব পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে। চাঁদে পৌঁছাব মাত্র দেড় সেকেণ্ডে, সূর্যে যেতে লাগবে আট মিনিট, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সৌরজগতের শেষ গ্রহ প্লুটোকেও আমরা অতিক্রম ক'রে যাব। কিন্তু এরপর আমাদের সুদীর্ঘকাল ধরে অনন্ত শূন্যের ভেতর দিয়ে চলতে হবে। এভাবে একটানা প্রায় সাড়ে চার বছর চলবার পর আমরা

সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেণ্টরাইয়ে পৌঁছাব। আরও চার বছর চলবার পর আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকে পৌঁছানো যাবে। এভাবে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে যেতে লাগবে প্রায় ১৩৫ বছর। এই নক্ষত্র-



চিত্র ১৬৬। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের এই নক্ষত্রজগৎটির আকার একটি লেন্‌স্‌-এর মতো। এর ব্যাস প্রায় ২,৪০,০০০ আলো-বছর আর বেধ হ'ল প্রায় ২৪,০০০ আলো-বছর।

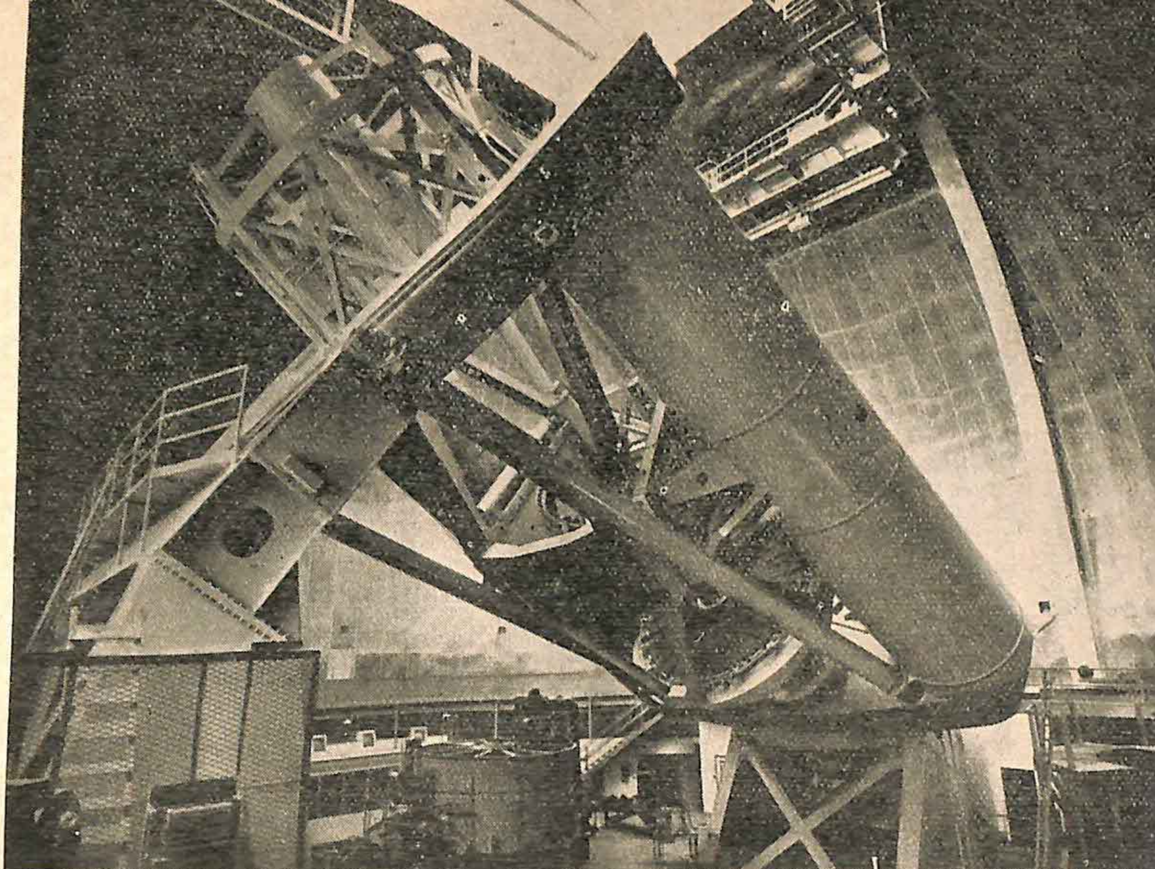
পুঞ্জকে অতিক্রম করতেই কিন্তু আমাদের প্রায় দশ বছর লেগে যাবে। এভাবে চলতে চলতে প্রায় সওয়া দুই লক্ষ বছর পরে আমরা ছায়াপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হ'তে পারব। আমরা যদি একই সঙ্গে সমগ্র আকাশটা দেখতে পেতাম, তাহ'লে বুঝতাম, ছায়াপথ যেন একটা বিরাট বলয়ের মতো সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আমাদের এই নক্ষত্রজগতের আকার অনেকটা লেন্‌সের (Lens) বা আতশী কাচের মতো, আর ছায়াপথ তার পরিধির সীমা নির্দেশ করছে। তাই ছায়াপথকে এমন চক্রাকার দেখায়, আর ছায়াপথের সীমানা দিয়েই নক্ষত্রের ভিড় এত বেশি। বাস্তবিক এই চক্রাকার ছায়াপথের সীমানা দিয়ে সংখ্যাতীত নক্ষত্র দেখা গেলেও দু'পাশে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক কম। নক্ষত্রজগতের আকার লেন্‌সের মতো না হ'লে এরূপ দেখা সম্ভব হ'ত না। মহাশূন্যে ভাসমান চরকির আকারের নীহারিকাগুলি দেখে এই অনুমান সত্য ব'লেই মনে হয়। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী এই নক্ষত্রজগতের ব্যাস প্রায় ২,৪০,০০০ আলো-বছর। সেই তুলনায় এর বেধ খুবই কম, প্রায় ২৪,০০০ আলো-বছর।

ছায়াপথের দূরত্ব অতিক্রম করার পর আবার আমাদের কয়েক

লক্ষ বছর ধরে মহাশূন্যে এগিয়ে চলতে হবে। প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর পরে আবার আমরা আর একটি নক্ষত্রজগতে প্রবেশ করব, এর নাম এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা। এই নীহারিকাটির আকারও নেহাত কম নয়, এর বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলো-বছর। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এর মধ্যে আছে প্রায় দশ লক্ষ কোটি নক্ষত্র। আদি-অন্তহীন মহাসমুদ্রের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জের মতো অনন্ত শূন্যেও যেন অসংখ্য নক্ষত্রজগৎ ভেসে রয়েছে, আর তাদের মাঝে রয়েছে কল্পনাতীত ব্যবধান। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী আমাদের অনন্ত যাত্রাপথে এরূপ প্রায় বিশ লক্ষ নক্ষত্রজগতের সন্ধান পাওয়া যাবে।

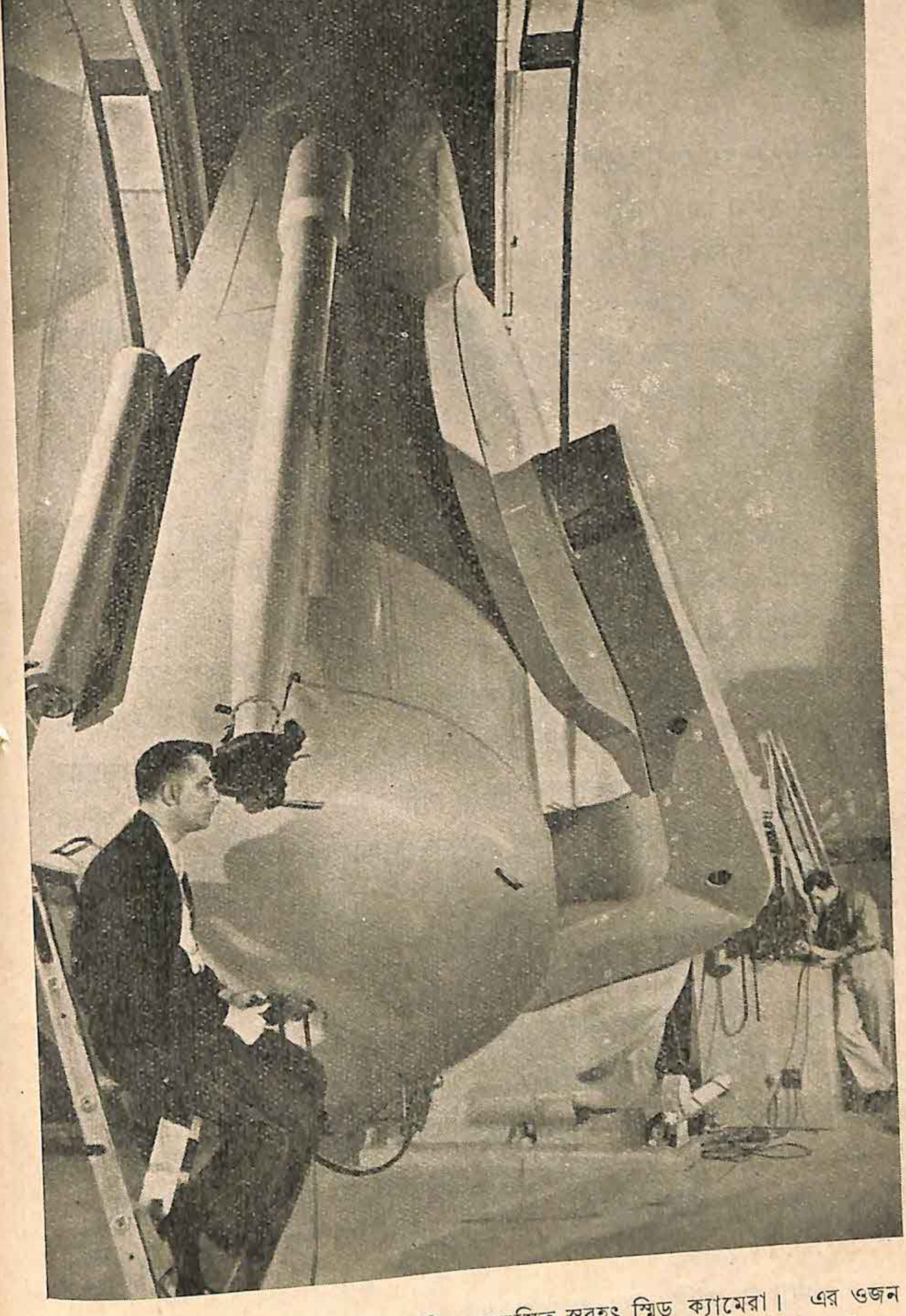
সুদীর্ঘকালের সাধনার ফলে নক্ষত্রলোকের দিকে মানুষের দৃষ্টি এখন বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। প্যালোমার পর্বতের উপরে স্থাপিত অতি শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে শতকোটি 'আলো-বছর' দূরত্বে অবস্থিত জ্যোতিষ্কও এখন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানী তাতেও সন্তুষ্ট হননি। তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি-সীমার বাইরে অজ্ঞাত আরো কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না, তারই অনুসন্ধানকল্পে আবিষ্কার করেছেন 'রেডিও-টেলিস্কোপ'। তাঁর আশা, এর সাহায্যে নক্ষত্রলোকের আরো অনেক বিচিত্র রহস্য হয়তো প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে তার চোখের সামনে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের তুলনায় আমাদের এই নক্ষত্রজগতের আয়তন কত ছোট তা বোঝাবার জন্য বিজ্ঞানী জিন্‌স্ একটা সুন্দর উপমার সাহায্য নিয়েছেন। ধরা যাক, তিন মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে যে গোলক রচিত হ'ল তার মধ্যে ৫,০০০ টন থিন্ অ্যারারুট বিস্কুট এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, যাতে প্রত্যেকটি বিস্কুট অপর একটি বিস্কুট থেকে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে থাকে। এখন গোলকটি যদি দূরবীণের পাল্লার মধ্যে অবস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমা নির্দেশ করে, তাহ'লে এক-একটি বিস্কুট এক-একটি নীহারিকা বা নক্ষত্রজগতের রূপ প্রকাশ করবে। এই মডেল অনুসারে আমাদের নক্ষত্র-জগৎটির আকার অবশ্য একটি বিস্কুটের চেয়ে কিছু বড় ব'লে মনে হবে। এ অবস্থায় এর মধ্যে পৃথিবীর স্থান কতটুকু হবে? আমরা পরমাণু এবং তার উপাদান ইলেক্‌ট্রনের কথা শুনেছি। বিজ্ঞানী বলেন, এই



চিত্র ১৬৭। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দূরবীণ—এর নাম হেলে প্রতিফলক। ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালোমার পর্বতের উপর এই দূরবীণটি স্থাপন করা হয়েছে। এর প্রধান দর্পণটির ব্যাস ২০০ ইঞ্চি এবং তার ওজন ১৪½ টন।

[ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ১৬৮। প্যালোমার পর্বতের মানমন্দিরে অবস্থিত সুবৃহৎ স্মিড্ ক্যামেরা। এর ওজন ৩৬ টন। এর নলটি ২৪ ফুট লম্বা এবং এর দর্পণটির ব্যাস ৭২ ইঞ্চি। একটি মোটরের সাহায্যে একে এমনভাবে ঘোরানো যায় যে, আকাশ-পথে সঞ্চরমান যে-কোন নক্ষত্রকে অনুসরণ ক'রে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এর সাহায্যে একবারে আকাশের অনেকখানি জায়গার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়, সেটাও একটা মস্ত বড় সুবিধা।

[ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

বিস্কুটের মধ্যে একটি ইলেক্‌ট্রন যতটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছে পৃথিবীকে তারই মতো ছোট ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই উপমা থেকে বোঝা যাবে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তির তুলনায় আমাদের আবাসস্থল এই পৃথিবীর আয়তন কত তুচ্ছ! আর সে তুলনায় একটা মানুষ কত নগণ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে তা কল্পনা করাও কঠিন!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত রূপ

নক্ষত্রের আপাতগতি এবং লম্বনের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কক্ষপথে পৃথিবীর গতির ফলেই নক্ষত্রের এরূপ লম্বন দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি নক্ষত্রেরই নিজস্ব একটা গতি আছে। পৃথিবী যদি স্থির থাকত তাহ'লে সূর্যের তুলনায় নক্ষত্রটির যে গতি দেখা যেত তাই নক্ষত্রটির প্রকৃত গতি ব'লে গণ্য হবে। কাজেই আকাশের পটে একটি নক্ষত্রের যে লম্বন দেখা যায় তা থেকে পৃথিবীর গতির জন্য যেটুকু লম্বন হওয়া সম্ভব তা বাদ দিলেই নক্ষত্রটির নিজস্ব গতির দরুন লম্বনের পরিমাপ হবে। এ থেকেই বোঝা যাবে নক্ষত্রটি কত বেগে ডাইনে অথবা বাঁয়ে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু নক্ষত্রটি যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে কিংবা দূরে সরে যায় তাহ'লে তো তাদের কোন লম্বন আমরা বুঝতে পারব না। এজন্য আমাদের ডপ্‌লার-তত্ত্বের (Doppler effect) সাহায্য নিতে হবে।

বিজ্ঞানী ডপ্‌লার একদিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা ইঞ্জিন বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল। ডপ্‌লার লক্ষ্য করলেন, ইঞ্জিনটা যখন এগিয়ে আসে তখন আওয়াজটা খুব তীক্ষ্ণ বা চড়া মনে হয়। আবার ইঞ্জিনটা যখন দূরে সরে যেতে থাকে তখন বাঁশির স্বর খাদে মনে হয়। এর কারণ কি?

আমরা জানি, শব্দ বায়ুতে ঢেউ তুলে চলে। ধরা যাক, সেকেণ্ডে ৩০০টি ঢেউ আমাদের কানে এসে পড়ছে, তাই আমরা শব্দ শুনছি। কিন্তু এই শব্দের উৎস যদি আমাদের দিকে ছুটে আসে, তবে ৩০০র চেয়ে

বেশি-সংখ্যক ঢেউ আমাদের কানে এসে পড়বে। ফলে শব্দটা আরো চড়া শোনাবে।

ডপ্‌লার-তত্ত্ব আলোর বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। একটি নক্ষত্র যদি প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসে তাহ'লে এর বর্ণালী নীল আলোর দিকে একটু সরে যাবে, আর নক্ষত্রটি যদি দূরে সরে যায় তাহ'লে বর্ণালী লাল আলোর দিকে সরে যাবে, কাজেই এই দু'টি পরীক্ষার সাহায্যে এখন আমরা সঠিক বুঝতে পারব, নক্ষত্রটি কত বেগে কোন্‌দিকে ছুটে চলেছে। এভাবে সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার ফলে আমাদের এই নক্ষত্রজগতের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা কল্পনা ক'রে স্তম্ভিত হ'তে হয়! জানা গেছে, লেন্‌সের আকারের আমাদের এই নক্ষত্রজগৎটি চক্রাকারে ঘুরছে। সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে প্রায় ২৫ কোটি বছর। এই গতি অত্যন্ত মন্থর ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই মন্থর গতির ফলেই বহির্ভাগের নক্ষত্রগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০ মাইল বেগে ছুটতে হচ্ছে। এই গতিবেগ নিশ্চয়ই তুচ্ছ করবার মতো নয়!

মহাশূন্যে ইতস্তত ছড়ানো নীহারিকাগুলির বর্ণালী পরীক্ষা করলে আরো বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, একমাত্র এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা ছাড়া অন্যান্য সব নীহারিকা বা নক্ষত্রজগৎই আমাদের কাছে থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৫,০০০ মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। (এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০০ মাইল বেগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে)। মনে হয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বিশাল বুদ্‌বুদের মতো দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। যে হারে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে তা থেকে হিসেব করলে দেখা যায়, মাত্র একশ' কোটি বছর আগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখনকার তুলনায় অনেক ছোট একটি কেন্দ্রে ঘনীভূত অবস্থায় থাকা উচিত ছিল। কিন্তু নক্ষত্রের আয়ুষ্কালের তুলনায় এসময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ব'লেই মনে হয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়তো

পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত হচ্ছে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন উদ্ভাবিত আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয় স্পন্দিত হ'তে থাকবে, নয় প্রসারিত হ'য়ে যাবে চিরকালের মতো, আর না হয়তো একটা বৃহৎ আকার থেকে সংকুচিত হ'য়ে প্রথমে ন্যূনতম আয়তন লাভ করবে এবং তারপর আবার প্রসারিত হ'য়ে যাবে। এর কোন্‌টা যে সত্য তার কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। তবে আপাতত এটুকুই শুধু নিশ্চয় ক'রে বলা যায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভয়ংকর বেগে প্রসারিত হ'য়ে চলেছে! এর শেষ কোথায়, তা কে জানে!

একটি তারকার জীবন-রহস্য

একটি তারকার আয়ুষ্কাল বহুশত কোটি বছর, সে তুলনায় একটা মানুষের আয়ুষ্কাল তো কিছুই নয়। তা'হলে তারকার জীবন-রহস্য পর্যবেক্ষণ করা হ'ল কি ক'রে? একটা উপমা দেওয়া যাক। মানুষের তুলনায় একটি প্রজাপতির আয়ু অত্যন্ত কম। ধরা যাক, একটি প্রজাপ্রতি মানুষের জীবন-কাহিনী রচনা করতে বসেছে। সে কি করবে? জন্ম থেকে সুরু ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত একটা মানুষের জীবন-রহস্য সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করা তার সাধ্যাতীত। কাজেই তাকে এজন্য অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবতে হবে। প্রজাপ্রতিটি উড়ে উড়ে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করলে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি নানা বয়সের এবং নানা জাতের মানুষের সন্ধান নিশ্চয়ই পাবে। এভাবে অল্পসময়ের মধ্যেই তার পক্ষে শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ পর্যন্ত সববয়সের এবং সবরকম মানুষের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কাজেই তখন মানুষের জীবন-কাহিনী রচনা করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন সমস্যা ব'লে মনে হবে না। সেরকম আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেখানে শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে জরাগ্রস্ত তারকা অসংখ্য আছে। তাই বিভিন্ন বয়সের এসব তারকার

বিবরণ সংগ্রহ ক'রে তারপর একটি তারকার জীবন-কাহিনী রচনা করা আমাদের পক্ষে আর অসম্ভব ব'লে মনে হবে না।

তারকার শ্রেণীবিভাগ—তারকা থেকে যে আলো আসে তাই পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেছে, সব তারকারই জন্ম হয়েছে একই উৎস থেকে, তাই তাদের বর্ণালীতে বেশ সামঞ্জস্য আছে।

তারকার আলোর বর্ণ বিশ্লেষণ করলে তারকার উপরিভাগের তাপমাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে বর্ণালী পাওয়া যায় তা অবিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, সূর্যের চারিদিকে যে বাষ্পীয় আবরণ আছে, তার ভেতর দিয়ে সূর্যালোক আসবার সময় কতগুলি বিশেষ আলোক-তরঙ্গ শোষিত হয়। তাই অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মাঝে মাঝে কতগুলি কালো কালো দাগ দেখা যায়। এসব কালো রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়ত্ব পর্যবেক্ষণ ক'রে সূর্যের তাপমাত্রা এবং সংগঠন সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। বিভিন্ন তারকার বর্ণালী পরীক্ষা করলে এসব কালো রেখার অবস্থানে এবং প্রগাঢ়ত্বে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এসব কালো রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়ত্বের সঙ্গে তারকার তাপমাত্রার কি সম্পর্ক তাই নির্ধারণ করেন। তাঁর এই পদ্ধতি অনুসারে আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ তারকার বর্ণালী পরীক্ষা ক'রে তাদের তাপমাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা গেছে এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয়েছে।

তাপমাত্রার তারতম্য অনুযায়ী তারকাদের প্রধানত দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এদের যথাক্রমে O, B, A, F, G, K, M, R, N, S এই দশটি অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই এলোমেলো অক্ষরগুলো মনে রাখবার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা ছড়া তৈরি করেছেন,

"Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me Right Now, Sweet."

তারকার দীপ্তি সম্পর্কেও আমাদের একটা ধারণা থাকা দরকার। আকাশের প্রতিটি তারকা সূর্যের মতোই জ্বলছে। কিন্তু যে তারকাটি যত দূরে রয়েছে তাকে তত ছোট ও ম্লান দেখাচ্ছে। দু'টি মোমবাতি যদি পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাখা যায় তাহ'লে তাদের বর্ণালী পরীক্ষা

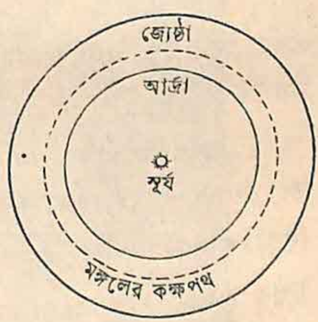
৫নং তালিকা। তারকার শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণী	বর্ণ	তাপমাত্রা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	বর্ণালী*
O	নীল	২৩,০০০ এর উপর	হাল্কা অবিচ্ছিন্ন আলোর পর্দার উপর হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন এই কয়টি মৌলের বর্ণরেখা দেখা যায়।
B	নীলাভ সাদা	২৩,০০০	অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মাঝে মাঝে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন এই ক'টি থেকে উদ্ভূত কালোরেখাগুলি দেখা যায়।
A	সাদা	১১,০০০	হাইড্রোজেন, ক্যাল্সিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতির রেখা।
F	হরিদ্রাভ সাদা	৭,৫০০	হাইড্রোজেনের রেখা কম, আর ধাতু থেকে উদ্ভূত রেখা বেশি।
G	হলুদ	৬,৫০০	হাইড্রোজেন এবং অনেক ধাতুর রেখা।
K	কমলা	৫,০০০	অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে উদ্ভূত ধাতুর রেখা-সমূহ, এ ছাড়া টাইটেনিয়াম অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন-জাতীয় পদার্থ থেকে উদ্ভূত আলোর পটিসমূহ।
M R N S	লাল	৩,৫০০ থেকে ক্রমশ নীচের দিকে	প্রধানত সায়ানোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের শোষণ-বর্ণালী।

* উজ্জ্বল রেখা উত্তপ্ত ও দীপ্তিমান গ্যাস থেকে পাওয়া যায় আর উত্তপ্ত গ্যাসের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যে আলো শোষিত হয় সেই অনুসারে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীতে কালো কালো রেখার উদ্ভব হয়।

ক'রে বেশ সহজেই বোঝা যাবে যে, দু'টোরই আলো একজাতের। কিন্তু মোমবাতির দূরত্ব যত বেশি হবে তাকে তত ছোট দেখাবে। তার দীপন-মাত্রাও (Intensity of illumination) তত কম হবে। আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা লুব্ধকের দূরত্ব সূর্যের দূরত্বের প্রায় ৫ লক্ষ গুণ। এখন লুব্ধক যদি সূর্যের সমান উজ্জ্বল হ'ত তাহ'লে সূত্র অনুসারে তার দীপ্তি সূর্যের প্রায় $\frac{১}{(৫,০০,০০০)^{২}}$ বা $\frac{১}{২৫ \times ১০^{১০}}$ ভাগ হ'ত। কিন্তু লুব্ধকের ঔজ্জ্বল্য প্রকৃতপক্ষে এর প্রায় ২৬ গুণ। অর্থাৎ লুব্ধকের দূরত্বে যদি একসঙ্গে ২৬টি সূর্য রাখা যেত, তাহ'লেই লুব্ধকের সমান তাপ ও আলো পৃথিবী থেকে পাওয়া যেত। পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সূর্যের স্থান G-শ্রেণীতে, অর্থাৎ সূর্য একটি মধ্যম-শ্রেণীর তারকা। এর সঙ্গে তুলনা ক'রেই অন্যান্য তারকার দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্যের মান নির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন তারকার ঔজ্জ্বল্য পরীক্ষা ক'রে দেখলে বোঝা যায়, তাপমাত্রার সঙ্গে এর বেশ একটা সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, B থেকে M-শ্রেণীর দিকে তারকার তাপ যেমন কমে, ঔজ্জ্বল্যও তেমনি কমতে থাকে। কিন্তু এভাবে পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল, কতগুলি তারকার তাপমাত্রা খুব কম কিন্তু সেই তুলনায় ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি। এর কারণ তাদের আয়তন খুব বেশি। এরূপ একটি তারকার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ৪০০ গুণ হওয়াও বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানীরা এরূপ তারকার নাম দিলেন **লাল দানব** (Red giant)।

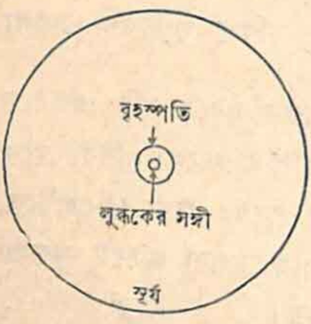


চিত্র ১৬৯। লাল-দানব তারকার ও সূর্যের আয়তনের তুলনা।

পরীক্ষার ফলে আর একশ্রেণীর তারকার সন্ধান পাওয়া গেল। এদের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য অনেক কম। কারণ আয়তনে এরা অত্যন্ত ছোট। এরূপ একটি তারকার ব্যাস সূর্যের

ব্যাসের একশ' ভাগের একভাগ মাত্র হওয়াও বিচিত্র নয়। এদের নাম দেওয়া হল **সাদা বামন** (White dwarf)।

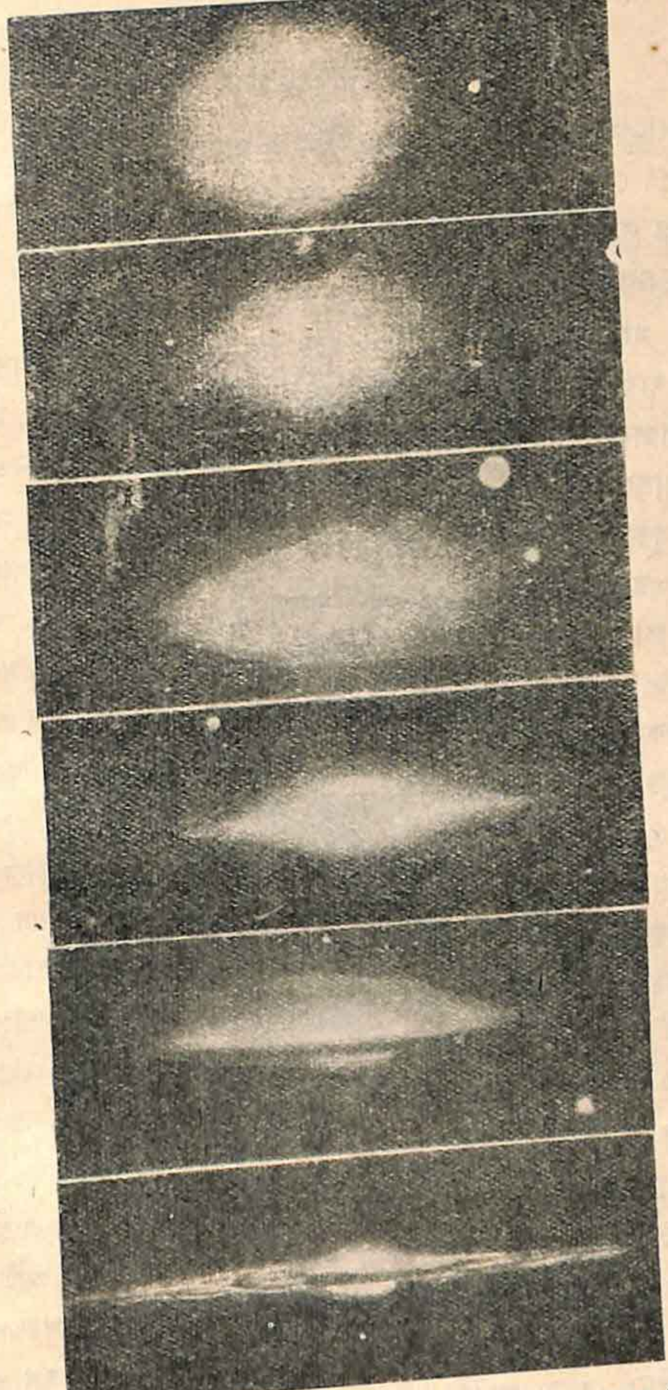
পরীক্ষার ফলে আরও একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গেল। আয়তনে খুব ছোট হ'লেও অন্যান্য তারকার তুলনায় সাদা বামনের ওজন অত্যন্ত বেশি। লুব্ধকের সঙ্গী এরূপ একটি সাদা বামন। হিসেব ক'রে দেখা গেল, এর ওজন প্রায় সূর্যের সমান, কিন্তু ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ত্রিশভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ এর আয়তন সূর্যের আয়তনের $\frac{১}{২৭০০০}$ ভাগ। সূর্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৪ (অর্থাৎ সূর্য জলের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ ভারি)। সুতরাং এই হিসেবে লুব্ধকের সেই সঙ্গীটির আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৪০,০০০। এ যে আমাদের কল্পনারও অতীত! আমাদের জানা সবচেয়ে ভারি জিনিস হ'ল প্ল্যাটিনাম, তার আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ২৪। নক্ষত্রজগতে এরূপ অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব হ'ল তার অনুসন্ধান করা উচিত নয় কি?



চিত্র ১৭০। সাদা-বামন তারকার ও সূর্যের আয়তনের তুলনা।

তারকার জন্ম ও মৃত্যু—তারকার জন্ম ঠিক কিভাবে হয়েছিল তা নিশ্চয় ক'রে বলা খুবই কঠিন। রাসেল, এডিংটন, জিন্‌স্ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে যে-সব মতবাদ প্রকাশ করেছেন, তারই উপর ভিত্তি ক'রে তারকার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে যে ধারণা করা যায় তাই এখানে আলোচনা করা হ'ল।

সৃষ্টির আদিতে, অনুমান আজ থেকে প্রায় তিনশ' কোটি বছর আগে, একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্পরাশি হয়তো সমগ্র বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত ক'রে ছিল। এর তাপমাত্রা ছিল মাত্র কয়েক শ' ডিগ্রী এবং এর ঘনত্ব ছিল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র $\frac{১}{১০^{২৭}}$ গ্রাম, অর্থাৎ জলের ঘনত্বের (১ গ্রাম) তুলনায়



চিত্র ১৭১। নীহারিকার ক্রমবিকাশ। বিভিন্ন নীহারিকার আলোক-চিত্রের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে, কিরূপে গোলাকার নীহারিকা ক্রমশ চেপ্টা নীহারিকায় পরিণতি লাভ করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এইরূপ চেপ্টা এবং পেঁচালো নীহারিকা থেকেই এক একটি নক্ষত্রজগতের উৎপত্তি হয়।

একেবারেই নগণ্য। এরূপ অবিচ্ছিন্ন বাষ্পমণ্ডলের পরিসর সমগ্র নক্ষত্র-জগতের চেয়েও বহুগুণ বড় ছিল, কাজেই তা প্রকৃতির নিয়মেই কতগুলি বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হ'য়ে পড়তে বাধ্য হ'ল। এরূপ একটি খণ্ডিত বাষ্পমণ্ডল থেকেই সম্ভবত আমাদের নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে এই বিশাল বাষ্পমণ্ডল ক্রমশ সংকুচিত হ'তে থাকলো। তার ফলে এর উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকলো, তারই ফলে এই বাষ্পমণ্ডল ধীরে ধীরে ঘুরতে আরম্ভ করলো। মহাকর্ষ-জনিত সংকোচন যত বাড়লো, এই ঘূর্ণনের মাত্রাও তত বাড়তে থাকলো। আর এরূপ দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে বাষ্পমণ্ডল ক্রমশ চেপ্টা হ'য়ে যেতে বাধ্য হ'ল। তখন এর আকৃতি হ'ল অনেকটা ঘূর্ণায়মান চরকির মতো। ক্রমে এর স্থানে স্থানে আবার বাষ্পমণ্ডল ঘনীভূত হ'তে থাকলো। সম্ভবত এসব অংশ থেকেই কালক্রমে অসংখ্য তারকার সৃষ্টি হ'ল। বাস্তবিক এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা কিংবা চরকির আকারের অন্যান্য নীহারিকা দেখে তারকার জন্ম সম্পর্কিত এই মতবাদ খুবই সম্ভবপর ব'লে মনে হয়।

এবার একটি তারকার কথা ভাবা যাক। জন্মকালে তারকা খানিকটা বিচ্ছিন্ন বাষ্পমণ্ডলের মতো ছিল। মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে এর আয়তন ক্রমশ আরো ছোট হ'তে লাগলো। কাজেই তার তাপমাত্রা এবং সেই সঙ্গে ঘূর্ণনের বেগও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগলো। এভাবে সম্ভবত M-শ্রেণীর তারকা বা লাল দানবের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মহৃদয় (Capella) তারকাটি এইশ্রেণীর। এর ব্যাস সূর্যের প্রায় দশগুণ কিন্তু ভর সূর্যের মাত্র চারগুণ।

সূর্য ও অন্যান্য তারকার মাঝে অপরিমিত তেজ-শক্তির উদ্ভব হচ্ছে কি ক'রে তাই এখন আলোচনা করা যাক। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, পদার্থ থেকে শক্তিতে এবং শক্তি থেকে পদার্থে রূপান্তর হওয়া সম্ভব, একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। বর্তমান কালের নানারূপ পরীক্ষার ফলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, নানা উপায়ে পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, আর এভাবে উদ্ভূত তেজ-শক্তির পরিমাপ হয়

অত্যন্ত ভয়ংকর। এই মতবাদের সত্যতা সম্পর্কে চরম পরীক্ষা হ'য়ে গেছে পরমাণু-বোমা এবং হাইড্রোজেন-বোমার আবিষ্কারে।

বিজ্ঞানীরা আজ অবধি ৯২টি মৌলিক পদার্থের (element) সন্ধান পেয়েছেন। এদেরই বিচিত্র ও ঘনিষ্ঠ সমাবেশে পৃথিবীর যাবতীয় জড়বস্তুর



চিত্র ১৭২। আইনস্টাইন

সৃষ্টি হয়েছে। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম এবং অবিভাজ্য কণা, যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তারই নাম পরমাণু (atom)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হ'তে হ'তে যখন তার অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা বেড়ে দু'লক্ষ ডিগ্রীতে পৌঁছালো, তখন ঐ গ্যাসের পরমাণুগুলির মধ্যে সংঘাত সুরু হ'ল। আমরা জানি, গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে পরমাণুদের গতিবেগ বাড়তে থাকে। সূর্য অথবা অন্যান্য তারকার মাঝে উত্তাপের মাত্রা কল্পনাতীত। সেখানে পরমাণুগুলি

অতি ভয়ংকর বেগে ছুটোছুটি করছে, কাজেই এরূপ সংঘাতের ফলে হু'টি পরমাণু মিলিত হ'য়ে নূতন পরমাণু সৃষ্টি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'ফিউসন' বা সম্মিলন-প্রক্রিয়া (Fusion process)। এভাবে হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেনে সম্মিলন হবার ফলে তৈরি হ'ল ডয়টেরিয়াম। হু'টো ডয়টেরিয়াম মিলে তৈরি করল হিলিয়াম। এই প্রক্রিয়ায় খানিকটা পদার্থের বিলোপ হয় এবং তা থেকে প্রচুর শক্তি জন্মায়। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে, তাই তারকাটির উষ্ণতাও ক্রমে আরো বাড়তে থাকে। এভাবে তারকাটি পর পর M, K, G, F, A ও B অবস্থা অতিক্রম ক'রে শেষে O অবস্থায় উপনীত হয়। প্রত্যেকটি তারকাই এভাবে লাল দানব অবস্থা থেকে সুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত O-শ্রেণীর তারকায় পরিণত হয়।

এবার সাদা-বামন তারকার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। জড়পদার্থ মাত্রই কতকগুলি পরমাণুর সমাবেশে গঠিত। গ্যাসীয় পদার্থের উপর সামান্য চাপ দিলেও উল্লেখযোগ্য সংকোচন হয়, এর ফলে পরমাণুদের পরস্পরের দূরত্ব যায় কমে। কিন্তু কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে যে, প্রবল চাপ দিলেও তাদের মধ্যেকার দূরত্ব বিশেষ কমতে পারে না। কাজেই এভাবে কঠিন পদার্থের আয়তনে পরিবর্তন হ'তে পারে না। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে বোঝা গেল যে, পরমাণু নিরেট ও অখণ্ডনীয় নয়। এর হু'টো অংশ আছে—কেন্দ্রক ও বহির্ভাগ।

কেন্দ্রক কতকগুলি পজিটিভ কণা প্রোটন (Proton) এবং নিস্তড়িৎ নিউট্রন (Neutron) কণাদ্বারা গঠিত, আর বিদ্যুৎ-সাম্য বজায় রাখার জন্য সেই কেন্দ্রককে ঘিরে কতকগুলো নেগেটিভ কণা ইলেক্‌ট্রন (Electron) ঘুরছে অবিশ্রান্তভাবে। সাধারণ অবস্থায় পরমাণু নিস্তড়িৎ অবস্থায় থাকে, কাজেই কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা যা হবে, বহির্ভাগে ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাও ঠিক সেই সমান হ'তে বাধ্য। পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় এই কেন্দ্রকের আয়তন খুবই কম, অর্থাৎ পরমাণুর প্রায় সবটাই ফাঁপা!

আগেই বলা হয়েছে যে, শক্তির উৎস হ'ল হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে ফিউসন-প্রক্রিয়া। তারকায় যতদিন হাইড্রোজেন

থাকবে ততদিন বিক্রিয়া চলতে থাকবে এবং তারকাটির তাপমাত্রাও ক্রমাগত বাড়বে। কিন্তু হাইড্রোজেন যখন একেবারে ফুরিয়ে যাবে তখন এই বিক্রিয়া আর সম্ভব হবে না। কাজেই নূতন ক'রে শক্তিরও সৃষ্টি হবে না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে অত্যুত্তপ্ত তারকা-দেহ থেকে তেজ-শক্তির বিকিরণ চলতে থাকবে অব্যাহতভাবে। এর ফলে একদিন তারকাটি আবার শীতল ও সংকুচিত হ'তে আরম্ভ করবে।

বিজ্ঞানী কল্পনা করেছেন, তারকার সংকোচন হ'তে হ'তে এমন একটি অবস্থা আসে যখন তার অভ্যন্তরে চাপের মাত্রা কল্পনাতীত রূপে বেড়ে যায়। তখন পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনের খোলস ভেঙে চুরমার হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কাজেই তখন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ইলেক্‌ট্রন ও কেন্দ্রক পড়ে থাকবে।

সাধারণ অবস্থায় একটি পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেক্‌ট্রন অপর একটি পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কাজেই পরমাণুর অভ্যন্তর প্রায় সবটা ফাঁপা হ'লেও তার ধর্ম নিরেট কণার মতোই হয়। কাজেই সাধারণ অবস্থায় বাইরের চাপে কঠিন পদার্থের আয়তন বিশেষ কমে না। কিন্তু চাপের মাত্রা অত্যন্ত প্রবল হ'লে ইলেক্‌ট্রন-আবেষ্টনীর অস্তিত্বও থাকবে না। সেই অবস্থায় পদার্থকে আরো কতগুলি আস্ত পরমাণুর সমষ্টি ব'লে মনে করা চলবে না, কতকগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট কেন্দ্রক ও ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি ব'লে মনে করতে হবে। কেন্দ্রক ও ইলেক্‌ট্রনের মোট আয়তন পরমাণুর আয়তনের তুলনায় বহু লক্ষগুণ কম, কাজেই এ অবস্থায় পদার্থটির আয়তন হঠাৎ খুব কমে যাবে এবং তার ফলে এর ঘনত্বও হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে যাবে। একটা বায়ুপূর্ণ বেলুন হঠাৎ ফেটে চুপ্‌সে গেলে যেমন হয়, অনেকটা সেরকম আর কি! একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রেডিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রকের আয়তন প্রায় ০.৫×১০^{-৩৩} ঘন সেন্টিমিটার এবং তার ওজন ৪×১০^{-২২} গ্রাম। উপরোক্ত মতবাদ অনুসারে প্রবল চাপের প্রভাবে রেডিয়ামের সবগুলি পরমাণু চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবার পর যদি শুধু কেন্দ্রকগুলি অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে সেই পদার্থের

ঘনত্ব হবে, $\frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}=\frac{৪\times১০^{-২২}}{০\cdot৫\times১০^{-৩৩}}=৮\times১০^{১১}=৮০,০০০,০০,০০,০০০$ (আশি হাজার কোটি)। অর্থাৎ সে-অবস্থায় রেডিয়ামকে সবচেয়ে ভারি যে সাদা-বামন তারকার সন্ধান পাওয়া গেছে তার তুলনায় আরো বহুগুণ ভারি ব'লে মনে হবে। এ থেকেই প্রকৃত রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, তারকার সংকোচন একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে, অর্থাৎ চাপের মাত্রা একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালে, উপাদান পরমাণুগুলির অনেকেরই ইলেক্‌ট্রন-খোলস ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। তারকার অভ্যন্তরে এরূপ বিপর্যয় হওয়ার ফলে তারকাটির আকার হঠাৎ অনেক ছোট হ'য়ে যাবে। তখন তারকাটির ঘনত্ব জলের ঘনত্বের ৪০,০০০ গুণ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

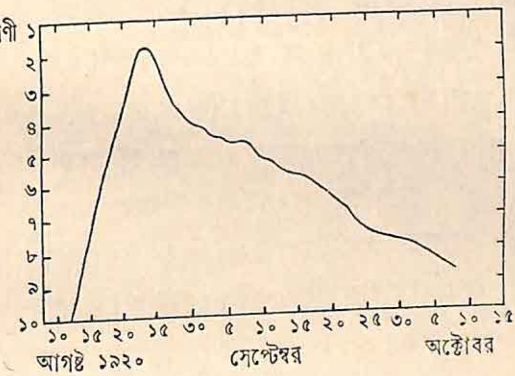
কিন্তু এভাবে দ্রুত সংকুচিত হওয়ার ফলে হঠাৎ অপরিসীম তেজ-শক্তির উদ্ভব হবে। তাই ছোট হ'লেও এর তাপমাত্রা হবে খুবই বেশি। এরাই আকাশে সাদা-বামন তারকারূপে বিরাজ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা সবাই মৃত্যু-পথের যাত্রী। মৃত্যুর পূর্বে এরা আরও কিছুকাল তাপ ও আলোক বিকিরণ করবে, তার ফলে এদের দেহের আয়তন আরো কমবে। শেষে একদিন তারকাটি একেবারে নিভে যাবে।

নোভা বা নূতন তারা

আমাদের সময়ের মাপকাঠিতে একটি নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল নেহাত কম নয়, কমপক্ষে এক হাজার কোটি বছর। কিন্তু এই সুদীর্ঘকাল ধরে একটি নক্ষত্রের জীবনীশক্তি ক্রমাগত ক্ষয় হ'তে থাকে। এভাবে একটি নক্ষত্রের আয়ু শেষ হ'লে তার মৃত্যু অনিবার্য। তখন সেই নক্ষত্রের জ্যোতিহীন মৃতদেহ মহাকাশের অসীম অন্ধকারে ভেসে থাকলেও আমাদের সাধ্য নাই যে তার অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমরা জানি, প্রদীপের তেল ফুরালে তা হঠাৎ আরো উজ্জ্বল হ'য়ে তারপর নিভে যায়। একটি

নিভন্ত তারকাও যেন সেরকম একবার হঠাৎ জ্বলে উঠে তারপর একেবারে নিভে যায় চিরকালের জন্য। তার কারণ, স্বাভাবিক মৃত্যুর আগে প্রতিটি নক্ষত্রের জীবনেই ঘটে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।

বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে আরো একটি আশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। দেখেন, আকাশের একটি ম্লান তারার ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ হয়তো খুব অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল। এভাবে কয়েকদিন থাকবার পর তার ঔজ্জ্বল্য আবার ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। এদের বলা হয় **'নোভা'** (Nova) বা **নূতন তারা**। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, এই সময় কোন কোন তারকার ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ কয়েক লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। এভাবে একটি অতি ম্লান সাধারণ তারকাও সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আজ অবধি সবচেয়ে উজ্জ্বল যে নোভার বিবরণ পাওয়া যায় তা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে, ১৫৭২ খৃস্টাব্দে। সেসময় নোভা ক্যাসিওপিয়ী



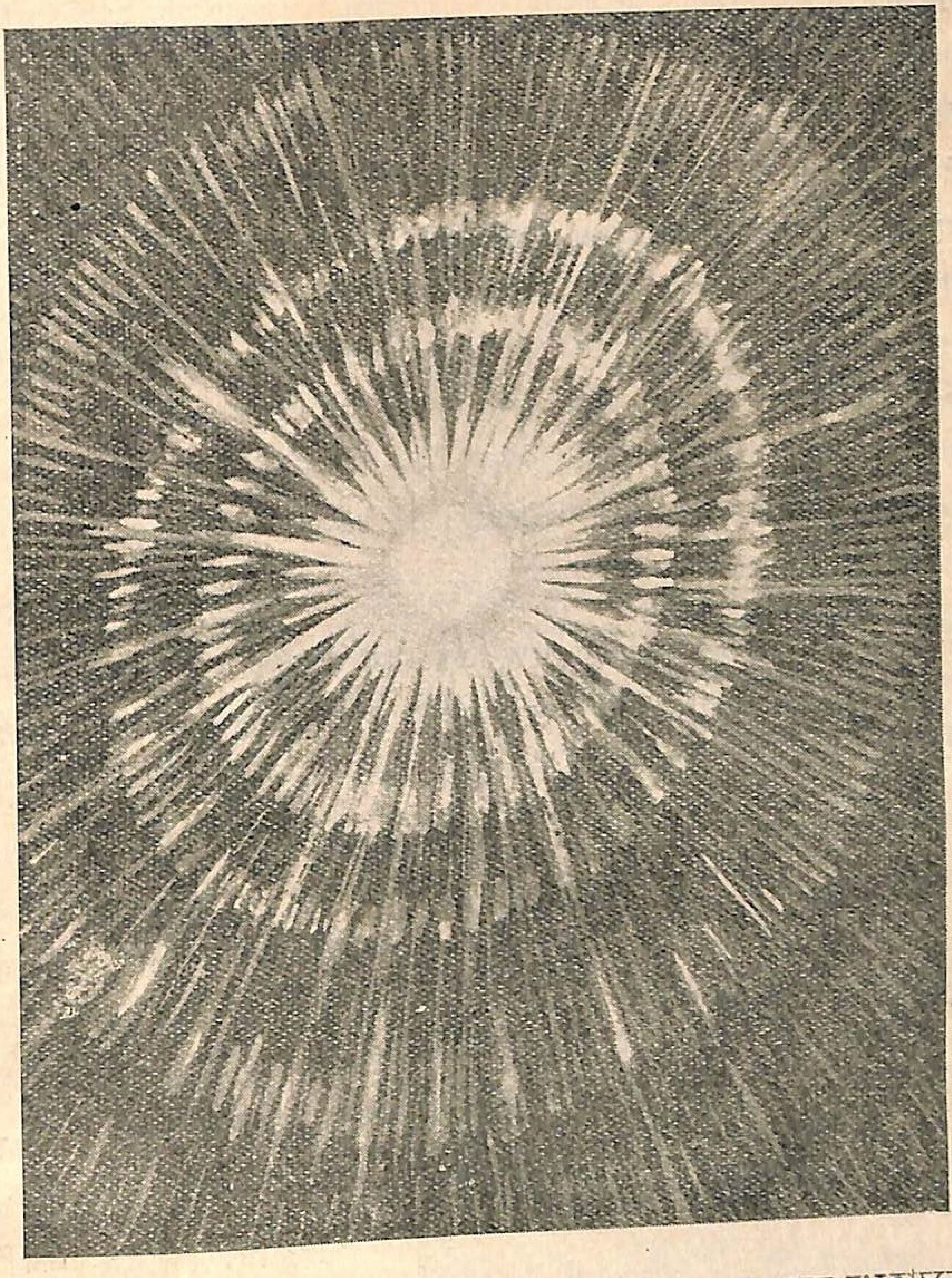
চিত্র ১৭৩। নোভা সিগ্‌নাই-এর আলোর লেখচিত্র।

(Nova Cassiopeiae) হঠাৎ শুক্রের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। সেই তারকা এখন আবার এত ম্লান হ'য়ে পড়েছে যে, আশেপাশের ম্লান তারকার সঙ্গে তার কোন পার্থক্যই আর বোঝা যায় না। এ ছাড়া ১৬০৪ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত নোভা ওফিউখি, ১৯০১ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত নোভা পারসিয়াই, ১৯১৮ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত নোভা একুইলি এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত নোভা সিগ্‌নাই-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকের

অনুমান, যীশুখ্রীষ্টের জন্মকালে যে 'বেথলেহেম তারা' দেখা গিয়েছিল, তাও একটি নোভা ছিল। বাস্তবিক নোভার আবির্ভাব খুব দুর্লভ ব'লে মনে হয় না। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, আমাদের নক্ষত্রজগতেই বছরে প্রায় ২০টি নোভার আবির্ভাব ঘটে, অবশ্য খালি চোখে তাদের সবার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, একপ্রকার ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলেই একটি তারকা একটি নোভায় পরিণত হয়। এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণ কি? আগেই বলেছি মরণোন্মুখ তারকার সংকোচন আরম্ভ হয়। এভাবে সংকুচিত হ'তে হ'তে অভ্যন্তরে চাপের মাত্রা যখন একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন হঠাৎ হয়তো পরমাণুগুলির ইলেক্ট্রন খোলস ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায়। তারকার অভ্যন্তরে যখন এরূপ বিপর্যয় ঘটবে তখন তারকাটি হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত সংকুচিত হ'তে থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই তারকাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায় এবং তার আয়তন হঠাৎ খুব কমে যায়। এর ফলে হঠাৎ যে অপরিসীম তাপ সৃষ্টি হয় তাই তারকাটির অভ্যন্তর থেকে বাইরের দিকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসে। আর এর ফলে তারকার বাইরের স্তরটি সবেগে বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। নোভার চারিদিকে যে ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল গ্যাসীয় আচ্ছাদন দেখা যায় তার সৃষ্টি সম্ভবত এভাবে হয়। এক কথায় বলা যায়, তারকার অভ্যন্তরে পরমাণু-বোমার অনুরূপ একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ হওয়াতেই তার নোভা-অবস্থা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

সূর্যও একটি তারকা। কাজেই অনেকের অভিমত, সূর্যও হয়তো একদিন এইরূপ নোভায় রূপান্তরিত হবে। তা যদি হয় তবে আমাদের অবস্থা কি হবে ভাবতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এসময় সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সবই মুহূর্তের মধ্যে গলে বাষ্পীভূত হ'য়ে যাবে, প্রচণ্ড উত্তপ্ত চুল্লীর মধ্যে ছোট একটি মোমবাতি নিক্ষেপ করলে যেমন হয়! এই ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যাবে যে, কি ঘটছে তা বুঝবার অবকাশও আমরা পাব না। সুদূর নীহারিকার অন্তর্গত কোন গ্রহবাসী

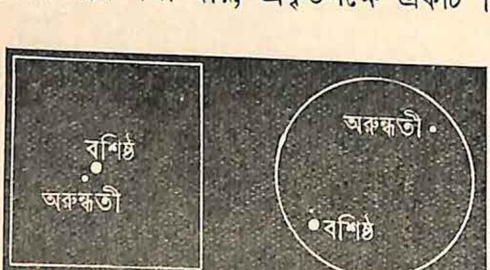


চিত্র ১৭৪। একটি নোভা বা নূতন তারার জন্ম। মরণোন্মুখ নক্ষত্রের দ্রুত সংকোচনের ফলে তা হঠাৎ এক সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায় এবং তার আয়তন খুব কমে যায়। এর ফলে অপরিসীম তেজ-শক্তির উদ্ভব হয়, তাই প্রচণ্ড বেগে নক্ষত্রটির অভ্যন্তর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে।

জীব যদি এসময় দূরবীণ দিয়ে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তাহ'লে সে দেখবে, আমাদের এই নক্ষত্রজগতের একটি নক্ষত্র হঠাৎ নোভায় রূপান্তরিত হ'ল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে নিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে যাবার আগে সূর্য হয়তো বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় এই সামান্য কাহিনীটুকু লিপিবদ্ধ ক'রে যেতে পারবে। কিন্তু সে কাহিনীও চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকবে না। ম্লান থেকে ম্লানতর হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত তাও একদিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে মহাকাশের অসীম অন্ধকারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি তারকারই পরিণতি হ'বে এরূপ।

যুগল-তারা

খালি চোখে দেখা যায় যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠ (Mizar) তারাটির খুব কাছেই একটি ম্লান তারা আছে, এর নাম অরুন্ধতী (Alcor)। কিন্তু একটি সাধারণ দূরবীণের সাহায্য নিলেই দেখা যাবে যে, বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে এবং বশিষ্ঠ দু'টি তারায় পরিণত হয়েছে। বশিষ্ঠ একটি **যুগল-তারা** (Double Star or Binary Star)। এরূপ দু'টি তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং একে অন্যের চারদিকে ঘোরে। আরো বিশদভাবে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চারদিকে তারকা দু'টি ঘোরে। এরূপ দু'টি তারকার ঔজ্জ্বল্য পরস্পরের সমান হওয়া সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি অন্যটির চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়। তারকা-দু'টি পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকতে পারে, আবার কখনও কখনও তারা এত



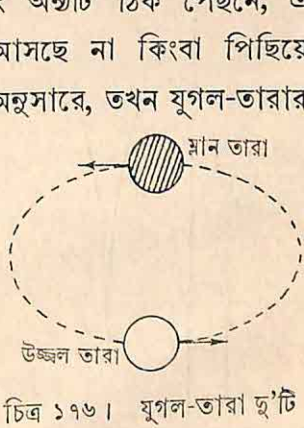
চিত্র ১৭৫। একটি সাধারণ দূরবীণের সাহায্যেই বোঝা যায় যে, বশিষ্ঠ একটি যুগল-তারা।

কাছাকাছি থাকে যে, তাদের পৃথক্ তারকারূপে দেখা সম্ভব হয় না। সময় সময় তাদের রঙে বেশ পার্থক্য দেখা যায়, যেমন—একটি হয়তো সোনালী কিন্তু অন্যটি নীল ; কিংবা একটি হয়তো হল্‌দে কিন্তু অন্যটি সবুজ। নীচে কয়েকটি যুগল-তারার পরিচয় দেওয়া হ'ল :—

(১) গামা-এণ্ড্রোমিডা (এণ্ড্রোমিডা-মণ্ডলের তৃতীয় প্রভার তারা), (২) বিটা-সিগ্‌নাস (হংসমণ্ডলের দ্বিতীয় প্রভার তারা), (৩) পুনর্বসু—২য় (Castor), (৪) ধ্রুবতারা, (৫) মঘা ইত্যাদি।

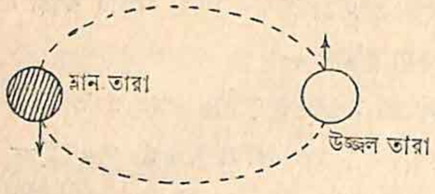
যুগল-তারার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কি ক'রে? ধরা যাক, যুগল-তারার একটি উজ্জ্বল এবং অন্যটি ম্লান। একটি বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে এরা ঘুরছে। উজ্জ্বল তারাটি সামনে থাকলে এই যুগল-তারার ঔজ্জ্বল্য বেশি হয়। কিন্তু যখন ম্লান তারাটি সামনে আসে তখন উজ্জ্বল তারাটি আড়ালে পড়ে, কাজেই তখন যুগল-তারাটি বেশ ম্লান দেখায়। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে উজ্জ্বল তারাটি আবার সামনে আসবে, তখন ঐ তারকার ঔজ্জ্বল্য আবার বাড়বে। উজ্জ্বল তারাটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ঘুরে ঘুরে আসে, কাজেই নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে যুগল-তারার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে ও কমে।

যুগল-তারার একটি ঠিক সামনে এবং অন্যটি ঠিক পেছনে, এ অবস্থায় কোনটিই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে না কিংবা পিছিয়ে যাচ্ছে না, দু'পাশে সরে যাচ্ছে। ডপ্‌লার-তত্ত্ব অনুসারে, তখন যুগল-তারার বর্ণালী স্বাভাবিক হবে। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরে একটি তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে এবং অন্যটি আমাদের কাছ থেকে সরে যেতে থাকবে। এ অবস্থায় যুগল-তারার বর্ণালী দু'ভাগ হ'য়ে যাবে। যে তারাটি এগিয়ে আসছে তার বর্ণরেখাগুলি নীল আলোর দিকে সরে যাবে, আর যেটি দূরে চলে যাচ্ছে তার বর্ণরেখাগুলি লাল আলোর দিকে সরে যাবে। কাজেই



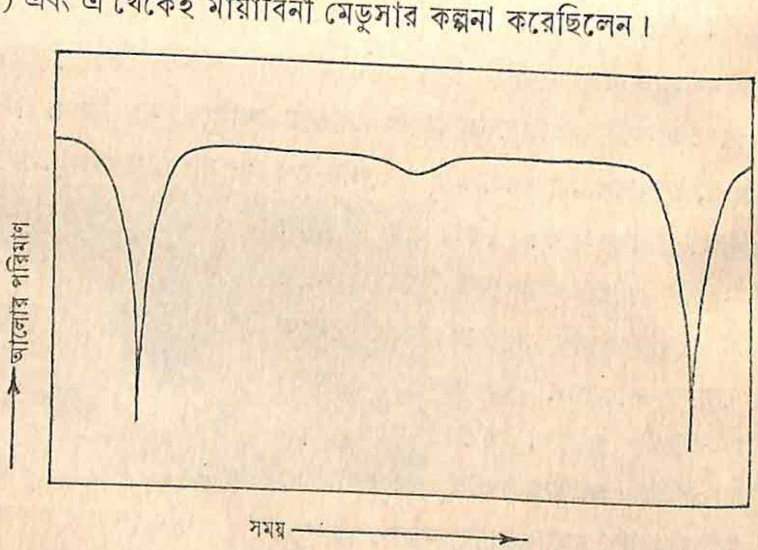
চিত্র ১৭৬। যুগল-তারা দু'টি দু'পাশে সরে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সময়ে একটি তারকার বর্ণালী পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, তা যুগল-তারা কিনা।



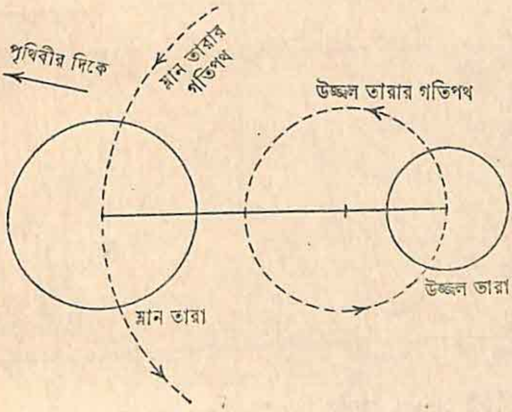
চিত্র ১৭৭। যুগল-তারার একটি এগিয়ে আসছে এবং অন্যটি পিছিয়ে যাচ্ছে।

পারসিউস নামক নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত এল্‌গল তারাটি এরূপ। এর ঔজ্জ্বল্য পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। সাধারণত একে একটি দ্বিতীয় প্রভার তারার মতো উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে এর ঔজ্জ্বল্য এত কমে যায় যে একে শেষ পর্যন্ত একটি চতুর্থ প্রভার তারার মতো ম্লান দেখায়। এ অবস্থায় প্রায় ২০ মিনিট থাকবার পরই এর ঔজ্জ্বল্য আবার বাড়তে আরম্ভ করে এবং প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে এ আবার পূর্বের ঔজ্জ্বল্য ফিরে পায়। মাঝে অল্পসময়ের জন্য এর ঔজ্জ্বল্য সামান্য হ্রাস পেয়ে আবার আগের মতোই হয়। তারপর তারকাটিকে আবার আগের মতোই ম্লান দেখায়। এই পর্যায়কাল হ'ল প্রায় ৬৯ ঘণ্টা। ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তন করতে পারে ব'লে প্রাচীন বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছিলেন 'দৈত্য তারা' (Demon star) এবং এ থেকেই মায়াবিনী মেডুসার কল্পনা করেছিলেন।



চিত্র ১৭৮। এল্‌গল-এর আলোর লেখচিত্র। এর পর্যায়কাল হ'ল প্রায় ৬৯ ঘণ্টা।

শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখলেও এল্‌গলকে পৃথক্ দু'টি তারারূপে দেখা যায় না, কিন্তু নানারূপ পরীক্ষার ফলে বোঝা গেছে যে, এটি প্রকৃতপক্ষে একটি যুগল-তারা। এই তারা দু'টি বিভিন্ন কক্ষপথে একটি কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। আয়তনে যেটি বড় সেটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। এই



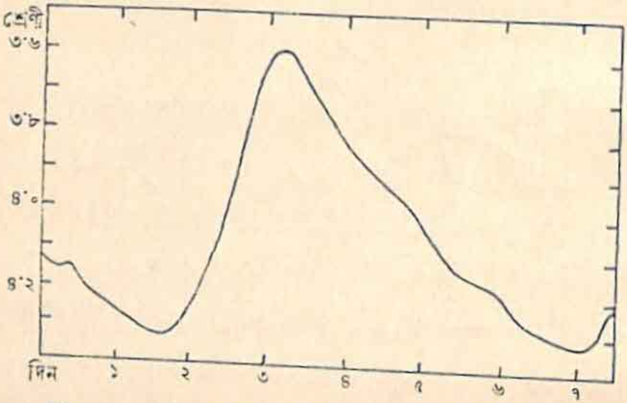
চিত্র ১৭৯। এল্‌গল প্রকৃতপক্ষে যুগল-তারা। এই তারা দু'টি একটি কেন্দ্রের চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে, তবে এদের কখনও দু'টি পৃথক্ তারারূপে দেখা যায় না। বড় ম্লান তারাটি সামনে এলে ঔজ্জ্বল্য কমে যায়, আর পাশে গেলে ঔজ্জ্বল্য বেশি হয়। ম্লান তারাটি একেবারে পেছনে গেলে ঔজ্জ্বল্য সামান্য হ্রাস পায় মাত্র।

তারাটি সামনে এলে ছোট উজ্জ্বল তারাটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে যায়, তাই তখন ঔজ্জ্বল্য অনেক কমে যায়। আবার ছোট অথচ উজ্জ্বল তারাটি যখন সামনে আসে তখন বলয়-গ্রহণ হয়, কাজেই তখন ঔজ্জ্বল্য সামান্য একটু কমে মাত্র, আগের মতো হ্রাস পেতে পারে না। এভাবে এল্‌গলের ঔজ্জ্বল্য পর্যায়ক্রমে বাড়ে এবং কমে।

সিফাইড তারা বা স্পন্দনশীল তারা

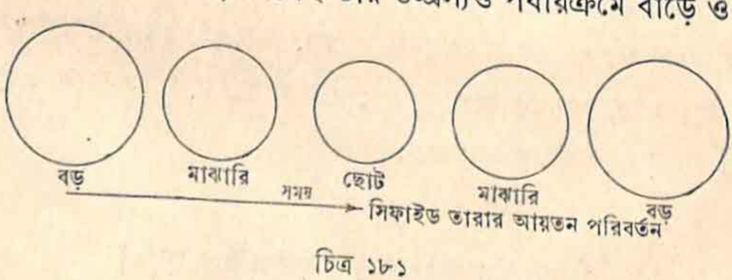
সিফিউস নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত ডেল্টা-সিফাই নক্ষত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। পাঁচদিন পর পর এর উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কিন্তু বিভিন্ন

সময়ে এর বর্ণালী পরীক্ষা ক'রেও কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। কাজেই এ যুগল-তারা হ'তে পারে না। বিজ্ঞানীদের অনুমান, নক্ষত্রটি পর্যায়ক্রমে প্রসারিত এবং সংকুচিত হচ্ছে। নক্ষত্রটি যখন সংকুচিত হয় তখন মহাকর্ষীয় শক্তি (Gravitational energy) তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কাজেই



চিত্র ১৮০। ডেল্টা-সিফাই-এর আলোর লেখচিত্র।

তখন নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। কিন্তু এই তাপের প্রভাবে নক্ষত্রটি আবার প্রসারিত হ'তে থাকে। এতে তার তাপ যায় কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ঔজ্জ্বল্যও কমে। এভাবে প্রসারিত হ'য়ে ঠাণ্ডা হ'লে আবার তা মহাকর্ষীয় শক্তির প্রভাবে সংকুচিত হ'তে আরম্ভ করে। হৃদয়যন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণ যেভাবে চলে, অনেকটা সেভাবে নক্ষত্রটি পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, কাজেই তার ঔজ্জ্বল্যও পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে।



চিত্র ১৮১

ডেল্টা-সিফাই নক্ষত্রটির নামানুসারে এরূপ নক্ষত্রের নামকরণ হয়েছে সিফাইড তারা (Cepheid Variable Star) বা স্পন্দনশীল তারা

(Pulsating Star)। আকাশে এরূপ নক্ষত্র আরো আবিষ্কৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিফাইড তারার পরিচয় নীচে দেওয়া হ'ল।

৬নং তালিকা। **কয়েকটি সিফাইড তারার পরিচয়**

নক্ষত্রের নাম	পর্যায়কাল
RR লাইরা	০'৫৭ দিন
SU ক্যাসিওপিয়ী	১'৯৫ "
a আরসা মাইনর	৩'৯৭ "
δ সিফাই	৫'৩৭ "
η একুইলি	৭'১৮ "
ζ জেমিনোরাম	১০'১৫ "
X সিগনাই	১৬'৩৮ "
y ওফিউখি	১৭'১২ "
l ক্যারিনি	৩৫'৫২ "

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহাজাগতিক রশ্মি

আবিষ্কার এবং তথ্যানুসন্ধান

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'আয়নীভবন-কক্ষ' (Ionization chamber) নিয়ে পরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞানীরা বাতাসে একপ্রকার অদৃশ্য এবং রহস্যময় আলোক-রশ্মির সন্ধান পেলেন। এই আলোক-রশ্মি এত শক্তিধর যে, যেসব পদার্থ 'এক্স-রে' বা রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ তাও এই নূতন রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ ব'লে প্রমাণিত হ'ল। যেমন, সাধারণত রঞ্জন-রশ্মি $\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে যেতে পারে না, কিন্তু এই নূতন রশ্মির শতকরা অন্তত ২০ ভাগ ৪ ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে চলে যায় অনায়াসে।

ইতিপূর্বে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল (Radio-active elements) আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, এসব মৌল-ঘটিত যৌগিক পদার্থ থেকে সতত রশ্মি বিকীর্ণ হয়। কাজেই বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মনে করলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে ইতস্তত যেসব তেজস্ক্রিয় মৌলের খনিজ ছড়ানো রয়েছে তা থেকেই এই রশ্মি সতত উৎসারিত হ'য়ে আসছে। এই মতবাদ যাচাই ক'রে দেখার উদ্দেশ্যে তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হ'ল।

এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যাক্লেনান ১৯০৭ সালে। তিনি গবেষণাগারের মধ্যে এবং বাইরে তথ্যানুসন্ধান ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, শীতকালে ওন্টারিও হ্রদের মাঝখানে

জমাটবাঁধা বরফের উপরে বসেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। এসব পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, পার্থিব শিলা থেকে এই রশ্মি নির্গত হচ্ছে, এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর মতে এই রশ্মির উৎপত্তি হচ্ছে হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, নয়তো পৃথিবীর বাইরে সুদূর নক্ষত্রলোকে।

এজন্য বিজ্ঞানী গোকেল বেলুনে ক'রে বায়ুমণ্ডলে অভিযান চালালেন ১৯০৯, ১৯১০ এবং ১৯১১ সালে। তিনি সবচেয়ে উঁচুতে ১৪,০০০ ফুট অবধি উঠতে সক্ষম হলেন। তাঁর যুক্তি হ'ল, যদি পার্থিব শিলা থেকে কিংবা বায়ুমণ্ডলে এই রশ্মির উৎপত্তি হ'য়ে থাকে তবে যত উপরদিকে ওঠা যাবে এই রশ্মির পরিমাণ তত কমে যাবে। কিন্তু গোকেল দেখলেন, যত উপরে ওঠা যায় এই রশ্মির পরিমাণ কমা তো দূরের কথা, ক্রমশ আরও বাড়তে থাকে।

এরপর অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী হেস্ এবং জার্মান বিজ্ঞানী কোল্‌হোয়েস্টার বেলুনে ক'রে আরও কয়েকটি সফল অভিযান চালালেন ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে। এঁরা ৩০,০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত উঠে তথ্য সংগ্রহ করলেন। দেখা গেল, সমুদ্র-পৃষ্ঠে এই রশ্মির যে পরিমাণ তার ১০ গুণ হয় এই উচ্চতায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এই রশ্মির উৎপত্তি হয় পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনস্থানে, সেখান থেকে বায়ুস্তর ভেদ ক'রে এসে এই রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়।

১৯১৪ সালে আরম্ভ হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধ। এজন্য গবেষণার কাজ বন্ধ রইলো কয়েক বছর। তারপর ১৯২৫ সালে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী মিলিকান ও তাঁর সহকারিবৃন্দ। স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁরা এত নূতন তথ্য সংগ্রহ ক'রে ফেললেন যে এই অজ্ঞাত রশ্মির সকল গুপ্ত রহস্যই প্রকাশিত হ'য়ে পড়লো বিজ্ঞানীদের কাছে।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম প্রদেশে তথ্যানুসন্ধানের জন্য মিলিকান এক নূতন এবং সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পর পর দু'টো বেলুনের সঙ্গে বেঁধে উপরে পাঠানো হ'ল। উপরের বায়ুস্তর ক্রমশ

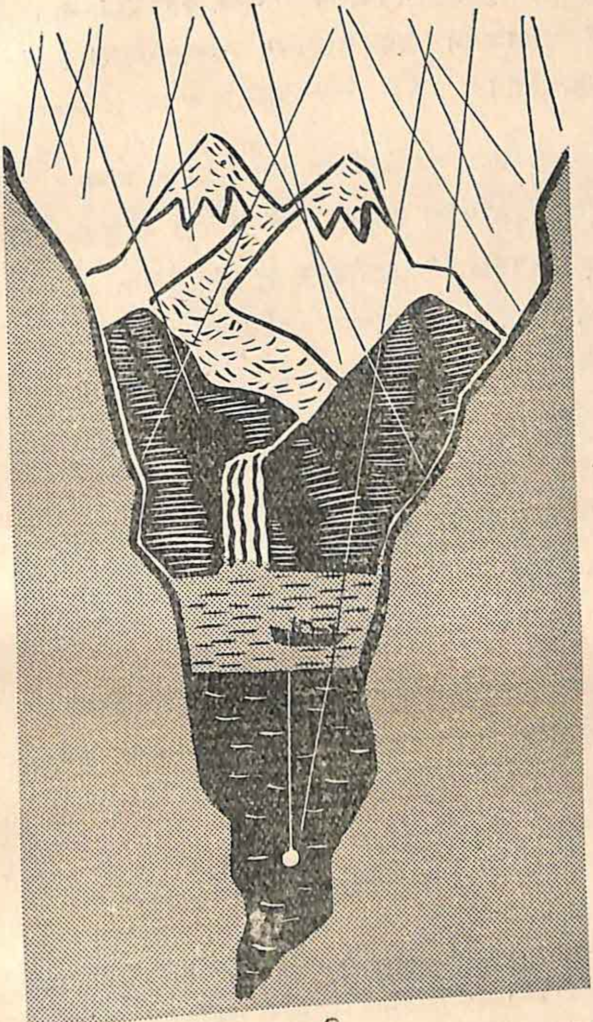
পাতলা হ'য়ে গেছে। কাজেই সেখানে গিয়ে প্রসারিত হওয়ার ফলে উপরের বেলুনটি ফেটে যাবে। যন্ত্রটি তখন অন্য বেলুনে ভর ক'রে ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসবে। এই সহজ পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের আরও অনেক উচ্চস্তরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল। দেখা গেল, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞাত রশ্মির পরিমাণও ক্রমশ বাড়তে থাকে। আরও বোঝা গেল যে, এই রশ্মি বায়ুমণ্ডলে বিশেষ শোষিত হয় না। অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ ধারণা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর এই রশ্মি।

মিলিকান এরপর সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে অবস্থিত পাহাড়িয়া হ্রদের জলে (বরফ-গলা জলে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত হবার সম্ভাবনা খুব কম) যন্ত্র নামিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, জলের যত নীচে যাওয়া যায় এই রশ্মির পরিমাণ তত কমে। মিলিকান আরও দেখলেন, এই রশ্মি এত শক্তিধর যে, উপরের বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসা সত্ত্বেও তা আরও ৫০ ফুট গভীর জলের স্তর অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। হিসেব ক'রে দেখা গেল, এই রশ্মি অনায়াসে ৬ ফুট পুরু সীসার স্তরও ভেদ ক'রে যেতে পারবে, এত শক্তিধর এই রশ্মি।

এই সময় উইল্‌সন, এডিংটন প্রভৃতি প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা বললেন, সম্ভবত দূরবর্তী কোনস্থানে বজ্রপাতের ফলে উৎপন্ন উচ্চ-বিভবসম্পন্ন ইলেক্‌ট্রন-স্রোত থেকেই এরূপ রশ্মির সৃষ্টি হয়। মিলিকান এই যুক্তিও খণ্ডন করলেন একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে। তিনি উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এমন একটি হ্রদ বেছে নিলেন, যাকে এই অজ্ঞাত রশ্মি ধরার এক প্রাকৃতিক দূরবীণ ব'লে মনে করা যায়। আশেপাশে বজ্রপাতের ফলে ইলেক্‌ট্রন-প্রবাহ যদি সৃষ্টি হয়ও তবে তা পাহাড়ে প্রতিহত হবে। সুদূর অন্তরীক্ষ থেকে আগত রশ্মিগুলিই শুধু যন্ত্রে পৌঁছাতে পারবে। এখানে যেসব তথ্য সংগৃহীত হ'ল তাতে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণ করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

এভাবে নানারূপ পরীক্ষা ক'রে মিলিকান বুঝলেন যে, পৃথিবীর

বাইরে, সম্ভবত সুদূর নক্ষত্রলোকে, সৃষ্টি হ'য়ে অশ্রুতপূর্ব এবং প্রখর



চিত্র ১৮২। মহাজাগতিক রশ্মি ধরার প্রাকৃতিক দূরবীণ। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা হ্রদের জলে যন্ত্র নামিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মহাশূন্য থেকে আগত একটি রশ্মি-কণিকা যন্ত্রে পৌঁছাচ্ছে।

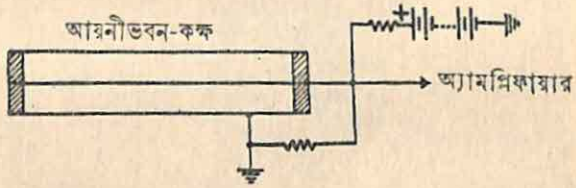
শক্তিধর একপ্রকার আলোক-রশ্মি অবিরল ধারায় বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর উপরে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র এর অবাধ গতিবিধি।

দিবারাত্রির পরিবর্তনের ফলে কিংবা ছায়াপথের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির জন্য এর তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষ উপলব্ধি করা যায় না। এসব কারণে মিলিকানই সর্বপ্রথম এর নামকরণ করলেন 'Cosmic rays' বা মহাজাগতিক রশ্মি।

গাইগার-মূএলার কাউণ্টার এবং মেঘকক্ষ

মহাজাগতিক রশ্মি অদৃশ্য, তাহ'লে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কি ক'রে? এতকাল "আয়নীভবন-কক্ষে"র (Ionization chamber) সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিলো। ক্রমে আরও উন্নতধরনের যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হ'ল। তাদের মধ্যে "গাইগার-মূএলার কাউন্টার" (Geiger-Mueller counter) এবং মেঘকক্ষের (Cloud chamber) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আয়নীভবন-কক্ষের কার্যপ্রণালী বিশেষ জটিল নয়। এতে একটি ধাতব সিলিণ্ডারের মাঝখানে অন্তরিত অবস্থায় (insulated) একটি ধাতব তার থাকে। তারটি উচ্চ-বিভবে (high potential) এমনভাবে আহিত



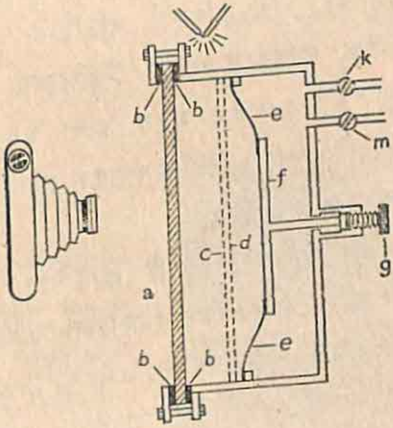
চিত্র ১৮৩। আয়নীভবন-কক্ষের নকশা।

ক'রে (charged) রাখা হয় যে, বিভব-বৈষম্য আর একটু বাড়লেই তড়িৎ ঝিলিক দেবে। এই অবস্থায় যদি কোন আহিত কণিকা হঠাৎ সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সেখানকার বায়ুকণাগুলি আয়নিত হয় (Ionise)। সঙ্গে সঙ্গে মাঝের তার থেকে সিলিণ্ডারের দিকে দ্রুত তড়িৎ-মোক্ষণ হয়।

গাইগার-মুএলার কাউন্টারে এরূপ একটি আয়নীভবন-কক্ষের সঙ্গে একটি অ্যাম্প্লিফায়ার বা শব্দপ্রসারক-যন্ত্র এমনভাবে লাগানো থাকে যে,

এরূপ ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ হয়। বিকল্প ব্যবস্থায় মুহূর্তের জন্য একটি লাল বাতি জ্বলে ওঠে। এজন্য কাউন্টারের মধ্যে কোন আহিত কণা প্রবেশ করা মাত্রই তা টের পাওয়া যায়।

উইল্‌সনের মেঘকক্ষ যন্ত্রটির গঠন জটিল হ'লেও এর কার্যপ্রণালী মোটেই জটিল নয়। আমরা জানি, অধিক চাপের অধীনস্থ কোন গ্যাসের চাপ হঠাৎ কমিয়ে দিলে তা দ্রুত প্রসারিত হয় এবং এর ফলে তার উষ্ণতা অনেকটা কমে যায়। ধূলিকণা-মুক্ত একটি আবদ্ধ কক্ষ জলীয় বাষ্পদ্বারা সংতৃপ্ত (saturated) ক'রে রাখা হয়। এর বিস্তার যদি হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে ঐ বাষ্প প্রসারিত হ'য়ে আরও ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়বে এবং তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হ'তে চাইবে। ধন বা ঋণ তড়িৎ-কণিকামাত্রই তার গতিপথস্থিত অণু-পরমাণুর কণাগুলিকে আয়নে পরিণত ক'রে দেয়। আর এসব আয়নিত কণাকে আশ্রয় ক'রে আরও সহজেই জলবিন্দুর সৃষ্টি হ'তে পারে। বাস্তবিক বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বপ্রদেশে এই পদ্ধতিতেই জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। কাজেই মেঘকক্ষ যখন বিস্তার লাভ করছে সেই মুহূর্তে যদি কোন আহিত কণিকা ঐ কক্ষে প্রবেশ করে তবে তার গতিপথস্থিত জলীয় বাষ্প জমে একটি



চিত্র ১৮৪। মেঘকক্ষের নকশা। উপরে আলো এবং একপাশে ক্যামেরা। a-কাচের ঢাকনা, b-রবারের বলয় (যন্ত্রটি বায়ুরোধী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত), c-কালো ভেল্‌ভেটের পর্দা (পেছনে এরূপ কালো পর্দা থাকলে আয়নিত কণিকার গতি-পথ স্পষ্ট দেখা যায়, এর ফলে ফটো ভালো হয়। তা ছাড়া এরূপ পর্দা থাকলে গ্যাসের আলোড়ন কম হয়।), d-তার-জালি, e-রবারের চাদর, f-পিস্টন, g-পিস্টনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্ক্রু, k, m-উচ্চ-চাপ অথবা নিম্ন-চাপে সংরক্ষিত আধারের সঙ্গে সংযোগকারী ভাল্‌ভ।

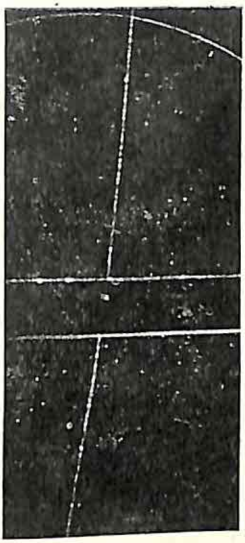
ধূমায়িত রেখার সৃষ্টি করবে। তাহ'লে ঐ ধূমায়িত রেখাপথ দেখেই আহিত কণিকাটির গতিপথের নির্দেশ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা যথোপযুক্ত ভাবে ঐ কক্ষ আলোকিত ক'রে রাখেন এবং ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন দিক থেকে ঐ কক্ষের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এভাবে অনেক সহজেই মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার গতিবিধির ফটো তোলা সম্ভব হয়েছে। এসব আহিত কণিকার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য সাধারণত মেঘকক্ষটি একটি শক্তিশালী চুম্বকের মাঝে রাখা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রে আহিত কণিকার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে অনায়াসে বলা যায়, তা ধন কিংবা ঋণ-তড়িৎ-যুক্ত এবং তার ভর কিরূপ।

পর পর কয়েকটি কাউন্টার এবং মেঘকক্ষ এমনভাবে সাজিয়ে রাখা যায় যে, তাদের সাহায্যে 'একটিমাত্র' মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার গতিপথ অনুসরণ করা যায় এবং রশ্মি-কণিকাটি যখন মেঘকক্ষে প্রবেশ করে তখন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার গতিবিধির ফটো তোলা সম্ভব হয়। এভাবে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে আরও অনেক নূতন এবং বিচিত্র তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে।

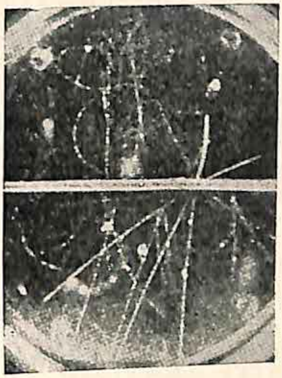
মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ

১৯৩২ সালে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী রোসি প্রমাণ পেলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ এক সময় হয়তো একসঙ্গে অনেক মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ হয়। মেঘকক্ষেও এর প্রমাণ পাওয়া গেল। মেঘকক্ষের মধ্যে একটি সীসার পাত রেখে দেখা গেল, একটি মহাজাগতিক রশ্মি যখন সীসার পাত অতিক্রম করে তখন তা থেকে একজোড়া বা কয়েক জোড়া নূতন রশ্মির উৎপত্তি হয়। একেই বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ (Cosmic ray showers)।

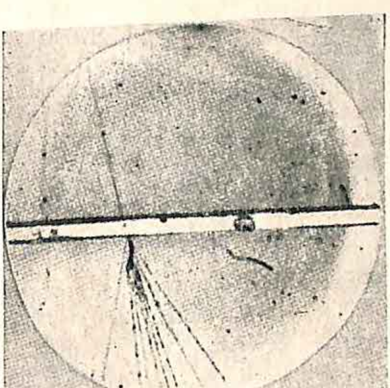
একটা ইলেক্ট্রন তড়িৎবলক্ষেত্রে এক ভোল্ট বিভব-বৈষম্যের ভিতর দিয়ে যখন যায় তখন তার শক্তির যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলা হয় এক 'ইলেক্ট্রন ভোল্ট' (Electron-volt)। ১৯২৮ সালে বিজ্ঞানী ডিরাক



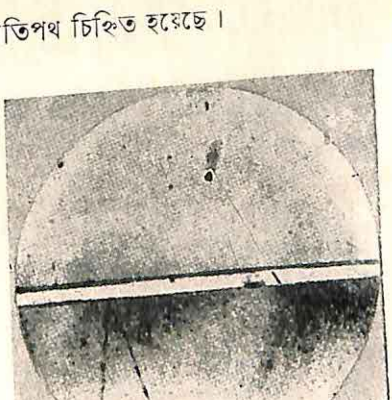
একটি শক্তিধর মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার গতিপথ। ২ সেন্টিমিটার পুরু তামার পাত অতিক্রম করা সত্ত্বেও এর গতিপথে বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, কারণ এর শক্তি বিশেষ হ্রাস পায় নি।



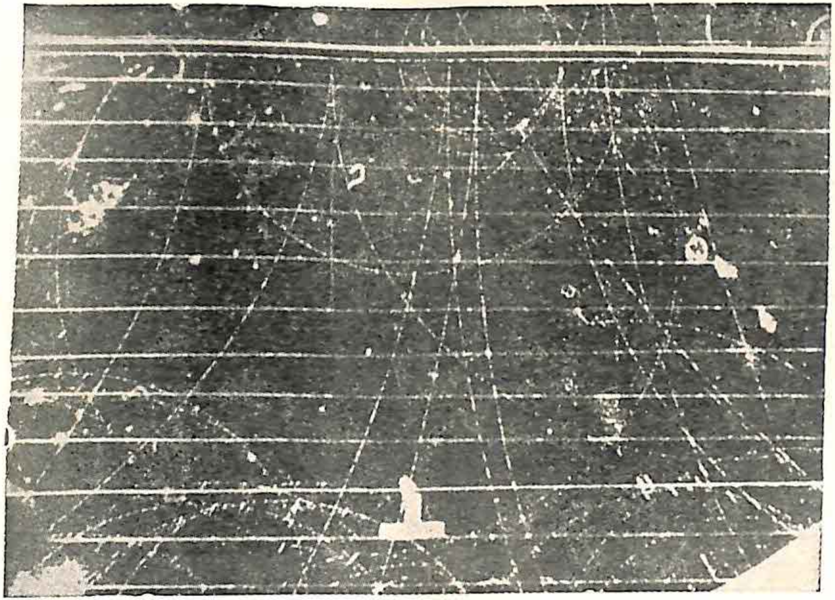
মেসট্রন বা মেসন কণিকার আবিষ্কার। গামা-রশ্মি ফোটনের সাহায্যে সীসার পাতের একই বিন্দুতে ছয়টি আহিত কণিকার সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে যে রেখাটি সবচেয়ে স্পষ্ট তার জন্য দায়ী একটি মেসন কণিকা। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এর ভর একটি প্রোটন এবং একটি ইলেক্‌ট্রন কণিকার মাঝামাঝি।



মেঘকক্ষে বর্ষণ। এ ক্ষেত্রে বর্ষণের জন্য দায়ী গামা-রশ্মি ফোটন, কারণ সীসার পাতের উপরের অংশে আগত রশ্মির গতিপথ চিহ্নিত হয় নি (আহিত কণিকা হ'লে তা নিশ্চয়ই হ'ত)।



মেঘকক্ষে বর্ষণ। এ ক্ষেত্রে বর্ষণের জন্য দায়ী একটি আহিত কণিকা, কারণ সীসার পাতের উপরের অংশে আগত রশ্মির গতিপথ চিহ্নিত হয়েছে।



মহাজাগতিক রশ্মি (প্রবাসীর সৌজন্যে)

একটি গামা-রশ্মি ফোটন যখন একটি কেন্দ্রকের নিকট দিয়ে যায় তখন তার শক্তির কিছু অংশ একজোড়া পজিট্রন-ইলেক্‌ট্রনে রূপান্তরিত হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ১'০২ মিলিয়ন ইলেক্‌ট্রন ভোল্টের বেশি শক্তিধর গামা-রশ্মি যদি কোন পরমাণুর কেন্দ্রকের (nucleus) নিকট দিয়ে যায় তবে তা একজোড়া পজিট্রন-ইলেক্‌ট্রনে পরিণত হবে। বর্তমান কালের পরীক্ষায় ডিরাক-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। মেঘকক্ষে গৃহীত ফটোতে দেখা গেছে যে, অনুকূল পরিবেশে গামা-রশ্মি ফোটন সত্য সত্যই একজোড়া পজিট্রন-ইলেক্‌ট্রনে রূপান্তরিত হয়। এদের ভর সমান আর তড়িৎ-আধান সমান কিন্তু বিপরীতধর্মী, অর্থাৎ একটি পজিটিভ অন্যটি নেগেটিভ। কাজেই চৌম্বক ক্ষেত্রে তাদের গতিপথ সমান তালে দু'দিকে বেঁকে যায়।

এজন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, যখন একটি গামা-রশ্মি ফোটন (এক কোয়াণ্টাম শক্তি) একটি কেন্দ্রকের নিকট দিয়ে যায় তখন তার শক্তির কিছু অংশ হঠাৎ একজোড়া পজিট্রন-ইলেক্‌ট্রনে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। এই কণিকা দু'টিতে গতিবেগ সঞ্চারিত হয় অবশিষ্ট শক্তিটুকুর সাহায্যে। এরূপ কণিকা আবার চলতে চলতে যখন অন্য একটি কেন্দ্রকের নিকটে যায় তখন তার গতিবেগ মন্দীভূত হয়, এ অবস্থায় তা থেকে পুনরায় সৃষ্টি হয় গামা-রশ্মি ফোটনের। এভাবে শক্তি (photon) থেকে আহিত কণিকা (charged particle) এবং তা থেকে আবার শক্তির সৃষ্টি হ'তে পারে পর্যায়ক্রমে। এজন্য একটি থেকে দু'টি, দু'টি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এভাবে কণিকার সংখ্যা আঙ্কিক নিয়মে বেড়ে যেতে পারে। এই কারণে হঠাৎ একসময় কতকগুলি আহিত কণিকার বর্ষণ হ'তে দেখা যায়। আর্ট প্লেটের ৩নং চিত্রে দেখা যাবে, মেঘকক্ষে প্রথমে একটিমাত্র মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকা এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সীসার পাত ভেদ ক'রে যাবার সময় তা থেকেই অনেকগুলি আহিত কণিকার উদ্ভব হয়েছে। আবার আর্ট প্লেটের ৪নং চিত্রের বর্ষণের জন্য দায়ী নিশ্চয়ই একটি ফোটন, কারণ মেঘকক্ষে আগত রশ্মির কোন ফটো ওঠেনি। কাজেই তা আহিত কণিকা হ'তে পারে না, আহিত কণিকা হ'লে মেঘকক্ষে তার ফটো নিশ্চয়ই উঠতো। এসব পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল, সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে আগত প্রাথমিক পর্যায়ের রশ্মি

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে যেসব দ্বিতীয় পর্যায়ের রশ্মি উৎপন্ন হয় সেগুলিই প্রধানত বর্ষণের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীদের অনুমান এরূপ বর্ষণের মধ্যে আহিত কণিকার সংখ্যা যেরূপ হয়, ফোটনের সংখ্যাও প্রায় সেইরূপই থাকে।

মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতি

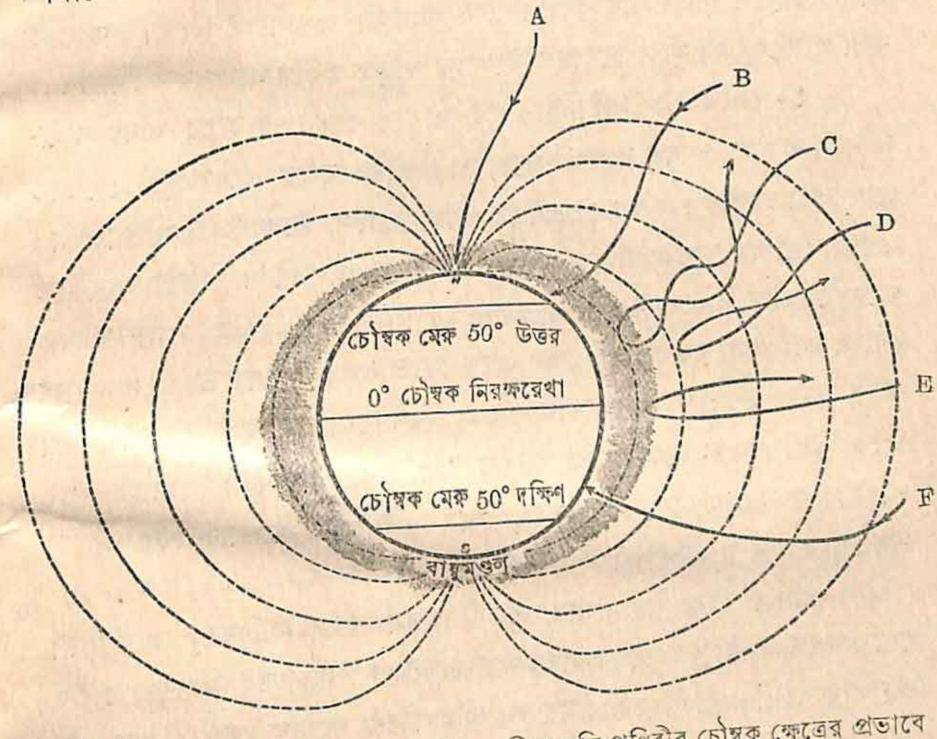
তীক্ষ্ণ রঞ্জন-রশ্মি ½ ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে যেতে পারে। গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও কম এবং তা কয়েক ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে যেতে পারে। মহাজাগতিক রশ্মির কঠিন বাধা ভেদ ক'রে চলার ক্ষমতা আরও অনেক বেশি। তাই লক্ষ্য ক'রে মিলিকান বললেন, এই রশ্মি যদি তরঙ্গধর্মী হয় তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই আরও কম হবে।

কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা (intensity) ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র সমান নয়। নিরক্ষরেখার উপর এর তীব্রতা সবচেয়ে কম এবং যেস্থানের অক্ষাংশ যত বেশি সেখানে এই রশ্মির তীব্রতাও তত বেশি হয়। এ থেকে একথাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর যে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে তারই উপর এই রশ্মির তীব্রতা অনেকখানি নির্ভর করছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, গামা-রশ্মির উপর চুম্বকের কোন প্রভাব নেই। পক্ষান্তরে ধন বা ঋণ-তড়িৎযুক্ত কণিকা অতি সহজেই চুম্বকদ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই এই রশ্মি তরঙ্গধর্মী হ'তে পারে না, দ্রুত গতিশীল ধন বা ঋণ-তড়িৎযুক্ত কণিকা হওয়াই সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা এখন জানতে পেরেছেন যে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে প্রাথমিক পর্যায়ের যে রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে তার উপাদান নানারূপ আহিত কণিকা। শতকরা ৯১ ভাগ হ'ল ধন-তড়িতাবিষ্ট প্রোটন কণিকা বা হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক, কিন্তু এদের গতিবেগ এত বেশি যে সহসা প্রোটন ব'লে চেনা কঠিন। ৮ ভাগ হ'ল আল্‌ফা-কণিকা বা হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক, আর ১ ভাগ হ'ল অন্যান্য ভারি পরমাণুর কেন্দ্রক।

প্রাথমিক পর্যায়ের কণিকাগুলি মহাশূন্য থেকে এসে পৃথিবীর বায়ু-

মণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে অবিরত প্রচণ্ডবেগে বর্ষিত হচ্ছে। এরা ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রে সেখানকার পরমাণুগুলিকে প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলে। এর ফলে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক রশ্মি। এরাই ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হয় অবিরল ধারায়।



চিত্র ১৮৫। মহাশূন্য থেকে আগত আহিত কণিকাগুলি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে কিভাবে বিক্ষিপ্ত হয় তাই দেখানো হয়েছে। বিন্দুদ্বারা চিহ্নিত রেখাগুলির সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বুঝানো হয়েছে। A, B, C, D ইত্যাদি হ'ল বিভিন্ন আহিত কণিকা। চৌম্বক মেরুর সন্নিহিত অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকাগুলি সহজেই ভূ-পৃষ্ঠে পৌছাতে পারে। কিন্তু অন্যত্র তা হয় না, সেখানে শুধু অত্যধিক শক্তিধর মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার পক্ষেই ভূ-পৃষ্ঠে পৌছানো সম্ভব হয়।

সৌরদেহে যে ভাঙাগড়া চলছে, তার পরিমাণ সব সময় একরূপ থাকে না। এর পরিমাণ সবচেয়ে কম দেখা যায় ১৯৫৪ সালে, আর

সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে। এই সময়কার পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ ক'রে বোঝা গেছে যে, সূর্যের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। প্রতি ১১ বছর পর পর সৌরকলঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিও এই কাল-চক্রের আবর্তন অনুসারেই ঘটে। কাজেই বলা যায় যে, এর মূলে রয়েছে সূর্যদেহের তড়িচ্চুম্বকীয় নানারকম ক্রিয়া।

১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে এসব বশ্মি-কণিকা কতদূর প্রবেশ করতে পারে, তা পরীক্ষা ক'রে এদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে প্রোটন, ইলেক্ট্রন এবং পজিট্রন। এদের বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির 'সফ্‌ট্ কম্পোনেণ্ট'। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে মেসট্রন বা মেসন (Mesotron or Meson)। এর শক্তি অনেক বেশি, তাই ইহা বহু জিনিস ভেদ ক'রে যেতে সক্ষম। এর ভর ইলেক্ট্রনের প্রায় ২০০ গুণ ; তড়িৎ-আধান ধন বা ঋণ যে কোনরূপ হ'তে পারে। একে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির 'হার্ড কম্পোনেণ্ট'। সৌরকলঙ্কের পরিমাণ যখন সবচেয়ে কম থাকে, তখন এই হার্ড কম্পোনেণ্টের তীব্রতা শতকরা ৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। সৌরকলঙ্কের সর্বাধিক বৃদ্ধির সময় যত এগিয়ে আসে, ততই মহাশূন্য থেকে বহু শক্তিশালী রশ্মি পথভ্রষ্ট হ'য়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। কিন্তু এরা কিছুদূর এসেই বাধাপ্রাপ্ত হয় ব'লে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে না। অনেকের ধারণা, কোন কোন সৌরকলঙ্কের দরুন মহাজাগতিক রশ্মির পথ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণে যে গ্যাসরাশি উৎসারিত হয়, তাই এই রশ্মিকে পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধা দেয়।

মহাজাগতিক রশ্মি তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতোই মানুষের এবং অন্যান্য জীবের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। আমাদের একান্ত সৌভাগ্য যে, আমাদের চারিদিকে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের রক্ষাকবচ। বায়ুমণ্ডলই আমাদের প্রতি-নিয়ত মহাজাগতিক রশ্মির অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করছে।

কারণ বায়ু থাকাতেই প্রাথমিক পর্যায়ের রশ্মি সোজাসুজি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। তাছাড়া পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র থাকায় স্বল্পশক্তিধর মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকাগুলি যত সহজে চৌম্বক মেরুতে পৌঁছাতে পারে অন্যত্র তা পারে না, তাই ভূ-পৃষ্ঠের জনাকীর্ণ অঞ্চলে এরূপ রশ্মির তীব্রতা তেমন উপলব্ধি করা যায় না। এটাও কম ভাগ্যের কথা নয়।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি

মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। প্রথম-দিকে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি হ'ল অত্যন্ত শক্তিধর আলোক-রশ্মি বা ফোটন, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম। তখন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন্‌স বলেছিলেন, সূর্য বা নক্ষত্রের প্রচণ্ড উষ্ণতায় পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। বাঁধনমুক্ত বিপরীতধর্মী এসব তড়িৎ-কণিকা প্রচণ্ডবেগে ছুটোছুটি করতে থাকে। এভাবে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি ইলেক্ট্রনের সংঘর্ষ হ'লে বিপরীতধর্মী তড়িৎ-কণিকার প্রবল আকর্ষণে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে যে পরিমাণ জড়পদার্থ লোপ পায় তাই থেকে সৃষ্টি হয় খানিকটা শক্তি, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'ফোটন' (photon)। এভাবে জড়-কণিকার বিলয় হ'য়ে তার পরিবর্তে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত, আর পৃথিবীর উপর তারই বর্ষণ চলছে অবিরল ধারায়। এজন্য জিন্‌স বলেছেন, এই বিশ্বে যা-কিছু দৃশ্যমান তা চিরকালের জন্য অদৃশ্যমানে রূপান্তরিত হ'য়ে চলেছে (For ever the tangible changes into the intangible)।

কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা গেল, প্রাথমিক পর্যায়ের মহাজাগতিক রশ্মির উপাদান বিভিন্নরূপ আহিত কণিকা। তাই মিলিকান বললেন, এই বিশ্বে একদিকে জড়ের যেমন বিলয় হচ্ছে অন্যদিকে নূতনের সৃষ্টিও হ'য়ে চলেছে সমান তালে। সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবিরত জড়ের বিলয়ের ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে তা মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে চলবার সময় চরম শৈত্যের প্রভাবে তরঙ্গ-সংঘের দল পাকিয়ে আবার প্রোটন,

ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতি জড়-কণিকার রূপ নিচ্ছে। আর এদেরই কিছুটা অংশ হয়তো অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর উপরে।

তবে এ সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ফের্মী যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন তাকেই বর্তমানে সবচেয়ে যুক্তিসহ ব'লে মনে করা হয়। বিভিন্ন নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী মহাশূন্যে যেসব ধূলিরাশি (interstellar dust) আছে সেসব সম্ভবত চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন। নক্ষত্র স্থির নয়, কাজেই একথা ভাবা অন্যায় নয় যে, বিভিন্ন নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী ধূলিরাশিও দ্রুত সঞ্চরণশীল। কাজেই দ্রুতগতিশীল এবং চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন এসব ধূলিরাশির প্রভাবে স্বল্পবেগ-সম্পন্ন আহিত কণিকার ভরবেগ (momentum) ক্রমশ বাড়বে। বিভিন্ন স্থানের ধূলিরাশির গতিবেগ বিভিন্ন দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই একথা সহজেই অনুমেয় যে, স্বল্প-গতিবেগ-সম্পন্ন একটি আহিত কণিকা এরূপ ধূলিরাশির ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ বেগ সঞ্চয় করতে থাকবে এবং পরিশেষে তাই প্রচণ্ড ভরবেগ-সম্পন্ন, অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তিধর, মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকায় পরিণত হ'তে পারবে।

বিজ্ঞানী লরেন্স যে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন তাতে চুম্বক ও তড়িৎ-বলক্ষেত্রের সুষম প্রয়োগের ফলে আহিত কণিকার বেগ কল্পনাতীত-রূপে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, আর এরূপ প্রচণ্ড শক্তিধর কণিকাকে পরমাণু ভাঙার কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করাও সম্ভব হয়েছে। কাজেই মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি সম্পর্কে ফের্মীর এই মতবাদ একেবারে অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন, মহাশূন্যে এসব আহিত কণিকার আবির্ভাব হ'ল কি করে? বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভবত এক একটি 'সুপারনোভা' (Supernova) থেকে এসব কণিকা উৎসারিত হয়ে এসেছে। আমরা জানি, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অতি ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলেই তা সুপারনোভায় পরিণত হয়। গত নয় শত বছরের মধ্যে মহাকাশে মাত্র তিনটি 'সুপারনোভা'-র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই সূর্যের সমপরিমাণ জড়পদার্থ মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার এক লক্ষ ভাগের

একভাগ পরিমাণ জড়পদার্থও যদি ২০০ মিলিয়ন ইলেক্‌ট্রন-ভোণ্ট শক্তিসহ বিচ্ছুরিত হয়েছে ব'লে মনে করা যায়, তাহ'লেই আমাদের নক্ষত্রজগতে মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত খুঁজে পাওয়া যায়।

পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সময়-বিশেষে সূর্যদেহ থেকে বিপুল পরিমাণ আহিত কণিকা উৎসারিত হয়। তবে এদের শক্তির পরিমাপ মূল মহাজাগতিক রশ্মির তুলনায় অনেক কম। একটি সুপারনোভা সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে, কাজেই তা থেকে যে আরো অনেক বেশি শক্তিধর আহিত কণিকা আরো অনেক বেশি পরিমাণে উৎসারিত হবে সেকথা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়।

ফের্মীর মতবাদ খুবই যুক্তিসহ এটা ঠিক। কিন্তু তবুও বলব, বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি সম্পর্কে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি। কারণ পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, অবস্থা-বিশেষে জড়-কণিকা থেকে শক্তিতে এবং শক্তি থেকে জড়-কণিকায় রূপান্তর ঘটতে পারে অতি সহজেই। আইন্‌স্টাইনের সূত্র থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এই রশ্মি জড়-কণিকার ধ্বংসাবশেষ, না এ থেকে মহাশূন্যে নূতনের সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তা নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন।

কালের স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি অনন্তের পথে। অতীতের সেই দুরন্ত জ্বলন্ত পৃথিবী ক্রমে শান্ত হ'য়ে বর্তমানে তার শস্য-শ্যামলা রূপ ধারণ করেছে; এর মাঝে যে কত কোটি কোটি বছর কেটে গেছে তার হিসেব করাই কঠিন। অতীতের সেই অজ্ঞাত বিস্মৃত কালের পথে বিজ্ঞানী তাই পিছু হটতে লাগলেন এবং অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে পৃথিবীর একটা কোষ্ঠী তৈরি করলেন। কিন্তু সৃষ্টির সুরু হ'ল কি ক'রে, কোথায় এবং কি ভাবে, তার সঠিক মীমাংসা করা আজও সম্ভব হ'ল না।

বিজ্ঞানী তাই কল্পনার চোখে দেখছেন, এমন একদিন ছিল যখন না ছিল পৃথিবী, না ছিল গ্রহ-তারা; সৃষ্টির আদি অণু-পরমাণু বা ইলেক্‌ট্রন-

প্রোটন কণিকারও জন্ম হয়নি তখনও। বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত ক'রে ছিল শুধু বিজ্ঞানীর কল্পিত ঈথর-সমুদ্র—নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থির-নিস্পন্দ। স্রষ্টার অঙ্গুলিস্পর্শে সেই শান্ত ঈথর-সমুদ্রে জেগে উঠলো ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটোছুটি করতে করতে ক্রমে তারা দল বেঁধে গড়ে তুললো প্রোটন, ইলেক্‌ট্রন ও নিউট্রন কণিকা। তারপর কোটি কোটি বছর ধ'রে সৃষ্টি এগিয়ে চল্‌লো স্বাভাবিক নিয়মে। প্রোটন, ইলেক্‌ট্রন, আর নিউট্রনের বিচিত্র সমাবেশে তৈরি হ'ল অণু-পরমাণু, গ্রহ-নক্ষত্র, আরো কত কি, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর মিলনে গড়ে উঠে নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর!

শক্তি ঘনীভূত হ'য়েই জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মহাকাশের দিকে দিকে দেখা যায় জড়বস্তুর বিলয়েই নিত্য নূতন শক্তির সৃষ্টি হ'য়ে চলেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেসব শক্তি ঘনীভূত হ'য়েই আবার নূতন নূতন নক্ষত্রের সৃষ্টি ক'রে চলেছে কিনা তা কে জানে? এভাবে বিশ্বের দিকে দিকে হয়তো ভাঙা-গড়ার বিচিত্র খেলা চলেছে অনাদি অনন্তকাল ধরে। এর আরম্ভ যে কোথায়, আর এর শেষই বা কোথায় কখন হবে, তা কে বলবে?

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

ঋণ-স্বীকার

এই পুস্তক-রচনাকালে দেশী এবং বিদেশী অনেকগুলি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) **বাংলা**

১। আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী —আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

২। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল — ঐ

৩। পূজাপার্বণ — ঐ

৪। ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠিবিচারের সূত্রাবলী
—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

৫। বাল্মীকি-রামায়ণ —শ্রীরাজশেখর বসু

৬। ত্রয়ী —ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৭। নক্ষত্র চেনা —শ্রীজগদানন্দ রায়

৮। 'বসুধারা' পত্রিকায় প্রকাশিত
"বৈশাখ সন্ধ্যায় আকাশ ইত্যাদি" —শ্রীকামিনীকুমার দে

৯। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত
"যাঁরা গ্রহনক্ষত্র চিনতে চান" —শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১০। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে প্রকাশিত
"শুকতারা" —(সম্পাদকীয়)
"পৃথিবীর অবগুণ্ঠিত প্রতিবেশী" —শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়
"চন্দ্রলোক" —শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন
"দুই দেওয়ালের মাঝখানে" —শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী
"গ্রহরাজ বৃহস্পতি" —শ্রীঅজিতকুমার বসু
"মহাজগতের ধাবমান অগ্রদূত" —শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

১১। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা

১২। "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকা

১৩। "শিশুভারতী" —শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

১৪। 'প্রবাসী ষষ্ঠী-বার্ষিকী'-তে প্রকাশিত
"বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি"
—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৫। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ —শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

(খ) **ইংরেজী**

1. Gods and Goddesses in Art and Legend (Wechsler)
2. Legends of Greece and Rome (Kupfer)
3. Science for the Citizen (Hogben)
4. The World of Science (Taylor)
5. General Astronomy (Jones)
6. Astronomy (Hoyle)
7. Earth, Moon and Planets (Whipple)
8. Modern Encyclopædia for Young People
9. Pictorial Knowledge
10. The Book of Popular Science
11. The Mysterious Universe (Jeans)
12. The Universe Around Us (Jeans)
13. Around the Moon (Jules Verne)
14. Profile of America (Emily Davie)
15. First Photographs of the Reverse Side of the Moon (Academy of Sciences of the U.S.S.R.)
16. Gulliver's Travels (Jonathan Swift)
17. Cosmic Rays Thus Far (Lemon)
18. The Cosmic Radiation (Hooper and Scharff)
19. The "Particle" of Modern Physics (Stranathan)
20. A Text Book of Intermediate Physics (Sen and Dasgupta)